শতাব্দী ও সাহিত্য

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, বর্ত্তমানে দৈনিক যুগান্তরের সহযোগী সম্পাদক
এবং 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা', 'সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ', 'কাঁটা তার',
'ধোঁয়া', 'মিছে কথা', 'সেতু', 'ঝিলিমিলি' প্রভৃতি বইয়ের লেখক

চক্রবর্ত্তী, চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী

শ্রদ্ধাভাজনেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

কবিতা :	সেতু	..	১।০
	ঝিলিমিলি	..	।৵০
গল্প :	মিছে কথা	..	১৲
	ছন্দপতন	...	১৲
নক্সা :	প্রেম ও পাদুকা	..	১।০
	সুইসাইড		১৲
নাটিকা :	বনটিয়া	.	॥০
উপন্যাস :	অদৃশ্য সংকেত	..	১৲
	দু' নৌকোয়	..	১।০
	কাঁটাতার	..	১৲
	ধোঁয়া	..	২৲
আলোচনা :	বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা	...	২৲

সুধাংশুশেখর সেনগুপ্তের সঙ্গে লেখা

ইতিহাস :	সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ	..	৸০
জীবন :	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ	..	১॥০

ভূমিকা

এ-কালের সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবন-নীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে নানা সময়ে যে সমস্ত বক্তৃতা, অভিভাষণ, আলোচনা ও চিঠিপত্র লিখেছি, তা থেকে বিষয়ানুক্রমে নির্ব্বাচন করে একটি বই প্রকাশ করতে অনেকের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েছি। এই বই প্রধানতঃ সেই অনুরোধের ফল। এর অন্তর্গত নিবন্ধগুলি যদিও প্রথমে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন আকারেই লেখা, তবু বিষয় ও দৃষ্টি ভঙ্গীর দিক থেকে এদের ভেতর একটা অবিচ্ছিন্নতা আছে বলেই মনে করি—কারণ সমস্ত রচনারই লক্ষ্য হল ইদানীন্তন কালের বাজার-চলতি ism-গুলির স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং আমাদের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অপরাপর শাখাগুলির ওপর তাদের প্রভাব বিশ্লেষণ করা। ঠিক এই দিক থেকে বাংলা ভাষায় এর আগে আর কোন প্রয়াস হয়নি বলেই আমার ধারণা।

কিন্তু এখানে বলে রাখা দরকার যে যুগ-সংস্কৃতির সমস্ত দিক নিয়ে সম্যক আলোচনা আমি করিনি,—কোন প্রসঙ্গ সম্বন্ধে শেষ কথা বলবারও চেষ্টা করিনি। যে সমস্ত চিন্তা, মত ও আদর্শ যুগধর্ম্মে আমাদের আবহাওয়ায় এসেছে, অথচ যাদের মর্ম্ম যথাযথ উপলব্ধি করার সুযোগ আমাদের হয়নি—আর সেই জন্যেই নানাক্ষেত্রে তাদের অপপ্রয়োগের দেখা দিয়েছে, তাদের মোটা কথাগুলো আমি সহজ করে বোঝাতে চেয়েছি এবং আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছি। বিশেষজ্ঞ আমি নই, সুতরাং এর বেশী আমার কাছে প্রত্যাশিত নয়।

এই বইয়ের নামকরণে সাহায্য করে এবং এর অনেকগুলি রচনা স্বয়ং প্রকাশ করে আমাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেছেন আনন্দবাজার রবিবাসরের সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সান্যাল। এছাড়া শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়, শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ, শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বন্ধুদের সহায়তা পেয়েছি নানাভাবে। যুগান্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং সম্পাদকীয় বিভাগের অপরাপর বন্ধুরা, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার সান্যাল এবং শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ দাশগুপ্তও নানাদিক থেকে প্রচুর আনুকূল্য করেছেন। এঁদের সকলকেই জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র রায়-চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর আগ্রহে বইটি এত শীঘ্র প্রকাশিত হল—তাঁদের কাছেও আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ রোগশয্যা থেকে বইটির আশু প্রকাশে আগ্রহ জানিয়েছিলেন, বই শেষ করে তাঁর হাতে দিতে পারলাম না, এ দুঃখ আমার কোনদিন যাবে না।

যুগান্তর সম্পাদকীয় বিভাগ
১৫ই অক্টোবর, ১৯৪১

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সূচী

প্রথম স্তবক : দর্শন ও বিজ্ঞান [পৃঃ ১-৫২]

দ্বিতীয় স্তবক : শিল্প [পৃঃ ৫৩-৭৯]

তৃতীয় স্তবক : রসাদর্শ [পৃঃ ৮০-১৩০]

শতাব্দী ও সাহিত্য

প্রথম স্তবক ঃ দর্শন ও বিজ্ঞান

[১] বিংশ শতাব্দীর ভাবাদর্শ

মহাসমরের উৎপত্তি এক বা একাধিক মৌলিক কারণে সংঘটিত হলেও, তার পরিণতি এত বেশী যৌগিক এবং এমন পরস্পর-বিরোধী ভাবে কার্য্য-কারণ-সূত্রে আবদ্ধ যে, এক কথায় তার স্বরূপ নির্ণয় সহজ বা সম্ভব নয়। কিন্তু তার প্রভাবে পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র-সংস্থান যেমন উল্টে-পাল্টে গেছে, তেমনই তার চিন্তা-জগতেও এসেছে তুমুল ওলট-পালট। 'এ না হয়ে উপায় ছিল না এবং এ হয়েছে বলেই বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতির একটি নিজস্ব দাবী স্বীকার না করে উপায় নেই।'

প্রত্যক্ষ জীবনে এই নিজস্বতা প্রকট হয়েছে সমাজতন্ত্রবাদে আর ভাব-জীবনে এর বিকাশ হয়েছে বস্তুতান্ত্রিক দর্শনে।। প্রথম করেছে অর্থ নৈতিক আভিজাত্যের মূলচ্ছেদ—বিত্ত ও ব্যসনের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে প্রভুত্ব, তাকে চূর্ণ করেছে এবং স্বীকার করে নিয়েছে নির্ব্বিশেষে মানবতাকে। তার ফলে গেছে জাত্যাভিমান, গেছে রাজা-প্রজা উচ্চ-নীচের উদ্দেশ্য-মূলক বিভেদ-বিধি এবং জন্ম নিয়েছে নূতন সমাজ-ব্যবস্থা। মুষ্টিমেয়

সুবিধাবাদীর সযত্ন বিস্তারিত স্বার্থের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে, মানুষ আবিষ্কার করেছে এমন একটা সার্ব্বজনীন আদর্শ, যা প্রমাণ করে দিয়েছে সমস্ত অতীতকে ভ্রান্ত বলে। দ্বিতীয় করেছে কল্পনার পক্ষচ্ছেদ, করেছে বিশ্বাসপ্রবণতার পৃষ্ঠে কশাঘাত। তার ফলে পারমার্থিকতার স্বপ্ন, লোক-লোকান্তর, জন্ম-জন্মান্তরের স্বপ্ন, কঠোর বাস্তবের আলোকে তিরোহিত হয়েছে—বিশ্লেষণের কষ্টিপাথরে যাচাই করে মানুষ দেখেছে, আধ্যাত্মিকতাই হক, নীতিই হক, শিল্পই হক, আর সভ্যতাই হক, সব কিছুরই জন্ম স্থুল কারণ থেকে। সমালোচনার শানে চড়ালে তাদের কৃত্রিম পালিশ উঠে যায়, বার হয়ে পড়ে উলঙ্গ বাস্তবের রূঢ় চেহারা।

বাইরের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিবর্ত্তনের মতো, ভেতরের আত্মিক ও নৈতিক বিবর্ত্তনও অনিবার্য্য হয়ে উঠেছে নানা কারণে। এই বিপ্লবের জন্ম মহাযুদ্ধে এবং পরিপুষ্টি এ যুগের নবতন দৃষ্টিভঙ্গীতে। (অবশ্য বাইরেই হক, আর ভেতরেই হক, এই নবতন দৃষ্টি এখনো সীমাবদ্ধ রয়েছে শুধু আইডিয়াতেই—এই আইডিয়াকে কতকটা বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে এবং সেই চেষ্টা চিন্তার দিক থেকে সমস্ত জগতেই অল্পে অল্পে পরিব্যাপ্ত হতে চলেছে।) এতকাল দর্শন ও বিজ্ঞানের সীমারেখা ছিল সুনির্দ্দিষ্ট—বিজ্ঞান ছিল জড় নিয়ে, আর দর্শন ছিল চৈতন্য নিয়ে। অর্থাৎ দুটো স্বতন্ত্র ধারা চলতো আপন আপন খাতে। এই শতাব্দীই প্রথম স্থূল ও দিব্য, সত্তার দুই অবস্থাকে একই বস্তু-ধর্ম্মের অন্তর্গত করে নিলো, যার ভেতর থেকে দূর হয়ে গেল দুর্জ্ঞেয়তার কুজ্ঝটিকা—দেখা দিল প্রত্যক্ষতার প্রদীপ্ত দিবালোক।

এক কথায়, এই শতাব্দী সর্ব্ববিধ পূর্ব্বতন বিশ্বাস, যুক্তি ও মতবাদকে খণ্ডন করে দিয়ে, নূতনভাবে করলো তার ঐতিহ্য স্থাপন। যন্ত্রবিজ্ঞানের অত্যধিক অগ্রগমনে এই ঐতিহ্যের প্রসারও হল অপ্রত্যাশিত ভাবে।

রেডিও, টেলিফোন, এক্স-রে, এরোপ্লেন, সাবমেরিন, বাস্তব-জীবনে যেমন দিল বহুবিধ প্রাকৃতিক বাধার ওপর মানুষের অক্ষুণ্ণ আধিপত্য, ভাব-জীবনেও তেমনি মানুষ সর্ব্ববিষয়ে প্রত্যক্ষানুগামী হয়ে উঠবার সুবিধা পেলো। অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর মানুষ মহাযুদ্ধের বিপুল আলোড়নে ভেতরে-বাইরে জেগে উঠলো বিগত শতাব্দীর নির্ব্বিরোধ নির্ভরতার স্বপ্ন থেকে—যেমন করে মানুষ জাগেনি আর কোনদিনই।

এই হল মোটামুটিভাবে বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতির মূল। এ যুগের সাহিত্যিক আদর্শ সংস্থিত এই অপরিহার্য্য ওলট-পালটের ওপর—এরই মিশ্র-প্রভাবে তার প্রাণ-শক্তি পরিপুষ্ট, কাজেই তা স্বভাবধর্ম্মেই পূর্ব্বতন যুগের আদর্শ থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে।

কিন্তু এ যুগের সাহিত্যাদর্শের পরিচায়ক সংজ্ঞা কি? কোন্খানে এর পূর্ব্বতন ধারার সঙ্গে মূলগত বিরোধ? দুয়ের মধ্যে তুলনায় সমালোচনা করলে, কার উৎকর্ষ বিশেষ করে চোখে পড়ে? এই তিন প্রশ্ন আসলে একই প্রশ্ন এবং এর উত্তরও এক।

বলা বাহুল্য প্রত্যক্ষ জীবনকে কেন্দ্র করেই আর্ট। কিন্তু তাই বলে প্রত্যক্ষ জীবনও যা, আর্টও তাই নয় নিশ্চয়ই। তাহলে, বিচিত্র বিস্তৃত জীবনই ত পড়ে রয়েছে—আর্টের আর আবশ্যকতা কি? যাঁরা বলবেন, 'কিছু না', তাঁদের অসুবিধা অনেক কম, কিন্তু জোর গলায় সে কথা বলার লোক বোধ হয় বেশী নেই। কাজেই বিতর্কটা বজায়ই থাকে। মানুষ আসলে যা, যা নিয়ে সে আছে, যা সে হতে পারে, পেতে পারে, দেখতে জানতে বা বুঝতে পারে, তাই অবশ্য তার পক্ষে পরম সত্য এবং তার জন্তু-জীবন তাই নিয়েই সীমাবদ্ধ—কিন্তু তার বাইরেও তার যাবার প্রয়োজন হয়। (পুরাতন যুগের সাহিত্য সেই প্রয়োজন মেটাবার কাজকেই একমাত্র লক্ষ্য বলে নিয়েছিল—বিংশ শতাব্দী বলছে, ওটা

ভুল—মানুষের জন্তু-জীবনের যেখানে শেষ, সেইখানেই থেমে যাওয়া দরকার। তার বাইরে আর যা আছে, তা বিজ্ঞানের চোখে প্রমাণসহ নয়।)

শিল্প, আধ্যাত্মিকতা, নীতি (যার ওপর সমগ্রভাবে সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত) (বিজ্ঞানের বিচারে প্রমাণিত হয়েছে বস্তু-সত্তার উপর আরোপিত এক একটি রঙীন আবরণ বলে—ওগুলো সত্য নয়, সত্য তাই, যার সঙ্গে জৈব অস্তিত্বের বা বস্তু-সত্তার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। এই কৃত্রিম আড়াল ভেঙে দিলে যে নিরাবরণ সত্তা আত্মপ্রকাশ করে, তা ছাড়া আর সবই ভুয়ো। (অতএব বাস্তবাতীত যে রস শিল্পের প্রাণস্বরূপ বলে প্রাচীনেরা মনে করেছিলেন, তার আর অবকাশ বা স্বীকৃতি থাকছে কোথায় ?)

অবশ্য কথা উঠবে, যা কিছু বাস্তবাতীত, তাই অসত্য কি না ? মন একথা মানতে চায় না বটে, কিন্তু বিজ্ঞান তাই হাতে-কলমে প্রমাণ করতে উদ্যত হয়েছে। আপেক্ষিকতাবাদ আধার ও কালকে বৃত্তি-নিরপেক্ষভাবে স্বীকার করেনি—মনোবিজ্ঞান স্বপ্ন ও কল্পনাকে বলেছে অবদমিত বাসনার প্রতিক্রিয়া বলে—যন্ত্রবিজ্ঞানের দ্বারা সময় ও দূরত্বের স্থিতিস্থাপকতা প্রমাণিত হয়েছে—শারীর বিজ্ঞান গ্রন্থি-ক্রিয়া থেকে মানসিক বৃত্তির স্ফুরণ বলে প্রমাণ করেছে—কাজেই আইনষ্টাইন, প্যাভলভ ও ফ্রয়েডকে লোকের বিশ্বাস করতে বাধে নি। এইভাবে কার্যাকারণের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়তে পড়তে মানুষের সমুদয় ভাব-বৃত্তিই আজ রহস্য-মধুর অস্ফুটতা থেকে সত্যের উজ্জ্বল উলঙ্গতায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই থেকেই প্রাচীন শিল্পাদর্শ দিনে দিনে বিপর্য্যস্ত হয়েছে এবং তার স্থানে দেখা দিয়েছে নবতন যুক্তিবাদের আদর্শ, যার ভেতর স্বপ্ন, ভাবাবেশ বা কল্পনার স্বীকৃতি নেই—নেই সুন্দরের, মধুরের, অতিপ্রাকৃতের। (প্রাচীনেরা যাকে আর্ট বলেছিলেন, তার জন্ম বিশ্লেষণে নয়, ব্যবচ্ছেদে নয়,

উন্মোচনে নয়—কিন্তু এ যুগের দৃষ্টিই একান্তভাবে বিশ্লেষণমুখী। অতএব আজকের দিনে রসাত্মকতার আর স্বীকৃতি কোথায়?) আর্টের সংজ্ঞা নির্দ্দেশকালে এ যুগ তাই রসাত্মকতা নামক ধোঁয়াটে কথাটা নাকচ করে, তার ওপর লিখে দিয়েছে প্রত্যক্ষতা। তার ফলেই সমাজ-চক্রের মতো শিল্প-চক্রেরও আভিজাত্য আজ গেছে দূর হয়ে—তার ভেতর এসে পড়েছে বহু জিনিষ, যা এতদিন আর্টের রাজ্যে অপাংক্তেয় বলেই বিবেচিত হয়েছে।

এর আগে সাহিত্যকে রসগত ও বস্তুগত দুটো স্বতন্ত্র পর্য্যায়ে ভাগ করা হত—প্রথমকেই বলা হত সাহিত্য, আর দ্বিতীয়টা হত বিষয়ানুযায়ী নামে অভিহিত। এই বিভেদটা এ যুগে লোপ করে দেওয়ায়, এ যুগের সাহিত্যের এলাকা হয়েছে আশাতীত রকম প্রশস্ত—ফলে তার ভেতর যেমন ঢুকেছে বিজ্ঞান, তেমনি ঢুকেছে সাংবাদিকতা এবং সব কিছু নিয়েই আজকের সাহিত্য।

(আগেই বলেছি যে, এ যুগের ইতিহাসের সূচনা মহাযুদ্ধে—যাতে মানুষ প্রথম উপলব্ধি করেছিল যে চিরাগত রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি নিরাপদ নয়, কোন বহিসংঘাত বা বিক্ষোভের ফলে যে কোন মুহূর্ত্তেই তার ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে এবং কাল নিরবধি হলেও, গতিশীল, সুতরাং ধাবমান কালের প্রবাহে পুরাতনের পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হলেও, অযথা মমতায় তার কঙ্কাল আঁকড়ে থাকা নিরর্থক। এই অনিশ্চয়তার উপলব্ধি এর আগে মানুষকে অনুভব করতে হয় নি—কারণ এত বড় সার্ব্বভৌম বিপ্লবই ইতিহাস এর আগে দেখে নি। তাই মানুষ কোনদিন তার ব্যবহারিক ও মানসিক ঐতিহ্যের পর্দ্দাও তুলে দেখে নি। কিন্তু সেই পর্দ্দা যখন আপনিই একদিন উড়ে গেল, তখন মানুষ বাধ্য হয়েই তাদের বিষয় অবহিত হল।

এই চেতনার তাগিদেই মানুষ অতীতের ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে রুদ্ধ-শ্বাস হয়ে থাকতে পারলো না। তাই সে নূতন করে নির্ভর করার মতো শক্ত জমি খোঁজ করতে লাগলো। এই থেকেই তার সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টাকে নূতন পথে চালাতে হল এবং নূতন করে চিন্তার ধারা ও ভাবের আদর্শ স্থাপন করতে হল। এ যুগের দর্শন ও বিজ্ঞানই হল এদিক থেকে তার পথ-প্রদর্শক। (এই ভাবেই গড়ে উঠলো বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য।)

এর প্রথম পরিচয়, সমাজ-সংস্থানকে বিশ্লেষণ করে দেখায়। সমাজ বলতে ব্যাপকভাবে বোঝায় দুটো জিনিষ—রাষ্ট্র আর গৃহ। রাষ্ট্রের দিক থেকে রাজতন্ত্র বা অন্য যে কোন রকম শ্রেণী-স্বার্থকেই যেমন মানুষ মেনে নিতে কুণ্ঠিত হল, গৃহের দিক থেকেও তেমনি আচার, নীতি ও কৌলিন্য নিষ্ঠাকে সে করলো প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ও সমাজপতি, রাজা ও পুরোহিত চিরাচরিত প্রথার জোরে যে একচ্ছত্র আধিপত্য চালিয়ে এসেছেন এতকাল, মানুষ তাকে করলো প্রশ্ন। এই সঙ্গতিহীন অযথা প্রভুত্বকে মানুষ অস্বীকার করলো, তার থেকেই জন্ম নিল সমাজতন্ত্র-বাদ। ভাবরাজ্যে তার আবির্ভাব হতেই একদিক দিয়ে যেমন গেল রাষ্ট্র-শক্তির সর্ব্বময়তা, অন্য দিক দিয়ে তেমনি গেল সমাজশক্তির গর্ব্বময়তা। শ্রেণী বিশেষের সুযোগ-সুবিধার জন্যে যে সমস্ত বিধি-বিধানের জন্ম, অবস্থার বিবর্ত্তনে তাদের সংস্কার দরকার হয়ে পড়লো। তাই বিবাহ নিয়ে উঠলো প্রশ্ন, মাতৃত্ব-পিতৃত্ব নিয়ে জাগলো সন্দেহ—গুরুত্ব পৌরোহিত্য নিয়ে বাধলো তর্ক—এরা কেন?

স্ত্রী ও পুরুষের দৈহিক সম্পর্ক ও তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে পুত্র-কন্যার জন্ম প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা—এই ব্যবস্থার অবলিপ্ত স্বাধিকার শান্তি বা স্বস্তির পরিপন্থী বলেই একদা হয়েছিল বিবাহের বিধান। কিন্তু

সেই বিধান বহুবিধ স্বার্থবোধের সংযোজনায় যখন পীড়ন হয়ে দাঁড়ালো, তখন তাকে নূতন করে ঢেলে সাজার দরকার হল। এই নূতন করে ঢালার মুখেই স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক সংযোগের ক্ষেত্রে তথাকথিত ধর্ম্ম-বন্ধনের পরিবর্ত্তে এলো স্থূল সাংসারিক চুক্তির সম্বন্ধ। তাই দরকার হলে বিবাহ বিচ্ছেদের সঙ্গে জন্ম-নিয়ন্ত্রণেরও যেমন কোন নৈতিক বাধা রইলো না, তেমনই জাত্যাভিমান বা সম্বন্ধ-বৈপরীত্য বশে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলনও দোষাবহ বলে বিবেচিত হল না। গুরু-পুরোহিতের সঙ্গে এইখানে লাগলো প্রথম টক্কর, দ্বিতীয় টক্কর বাধলো আনুষ্ঠানিক বিধি ও উপধর্ম্ম নিয়ে।

এতকাল মানুষ পিতামাতা ও গুরুশাসিত সংসার চক্রে একটি জন্মান্তরীন প্রাক্-ব্যবস্থা আরোপ করতো এবং গার্হস্থ্য আদর্শকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ বলেই বিশ্বাস করতো। কাজেই জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—এ তিনটি জিনিষকে অকৈতব শ্রদ্ধায় মেনে নিতে তার কোনদিন আটকায় নি। কিন্তু এই শ্রদ্ধার মূলে যখন প্রশ্ন প্রবেশ করলো, তখন বিচার-বিশ্লেষণে এদের দর যাচাই হতে আরম্ভ হল। তাই থেকেই সুরু হল ভাঙন।

একদা মানুষের সীমাবদ্ধ শক্তি ও একাকিত্ব দৈবশক্তির আশ্রয় খুঁজেছিল—সেই দুর্ব্বলতার সুযোগে বুদ্ধিমানেরা পরলোকের কাণ্ডারী সেজে মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, যেমন গোষ্ঠী-জীবনে তার রক্ষক হয়েছিল বলবানেরা। এদের প্রথম দল হল শাস্ত্রকার, গুরু-পুরোহিত —আর দ্বিতীয় দল হল, রাজা বা ধনাধিকারীরা। জন্তু-জগতে নারী ও দুর্ব্বলের রক্ষক হিসাবে প্রত্যেক দলেই একটা করে পালের গোদা থাকে —মনুষ্য জগতেও এতকাল তাই ছিল—তবে বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ একে শোভন ব্যাখ্যা দিয়েছিল, এক দল হয়েছিল ইহলোকের এবং অন্য দল হয়েছিল পরলোকের আশ্রয় স্বরূপ। মানুষ এ যুগে দেখলো, অনিবার্য্য

দুঃখ অনতিক্রমণীয় এবং স্পষ্ট বিঘ্ন নিরাকরণ সাপেক্ষ, সুতরাং ও দুয়ের জন্যে প্রতিভূ নির্ব্বাচন ও তাঁদের কর্ত্তৃত্ব পালন অবান্তর। বরং বৃথা ক্ষমতার আতিশয্য বহু পাপের পরিপোষক এবং উদ্দেশ্যমূলক শ্রেণী-স্বার্থের উপায় স্বরূপ। তখন মানুষ এদের এক কথায় দিল বাতিল করে। এরই সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে রুষ্টি-তুষ্টির অধীন সসীম ভগবান, তিনিও দূর হয়ে গেলেন।

সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম—এই ত্রিবিধ প্রতিষ্ঠান থেকেই এইভাবে রহস্যান্ধকার বিশ্বাস দূর হয়ে গিয়ে, স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, সতেজ ও বিচারসহ দৃষ্টিভঙ্গীর আবির্ভাব হল। অর্থাৎ মানুষ কোন আপ্ত বাক্য বা প্রসিদ্ধিকে হেঁটমুণ্ডে মেনে না নিয়ে, তাকে যাচিয়ে বাজিয়ে দেখতে চাইলো, তার স্থিতি বিশ্বাসের ওপর, না যুক্তির ওপর।

কিন্তু আগেই বলেছি, মানুষের চিন্তায় এবং দৃষ্টিতে সমাজ, রাষ্ট্র এবং ধর্ম্ম সম্পর্কে এই বিপ্লব পূর্ণতা লাভ করলেও, প্রত্যক্ষতঃ তা এখনও সার্থক হয়ে ওঠে নি—শুধু একদিন যে তা হবে, তারই কিছুটা আভাস পাওয়া গেছে। মার্কসীয় দর্শন বা ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে গচ্ছিত স্বার্থের খাতিরে কণ্ঠ আমাদের যতই মুখর হয়ে উঠুক, মনে মনে আত্ম-প্রবঞ্চক না হলে, একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা আর অন্ধভাবে পূর্ব্বতন বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকতে পারি না—আমাদের চিত্ত আজ পূর্ব্বের পুঁজি হারিয়েছে এবং ভবিষ্যতের পাথেয় সম্বন্ধে আমরা ষোল-আনা আশ্বস্ত না হলেও, তার ওপরই আজ আমাদের সবিশেষ নির্ভর।

বিংশ শতাব্দীর এই প্রজ্ঞা দৃষ্টির উদ্ভব একান্ত পার্থিব কারণে এবং এর পরিব্যাপ্তি বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতিতে। যন্ত্রযুগে একটার পর একটা করে মানুষ প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করে, আর একধাপ করে তার প্রাক্তন বিশ্বাসের ভিত টলে যায়। এর ওপর মনোবিজ্ঞান এসে তার সর্ব্ববিধ

অনুষ্ঠান ও ঐতিহ্যকে খর দিবালোকে তুলে ধরে পরীক্ষা করে, তাতে প্রতিপন্ন হয় যে, আধ্যাত্মিকতা, শিল্প সব কিছুর মূলই স্থূলে নিবদ্ধ—সূক্ষ্ম যে আবরণটা তাদের ওপর এতকাল চাপানো রয়েছে, সেটা বাইরে থেকে আরোপিত এবং মনুষ্য-বুদ্ধির আবিষ্কার। অর্থাৎ দাঁড়ালো এই যে, পুরাতন আদর্শ অনুযায়ী আধ্যাত্মিকতা মানে আত্মপ্রবোধ, নৈতিকতা মানে আত্মপ্রবঞ্চনা, আর্ট মানে আত্ম-অপচয়। সন্ন্যাস, বৈরাগ্য, ঐশী অনুভূতি, রসাত্মতা, সবই এই হিসাবে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধতার আনুসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ালো। বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, এদের পেছনে রক্ত মাংসের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নেই। এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বাইরে আর আর যা-কিছু আছে, তাকে বিকলন করে দেখা গেল, তা নেই—একেবারেই শূন্য।

এই শূন্য পূর্ণ করে বিংশ শতাব্দী নূতন করে সৃষ্টির পথে অগ্রসর হচ্ছে—সে সৃষ্টি এখনো প্রচ্ছন্ন, কিন্তু প্রকাশোন্মুখ। যন্ত্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, আচার বিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান—পরস্পর নির্ভরশীল বিবিধ বিজ্ঞান, এক চরম ও পরম প্রান্তে এসে যেদিন মিলিত হবে, সেদিনই সত্যিকার আধুনিক সংস্কৃতি জন্মাবে আজকের সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা হচ্ছে সেই ভাবী আন্দোলনের ভূমিকা। আজকে পুরাণোকে ভাঙার আতিশয্যে সেই নূতনের পদসঞ্চার টের পাওয়া যাচ্ছে না বটে, কিন্তু সেটা আসছে এবং সেই আবির্ভাবের জন্যই এই ভাঙন, এ কথাটা ভুলে গেলে চলবে না।

[২] নব্য বিজ্ঞানের গতি

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্ব্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানের একটা কায়েমি বিশেষণ ছিল 'জড়'। বিশ্বব্যাপার ব্যাখ্যানে বিজ্ঞান পরমাণুপুঞ্জের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে স্বীকার করেছিল, বস্তু-ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য-নির্ণয়ে এর বেশী তার কিছুই দরকার হয় নি। কিন্তু এর পরও একটা ধাপ ছিল, সে হল চৈতন্য-ব্রহ্মাণ্ড, বিজ্ঞান সেটাকে ঔপাদানিক সঙ্ঘাতেরই স্বধর্ম্ম বলে চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর পড়ে না বলেই তাই সেদিন দিব্যতত্ত্ব যা, তাকে বিজ্ঞান করেছিল উপেক্ষা—আর তার ফলেই নাস্তিক্যবাদের প্রসার হয়েছিল ইউরোপ জুড়ে। ডারউইন, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার এবং ষ্টুয়ার্ট মিল বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, তার ভেতর তথাকথিত ভগবানের ত নয়ই, এমন কি ক্রিয়াশীল মননশীল কোন সর্ব্বশক্তিময় চেতনারও স্থান ছিল না।

এর পর এলো যন্ত্র-বিজ্ঞানের যুগ। প্রকৃতির কাছে যেখানেই মানুষ পেয়েছে বাধা এবং তার ফলে কোন অলঙ্ঘ্য বা অজেয় শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করে, তাকে বুঝতে চেষ্টা করেছে, সেখানেই তাকে যান্ত্রিক সহায়তা দিয়ে দেখানো হল যে তার কল্পনা অলীক—তার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ না হওয়ার জন্যেই তার এই বাধা! রসায়ন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদ তত্ত্ব, এক কথায় বস্তু-বিজ্ঞানের সমুদয় শাখা মন্থন করে, মানুষের এই স্বাভাবিক অসম্পূর্ণতাকে পূরণের জন্যে যন্ত্র উদ্ভাবিত হতে লাগলো। যন্ত্রের উন্নতি ও বিস্তৃতি যতই হয়ে চললো, ততই মানুষের মন থেকে বিশ্বাসের বোঝা নেমে যেতে লাগলো—বিজ্ঞানের প্রতাপও ততই বেড়ে চললো হু-হু করে।

কিন্তু আগেই বলেছি যে বস্তু-ব্রহ্মাণ্ডের পরও একটা ধাপ আছে —সেটা দুর্নিরীক্ষ্য হলেও, তার সম্বন্ধে মানুষের সচেতনতা আছে। মানুষ প্রশ্ন করলো, যে-পরমাণুপুঞ্জের পারস্পরিক সঙ্ঘাত থেকে এই বহু বিচিত্র বিশ্বযন্ত্র উদ্ভূত হয়েছে, তার মূল উৎস কোন্‌খানে? কি তার স্বরূপ? স্বীকার করেই নেয়া হল যে উপাদান অনাদি কালের, কিন্তু সেই ঔপাদানিক অসংলগ্নতাকে কেন্দ্রায়িত এবং পরস্পরসম্বদ্ধ করলো কোন্ শক্তি? আর তা করলোই বাঁ কি বিশেষ উদ্দেশ্যের তাগিদে? এ প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারলো না, কারণ ক্রিয়াশীল আণবসত্তাকে স্বীকার করলেও, তার মনন-ক্রিয়াকে স্বীকার করার মতো পুঁজি বিজ্ঞানের ছিল না। সেটা বলেছিল দর্শন, তাই বিজ্ঞানের পর্ব্ব যেখানে শেষ, সেইখান থেকেই সুরু হত দর্শনের। বলা হত, বস্তু-বিশ্বের বহিরঙ্গিক বা প্রকট রূপ যা, তার বিশ্লেষণ হল বিজ্ঞানের এলাকাভুক্ত, আর অন্তর্লগ্ন প্রাণরূপ বা দিব্যরূপ যা, তাই হল দর্শনের সীমানাভুক্ত। এই দুই নিয়েই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড—কিন্তু নিরীক্ষাভিমানী বিজ্ঞান এই দিব্য তত্ত্বকে করেছিল অশ্রদ্ধা, আর আত্মানুপন্থী দর্শন বলেছিল এহো বাহ্।

দর্শন ও বিজ্ঞানের এই বিবাদ চলে এসেছে একেবারে বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্য্যন্ত। তার পর বিজ্ঞানের রাজ্যে দেখা দিল তুমুল ওলট-পালট। আইনষ্টাইনের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা এবং র‍্যাদার-ফোর্ডের আণবিক গবেষণা পদার্থবিজ্ঞানের গতিকে জড়ের সীমানা ছাড়িয়ে চেতনার অন্দর মহল পর্য্যন্ত দিল প্রসারিত করে। একদা দার্শনিক লাই-ব্‌নিজ অপ্রস্ফুট ভাবে যে চৈতন্যময় প্রাণ-কণিকা সমূহের সম ও বিষম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বিশ্ব ব্যাপারের আদি কারণ বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন, আধুনিক এষ্ট্রোফিজিক্স ইলেকট্রণ বা তারো সূক্ষ্মতর ভগ্নাংশ নিওট্রণে

এসে, অনেকটা সেই তত্ত্বকেই স্বীকার করে নিলে। অর্থাৎ বললে, স্থূল ও সূক্ষ্ম একই বস্তুসত্তার দুটি অবিভাজ্য অবস্থার একটি প্রকট, আরটি প্রচ্ছন্ন প্রতিরূপ—কিন্তু একে অন্যের অনুপূরক এবং দুয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বর্গফলই হল সৃষ্টি-রহস্যের গোড়ার কথা।) এর পর বিজ্ঞানের রাজ্যে ক্রিয়াশীল, মননশীল, চৈতন্যস্বরূপ যে প্রাণশক্তি, তার স্বীকৃতি লাভ হল—এই সুমহান অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য শক্তি ইন্দ্রিয়-গোচর বহিরুপাদানের ভেতর দিয়ে বিকশিত হয়েই এই বহু বিচিত্র সৌর-পৃথিবীকে গড়ে তুলেছে, এটা এ-যুগের বিজ্ঞান মোটের ওপর স্বীকার করে নিলে। দর্শনে ও বিজ্ঞানে এইখানে এসে হল মিলনের গ্রন্থিবন্ধন—যে মিলনকে উপলক্ষ করে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক তাঁর Philosophy of Physics লিখেছেন এবং জীনস, এডিংটন, মিলিক্যান ও হোয়াইটহেড লিখেছেন তাঁদের সর্ব্বজন পরিচিত বইগুলি।

বিজ্ঞান ও দর্শনের পরস্পর স্বতন্ত্র যে দুটি ধারা একে অন্যকে স্পর্শ না করে এবং উভয় উভয়কে অস্বীকার করেই এতকাল বুদ্ধিজীবীদের ভেতর বিবাদ সৃষ্টি করে এসেছে, আর যে বিবাদের ফলে বিজ্ঞানীরা দিব্যতত্ত্বকে ধাপ্পাবাজী বলেছেন, দার্শনিকরা বস্তুবোধকে বলেছেন অসৎ, তার অদ্ভুত রকম সমন্বয় হয়ে গেল। বোঝা গেল, দুটি খণ্ড সত্য এক অখণ্ড সত্যের সদর দরজায় এসে পড়েছে। বুদ্ধিজীবীরা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে কি শেষ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের ভেতর ঈশ্বর এসে পড়লেন?) থিওলজিষ্টরা বললেন, অবশ্যই, বিজ্ঞানীরাও অনিচ্ছা সত্ত্বে বললেন, ঠিক নয়, তবে অনেকটা সেই রকমই বৈকি! ক্রিয়াশীল এবং মননশীল চৈতন্য-কণিকা পর্য্যন্ত যখন আসা গেল, তখন আর একটু এগুলেই ত বিজ্ঞান পরাতত্ত্বের সঙ্গে মিতালি সুরু করে দেবে।)

বস্তু-বিজ্ঞানের এই আধুনিকতম পরিণতির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধ্যাত্মির সমর্থকরা বলছেন, (হিন্দুদর্শন যে কথা বহু কাল আগে সূত্রাকারে বলে গেছে, আধুনিক বিজ্ঞান তার বহুমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষার পালা শেষ করে ত ঠিক সেই সিদ্ধান্তেই এসে পৌঁছুলো—সেই জড় 'প্রকৃতি'র সঙ্গে চৈতন্যময় 'পুরুষে'র সঙ্ঘাত এবং তা থেকে সৃষ্টির বিকাশ!) তাহলে এর ভেতর আর নূতনত্ব কোথায়? বলা বাহুল্য এ বিতর্কের সমাধান আমার সাধ্যাতীত—কারণ হিন্দুদর্শন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দু'বিষয়েই আমার জ্ঞান গণ্ডূষমাত্র। তবে পপুলার বই থেকে যতটা বুঝেছি, তাতে মনে হয়, একথা একেবারে উপহাস্যও নয়, আবার আগাগোড়া শিরোধার্য্যও নয়। হিন্দুদর্শনমতে বীজাকারে প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মবস্তু জড় উপাদানের ভেতর দিয়ে রূপায়িত হয়েছে যে মননক্রিয়ার প্রভাবে, এবং অসীম চিৎ-বিশ্বের সঙ্গে অসীম রূপ-বিশ্বের মেলবন্ধনে যা অদৃশ্য যোগসূত্র-রূপে বিদ্যমান থেকে ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হয়ে এসেছে, আধুনিক বিজ্ঞান মতে তাই গণিতের সঙ্কেতে আবদ্ধ চৈতন্য-কণিকা কিনা, তা বলা কঠিন। তবে উভয়ের মধ্যে গোত্র সাদৃশ্য আছেই। হয়ত হিন্দুদর্শনে রূপকাকারে সংস্থাপিত এই তত্ত্বের ব্যবহারিক বাহুল্যগুলো বাদ দিলে মোটা কথাটা অনেকটা তাই দাঁড়ায়।

অবশ্য ডাক্তার মেঘনাদ সাহা গত কয়েক মাস থেকে এই মতবাদ খণ্ডন করে ধারাবাহিক ভাবে প্রবন্ধ লিখে যাচ্ছেন এবং ডাক্তার সাহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা পৃথিবীর বিদ্বৎ সমাজ শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করে নিয়েছেন। সুতরাং অব্যবসায়ী আনাড়ী হয়ে আমি এত বড় ব্যক্তির সঙ্গে তর্ক চালাবার দুঃসাহস রাখি না। তবে সংশোধনের অপেক্ষা রেখেই অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই। ফ্রয়েড যৌন-বিজ্ঞানের অনুশীলনে একান্তভাবে পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বের ওপর জোর দিয়েছিলেন

বলেই, জীবতত্ত্বের আধুনিকতম আবিষ্কৃতি গুলো সম্বন্ধে তাঁর কতকটা ঔদাসীন্য এসে গিয়েছিল, আর তার ফলেই তাঁর সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী ষোল-আনা কাম-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল, জৈব-প্রবাহের অপরাপর বৃত্তিগুলোকে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন সেই দিক থেকেই। হয়ত যে বিজ্ঞানী সমাজ গাণিতিক নিরীক্ষার বাইরে কোন তত্ত্বজল্পনাকেই বিজ্ঞানে প্রবেশাধিকার দিতে নারাজ, ডাক্তার সাহা সেই দলেরই অন্যতম এবং সেই জন্যেই হয়ত আধুনিক Rational Philosophy'র গতি সম্পর্কে তিনি ততটা মনোযোগী হতে পারেন নি। নইলে জীনস্ বা এডিংটন কেবল কোয়েকার বলেই তাঁদের পপুল্যার বইগুলোতে এই তত্ত্বকে স্বীকার করেছেন, একথা ভাবা যায় কি করে? অবশ্য তাঁদেরই দলভুক্ত একজন বিজ্ঞানী একথা বলেছেন, সুতরাং এর মীমাংসা আমার দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। (আমি শুধু এইটুকু বলেই উপসংহার দিতে চাই যে আধুনিক বস্তু-বিজ্ঞান তার দৃষ্টি-কোণ বদলিয়ে ফেলেছে এবং সেই পরিবর্ত্তনের গতি আস্তিক্য-বাদের অভিমুখে, দর্শন ও বিজ্ঞানে মিলন সংঘটনের অভিমুখে, যার সমগ্র-স্বরূপ আজো হয়ত সম্পূর্ণ করে বোঝা যায় নি!'

কিন্তু এই সঙ্গে বলে রাখা দরকার যে পপুলার মতে ধর্ম্ম বলতে যা বোঝায়, ব্যক্তিক ঈশ্বরকে স্বীকার করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে যোগ-যাগ ব্রত-উপবাস ইত্যাদির অনুষ্ঠান করা, ইহলোক-পরলোক, স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্যের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ বিবিধ লৌকিক বিধি বিধানের আনুগত্য করা, তাকেও বিজ্ঞানের এই নবতন পরিণতির নজীরে সমর্থন করা যায় না! তা আনুষ্ঠানিক এবং অনেক ক্ষেত্রেই অশিক্ষিত মনের বিশ্বাস-প্রবণতা সঞ্জাত। বস্তু-বিজ্ঞানের এই নবপরিণতি মার্ক্সীয় দর্শনের সক্রিয় বস্তু-সত্তা, বড় জোর বেদান্তের চৈতন্যময় পুরুষ পর্য্যন্ত এসেছে—তার ওপর কিছু দাবী করা এখনো গায়ের জোর ছাড়া আর কিছুই নয়।)

[৩] বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জীবন

অল্প দিন আগে 'হরিজনে' গান্ধীজীর একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম, 'চরকার সামর্থ্য'। এই প্রবন্ধে গান্ধীজী আধুনিক যন্ত্র-বিজ্ঞানকে বিশ্বশান্তির বিঘ্ন স্বরূপ বলে বর্ণনা করেছেন এবং তারই পাণ্টায় চরকার অসামান্য শক্তির দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। চরকার সামর্থ্যে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু সে সামর্থ্য কতটুকু? একটি মানুষের অবিরাম হস্ত-চালনায় একটা চরকা এক মাসে যে স্থতো উৎপন্ন করে, তা কোন ক্ষুদ্রতম পরিবারেরও আচ্ছাদন সরবরাহের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়, যদি না আচ্ছাদনের প্রয়োজনীয়তাকে পনেরো-আনা রকম সংক্ষেপ করে আনা হয়। এ অবস্থায় সমস্ত ভারতবর্ষ যদি চরকাসর্ব্বস্ব হয়ে গান্ধীজীর নির্দ্দেশ পালন করে, তাহ'লে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীর ভাগ্যে একখানা করে কোপনিও জোগাড় হবে কিনা সন্দেহ! স্থতরাং চরকার সামর্থ্য আর যাই হক, দেশের ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে মোটেই পর্য্যাপ্ত নয়—নৈতিক বা আধ্যাত্মিক সিম্বল হিসেবে তার যতই কেন না মূল্য থাক গান্ধীজী বা তাঁর অনুগামীদের কাছে। মেসিনে উৎপন্ন স্থতো এবং সেই স্থতোর কাপড় ভিন্ন দেশের লজ্জা-নিবারণ হবার উপায় নেই। স্থতরাং মেসিনের বহুল প্রচার যাতে দেশে হয়, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করাই বোধ হয় অধিকতর স্বচ্ছ বুদ্ধির পরিচায়ক, কিন্তু দুঃখের বিষয় গান্ধীজীর রাজনীতি বাস্তব জীবনকে লক্ষ্য করেনি, তাই পলিটিক্সের সঙ্গে তিনি আধ্যাত্মিকতার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

কিন্তু গান্ধী-নীতির সমালোচনা আমার লক্ষ্য নয়। গান্ধীজীর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছি এই জন্যে যে গান্ধীজীর এই মত তাঁর

একক মত নয়—ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর যতই আধ্যাত্মিক বাতিক থাক না কেন, তাঁর বক্তব্যের মোটা কথাটা আরো অনেকের মুখেই শোনা যায়। কথায়-কথায় গোরুর গাড়ীর যুগে ফিরে চলো বলে যে হট্টগোল ওঠে বা যন্ত্র-শাসিত নগরের চিত্রকে মর্ম্মান্তিক করে এঁকে, তার পাশে সুন্দর সরল অনাড়ম্বর মহিমায় গ্রামের ছবিকে ফুটিয়ে যে কবিত্ব করা হয়, তার মূলেও একই বাতিক কাজ করছে বুঝতে হবে।

এই মতের পোষকতায় বলা হয় যে সভ্যতার শৈশবে মানুষের অভাব ছিল অল্প, উপকরণ ছিল কম। তাই জীবনধারণে তখন কোন দুরূহতা ছিল না—অত্যন্ত অনায়াসে অন্ন ও বস্ত্র সংগৃহীত হত এবং তাতেই মানুষ তৃপ্ত ছিল। তার মনোযোগের বেশীর ভাগটা বাইরে নিয়োজিত করতে হত না বলে সে ভেতরে দৃষ্টি দেবার সময় পেতো, তার ফলে তার আত্মিক শক্তি পূর্ণতা লাভ করতো। মানুষ যেদিন থেকে বাইরের সম্বন্ধে সজাগ হয়েছে, বাইরের দিকে নিজেকে বিস্তারিত করতে আরম্ভ করেছে, সেদিন থেকেই তার আত্মিক পুঁজি অপচিত হতে সুরু করেছে এবং মানুষের সেই অধঃপতন ঘটিয়েছে নাকি তথাকথিত বিজ্ঞান। সুতরাং মানুষকে বাঁচাতে হলে বিজ্ঞানের বিলোপ চাই—তাকে আবার ফিরে যেতে হবে সেই উপকরণহীন, উত্তেজনাহীন সরল অবস্থার ভেতর। রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, গান্ধীজী সকলেরই মত এই—শুধু মতই নয়, এই মতকে কার্যে রূপান্তরিত করার জন্যে তাঁরা তিনজনে তিনটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে, সেই আদর্শ পুনঃস্থাপনেরও উদ্যোগ করেছেন।

এইখানে বলে রাখি, এই তিনজন শ্রেষ্ঠ পুরুষকেই আমি সবিশেষ শ্রদ্ধা করি—কিন্তু তাঁদের প্রবর্ত্তিত এই মতবাদকে আমার শুধু অগ্রহণীয় নয়, অসার্থক বলেই মনে হয়। সভ্যতার অপরিণত অবস্থায় মানুষের প্রয়োজন সীমাবদ্ধ ছিল ঠিকই এবং সেই জন্যে বস্তুমুখিতা তার কম ছিল,

এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য্য, কিন্তু সে-অবস্থাটা কি মানুষের পক্ষে খুব গৌরবের ছিল? যে সরল অনাড়ম্বর আত্মজ্ঞান-ঋদ্ধ প্রাচীন সভ্যতার দোহাই কথায়-কথায় দেওয়া হয়ে থাকে, সেটা ত মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে একটা মাঝখানকার স্তর মাত্র—তার আগে মানুষের জন্তু-অবস্থার একটি সুবিস্তৃত ইতিহাস আছে, যখন মানুষ থাকতো গুহায়—থাকতো উলঙ্গ হয়ে—থাকতো কাঁচা মাংস খেয়ে। সেই আদিম আচ্ছন্ন অবস্থাকে কাটিয়ে ঐ উন্নত অবস্থায় মানুষ এসেছে যে-শক্তির বলে, সেই শক্তিই তাকে চালিয়ে এনেছে আধুনিক স্তর পর্য্যন্ত। এই মতের পোষকরা যা বলেন, তাতে মনে হয়, যেন মানুষের সভ্যতা মাঝখানকার ঐ স্তর পর্য্যন্ত এগিয়ে তারপর আর এগুতে পারে নি—সেইখানে দাঁড়িয়েই আশে-পাশে অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় আবর্ত্ত রচনা করে জীবনকে বিপর্য্যস্ত করে তুলেছে। কিন্তু অভিব্যক্তির সাধারণ আইন তা নয়, ক্রমিক স্ফুটতার দিকেই প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি। এই গতিকে অস্বীকার করা, জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্মকে অস্বীকার করার মতোই অসমীচীন।

জন্তু-জগতের দিকে তাকালে দেখা যায় যে আদিম অবস্থায় তারা যে রকম ছিল, ক্রম-পরিণতির ফলে তারা তা থেকে আকারে-প্রকারে অনেক বদলালেও, তাদের ব্যবহারিক জীবনের ধারায় কোন বদল হয়নি। এর কারণও সুস্পষ্ট। জন্তু-জগতে মন নামক বস্তু নেই—কাজেই মনের শক্তি দিয়ে দেহের অসম্পূর্ণতাকে তারা পূরণ করে নিয়ে সময়ের গতির সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে নি। তাদের আদিম অসহায়তা আজও অব্যাহত ধারায় বয়ে চলে এসেছে। আদিম মানুষও ছিল এমনি অসহায়। একক এবং বস্তু-নিরপেক্ষ ভাবে মানুষের সে অসহায়তা আজও সমানই আছে। কিন্তু সেই ক্ষতি পূরণ করে নিয়েছে মানুষ বহিরুপকরণ দিয়ে—যা তার মন উদ্ভাবন করেছে। এই উপকরণ হচ্ছে যন্ত্র এবং এ হচ্ছে আর কিছুই

নয়, তার সসীম শক্তির পরিপূরক (অসীম শক্তির আধার স্বরূপ), এ তারই প্রতিনিধি। খালি হাত-পায় মানুষের শক্তি কতটুকু? জলে সে অনুপায়, শূন্যে সে নিরাশ্রয়, স্থলেও তার অধিকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ব্যাধি-বিপদ নানা দিক থেকে তাকে ঘিরে রয়েছে—দৃষ্টি, শ্রবণ ও সহনশক্তি তার অত্যন্ত কম। এর ওপর সময় ও দূরত্বের ব্যবধান দিয়ে প্রকৃতি তাকে পদে-পদে কাবু করে রেখেছে ঠিক জন্তুদের মতো। কিন্তু তবু মানুষ নিরুপায় হয়ে প্রকৃতির হাতে আত্মসমর্পণ করেনি—পদে-পদে সে সহায়ক সৃষ্টি করে নিয়েছে এবং তারই সহায়তায় জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র আজ তার জয় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

যন্ত্রের সহায়তায় সাড়ে চার শ' মাইলের দূরত্ব এক ঘণ্টায় অতিক্রম ক'রে মানুষ সময় ও দূরত্বের নির্ব্বিশেষ অস্তিত্বকে আজ আক্রমণ করেছে —জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য যে অক্সিজেন, তাকে মুঠোয় ভরে আজ সে জলের তলায় ডুব দিয়েছে, মাধ্যাকর্ষণের বাধাকে উপেক্ষা করে উড়েছে শূন্যে, রঞ্জনরশ্মির সুতীব্র আলো দিয়ে জড়বস্তুর অন্তর্ভেদ করে তার রহস্য উদ্ঘাটন করেছে, লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত নক্ষত্রের প্রকৃতি নির্ণয় করেছে দূরবীক্ষণের সহায়তায়, আণবিক ব্রহ্মাণ্ডের ইন্দ্রিয়াতীত স্বরূপকে করতলগত করেছে অণুবীক্ষণ দিয়ে, ব্যাধির সঙ্গে লড়াই করেছে সিরাম, ভ্যাক্সিন, সার্জ্জারি এবং আরো কত বিচিত্র অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে। এমন কি, মানুষের স্বাভাবিক আকৃতি বা যৌন-সংস্থানকে বদলিয়ে ফেলেছে —পিতা-মাতার দেহ-সংযোগকে পরিহার করে জীবসৃষ্টি পর্য্যন্ত সম্ভব প্রতিপন্ন করেছে। আর কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য এবং ব্যবহার্য্য বস্তু ত করেইছে। এ সমস্তই তার যান্ত্রিক উৎকর্ষের পরিচায়ক।

আদিম অবস্থায় এই সব অসম্পূর্ণতা মানুষের অবশ্যই ছিল, যে-স্বর্ণযুগের দিকে আমাদের বরেণ্য চিন্তাশীলরা সলোভ দৃষ্ট নিক্ষেপ করে

রয়েছেন, সেদিনও এরা কম অনধিগত ছিল না। কিন্তু এদের অভাব বোধ ছিল চিরদিনই, নইলে সকল জাতির পুরাণ এবং উপকথাতেই অলৌকিক শক্তি বলে এই সব অদ্ভুত ব্যাপার নিষ্পন্ন করার এত কাহিনী থাকবে কেন? এই অভাব-বোধই মানুষকে চালিত করেছে এদের সম্ভাবনীয়তার দিকে এবং সেই চালনার মুখেই যন্ত্র আত্মপ্রকাশ করেছে, মানুষকে দিয়েছে তার অতি-মানুষী শক্তির অধিকার, যা জন্মলগ্ন থেকেই ছিল তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। আমাদের দেশের অত্যাশ্চর্য্য রক্ষণশীলতা বশে আমরা পুরাণ-বর্ণিত ব্যাপারগুলো সত্যি বলে গলাবাজী করি, কিন্তু সেই সমস্ত ব্যাপারই যখন হাতে-কলমে সম্ভব হয়ে ওঠে, তখন আবার বিশ্ব-শান্তির ধুয়ো ধরে তার প্রতিকূলতা করতে কোমর বাঁধি। অথচ জীবন ধারণের প্রয়োজনে নব্য বিজ্ঞানের যাবতীয় সৃষ্টির সুযোগ নিতেও আমরা কুণ্ঠিত হইনে। চশমা, ঘড়ি, মোটরকার, বৈদ্যুতিক বাতি, বেতারবার্ত্তা, ছাপাখানা, কোনটা না হলেই আজ চলে না—এগুলো আছে বলেই নিই না, না নিলে আমাদের চলে না বলেই নিই, তারপর যথেষ্ট অকৃতজ্ঞতা সহকারেই এদের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করি। (প্রাচীন আদর্শ ফিরিয়ে আনার জন্যে যে সমস্ত আশ্রম স্থাপিত হয়েছে, সেখানেও পদে-পদে আধুনিক উপকরণের ভীড় দেখলেই এ-কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হবে।)

বলা বাহুল্য, এটা কিছু দোষের নয়। (মানুষ এগিয়ে চলেছে প্রকৃতি চাইছে তাকে নিরীহ নির্জ্জীব কোলের খোকাটি করে রাখতে এবং আপন সৃষ্টির বৈচিত্র্যে আপনি স্বয়ং-সম্পূর্ণ থাকতে। মানুষ অবাধ্য ছেলের মতো প্রকৃতির অনুশাসন ভেঙে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, সে প্রকৃতির শক্তি হরণ করে, তাকে নূতন করে কাজে খাটিয়ে নিচ্ছে।। (প্রকৃতির সঙ্গে চলছে তার দুর্ণিবার লড়াই—এই লড়াই-ই হল তার সভ্যতা। এই লড়াইয়ের জন্যে দরকার তার অস্ত্রশস্ত্রের—বিজ্ঞান তাকে দিচ্ছে সেই অস্ত্র, তার

সুযোগ যদি সে না নেয়, তাহলে প্রবল প্রতিপক্ষের আঘাত এবং আক্রমণে সে নিজেই ছাতু হয়ে যাবে। তাই যখনই গোরুর গাড়ীর আমলে ফেরার কথা শুনি, তখনই ভয় পাই এই ভেবে যে তাহলে কি আমরা শান্তির নামে অবলুপ্তিকে সন্ধান করছি? কারণ পরিপূর্ণ শান্তি ত মৃত্যুতেই সুলভ! জীবন মানেই ত অশান্তি—বাঁচতে হলে অশান্তির হাত থেকে পরিত্রাণ নেই, আর অশান্তি আছে বলেই ত তাকে অতিক্রম করার চেষ্টায় সভ্যতার মতো জটিল জিনিষ গড়ে উঠতে পারছে। এ থেকে পিছুহটে আদিম সরলতায় ফিরে যাবার আয়োজন করা, তাই পূর্ণবয়স্ক মানুষের শৈশবে ফিরে যাবার চেষ্টার মতোই নিরর্থক। ওতে জীবনের মূল-নীতিকেই অস্বীকার করা হয়।

বলা হয়ে থাকে, প্রকৃতি মানুষকে কোন বাহুল্য দিতে চায় নি—মানুষ নিজের অপবুদ্ধির তাড়নাতেই বাহুল্যের সৃষ্টি করে জীবনকে অযথা জটিল করে তুলেছে। এর চেয়ে পুরাতন প্রশান্তি ঢের ভালো ছিল—কারণ তাতে আতিশয্য ছিল না বলেই অভাবের অনুভূতিও ছিল না। বলা নিষ্প্রয়োজন, তা সম্ভব হয় নি বলেই চিরকাল বজায় থাকে নি, আর থাকলেও কোন লাভ ছিল না। কারণ, মানুষের তাহলে কি ইতিহাস থাকতো? মানুষ যেখানেই তার ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, সেখানেই সে প্রকৃতির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে গেছে। প্রকৃতি কি তাকে গাছের ফল, আর নদীর জলের অতিরিক্ত কিছু দিয়েছিল হাতে তুলে? অরণ্য আর গুহা ছাড়া কোথায় দিয়েছিল তার আশ্রয়? কেন মানুষ ঘর-বাড়ী করলো, কেন চাষ-বাস আরম্ভ করলো, কেন ধাতুদ্রব্যের ব্যবহার আয়ত্ত করলো, আগুন আবিষ্কার করলো? কৃপণা প্রকৃতি এই সমস্ত মহামূল্য সম্পদ নিজের পেটের মধ্যে লুকিয়ে রেখে, মানুষকে মুষ্টিভিক্ষা দিয়েই বিদায় করতে চেয়েছিল। সেই কার্পণ্য-সঞ্চিত বিত্তকে মানুষ বিদ্রোহ

করে কেড়ে নিয়েছে—আদিম অবস্থায় নিয়েছে সরল উপায়ে, সময় যত এগিয়েছে, অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকের ঘাত-প্রতিঘাতে বুদ্ধি যত প্রখর হয়েছে, আত্মসাতের প্রণালীও হয়েছে তত জটিল।

আজকের জটিলতম অবস্থাকে যদি আমরা সমর্থন না করি, তাহলে যে সোপান-পরম্পরার ওপর এই চরম স্তরটি সংস্থিত, তার প্রাথমিক স্তর-গুলোর কোনটাকেও ন্যায়তঃ আমরা সমর্থন করতে পারি না। কিন্তু সেটা হবে সব চেয়ে বড় ভুল। এখন থেকে দু-হাজার বছর পরে একবার নজর চালানোর চেষ্টা করা যাক—আজকের এই অতি-যান্ত্রিক সভ্যতা তাদের কাছে নিতান্তই অপরিণত ঠেকবে, তখনকার তুলনায় আজকের এই সভ্যতাকে তারা হয়ত যথেষ্ট সরল বলেই মনে করবে। (অতীতের স্বুবর্ণ যুগেই যেমন সভ্যতার সব শেষ হয়ে যায় নি, আজকের যন্ত্র-যুগেও তেমনি সব শেষ হয়ে যাবে না—ক্রমিক অগ্রগমনের এরা এক-একটা ধাপ মাত্র —ধাপের পর ধাপ সভ্যতা এগিয়েই চলছে, মানুষের সুপ্ত বুদ্ধি ও প্রচ্ছন্ন কর্ম্ম-শক্তি নূতন নূতন পথে নিজেকে ক্রমাগত বিস্তারিত করে চলেছে। সত্যকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষণী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার ফলেই, এর বিরুদ্ধে আমাদের কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠে।)

(আধুনিক যন্ত্রোন্নতির বিরোধিতা করতে সাধারণতঃ যে যুক্তিগুলো উপস্থিত করা হয়, তা যন্ত্রগত নয়—সমাজগত। যন্ত্রের প্রসার এবং প্রতিপত্তি পুঁজিবাদীদের করতলে থাকায় হীনবিত্তেরা যন্ত্রের দাসত্ব করে, কিন্তু তার সহায়তা পায় না—এই কারণেই যন্ত্র-সমৃদ্ধ নাগরিক জীবনে আজ অশান্তি এসেছে।। কিন্তু এ দোষ যন্ত্রের নয়, সমাজের, যা পুঁজি-বাদের পোষক। তাই বলে যন্ত্রশাসনমুক্ত পল্লীজীবনকে ত আর আদর্শ বলা যায় না—যান-বাহন, অশন-বসন, চলাফেরা, আত্মবিকাশ ও আত্মবিস্তার, জীবনধারণের একান্ত স্বাভাবিক যে সুবিধাগুলো যন্ত্র সকলের

জন্যে সৃষ্টি করেছে, তা থেকে বঞ্চিত করে, সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তার ধোঁকা দিয়ে মানুষকে কর্ম্মবিমুখ করা ঠিক নয়। পল্লী-জীবনের মোহ সৃষ্টি করে, মানুষকে সভ্যতার ক্রমিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং ন্যূনতম অন্ন-বস্ত্রের গণ্ডীতে অন্তরীণ করাও সঙ্গত নয়। তাতে জাতির বা বিশ্বের কারুরই কল্যাণ হবে না। বরং যাতে সকলে প্রচুরায়ত ভাবে অবাধে এবং অল্প ব্যয়ে ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আধুনিকতম যন্ত্রের পূর্ণতম সুবিধা পায়, সেই দিকে নজর রেখেই আমাদের সমস্ত আয়োজন-আন্দোলন চালানো উচিত।

যন্ত্রকে স্থূল এবং একান্ত বহিরঙ্গিক বস্তু বলে উপেক্ষা করা শুধু ভুলই নয়, মূঢ়তা—যন্ত্র ছাড়া মানুষ কি, পশু ভিন্ন ?—মানুষের আত্মিক শক্তি, তার আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের প্রেরণাই তাকে যন্ত্রের উদ্ভাবনে নিয়োজিত করেছে। একদা অপ্রবুদ্ধভাবে মানুষ বিশ্বের তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছিল, আজ যন্ত্রের সাহায্যে সে সেই তত্ত্বেরই রহস্যোদ্ঘাটন করতে অগ্রসর হয়েছে—তাই এখনকার বিজ্ঞান এবং দর্শন একটি বিশেষ জায়গায় এসে পরস্পরের সঙ্গে মিলেছে—যেখানে ভেতরে ও বাইরে কোন বিভেদের সীমারেখা নেই। যন্ত্র সেই মিলনের ঘটক। কিন্তু কাছের থেকে দেখি বলেই মূল জীবন-বেদ থেকে যন্ত্রকে আমরা আলাদা করে দেখি। তাই দেখি যন্ত্রকে একটা মূঢ়, নির্ব্বোধ, নির্ব্বাক, অমিত শক্তিশালী দৈত্যরূপে। কিন্তু আসলে এ ত একটা প্রতীক মাত্র—এর পেছনে রয়েছে ক্রিয়াশীল, মননশীল, উন্নতিশীল মানুষের মন—যা আজ জীবাত্মা ও পরমাত্মা, জড় ও চৈতন্য, ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে ক্রমাগত অভিযান চালিয়ে চলেছে।

এই অভিযানের ফলেই জন্মাচ্ছে মানুষের মনে পাওয়ার ওপর অসন্তোষ এবং না-পাওয়ার জন্যে স্পৃহা। প্রতিনিয়ত উপকরণের পর উপকরণ সৃষ্টি

করে মানুষ সেই অপূর্ণতার ঊর্দ্ধে উঠতে চাইছে। মাঝখানকার এই স্তরটা লক্ষ্য করলে, অবশ্য মানুষের বাস্তব অবস্থাকে মোটেই সুখের বলে মনে হবে না, কিন্তু এই অ-সুখের পথ ধরেই সভ্যতা ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। আশা করা যাচ্ছে, এমন একদিন আসবে, যেদিন আর এই অসম্পূর্ণতার দুঃখ মানুষকে পেতে হবে না—যন্ত্র-শক্তির অপরিমেয় আধিপত্যে মানুষ যাবতীয় অতৃপ্তি ও অসন্তোষের হাত থেকেই মুক্তি পেয়ে যাবে। যান্ত্রিক খাদ্য উৎপন্ন করে প্রকৃতির কার্পণ্য ও বঞ্চনাকে সে প্রতিহত করবে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি ঘটিয়ে ব্যাধি ও যন্ত্রণার উপদ্রব দূর করবে, ভূমিকম্প, বন্যা, মহামারী, দুর্ঘটনাকে করে তুলবে অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভাব্য—জন্ম-মৃত্যুকে নিয়ে আসবে হাতের মুঠোয়। অর্থাৎ মানুষকে আজ যে অবস্থায় দেখছি, তার সে রূপ আর থাকবে না—তার অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্ভাবনী-বৃত্তির সহায়তায় সেদিন পরিপূর্ণ মূর্ত্তিতে প্রকাশমান হবে এবং তাকে সত্যিই করে তুলবে অমৃতের পুত্র। এটা জপ, তপ, ধ্যানধারণায় হবে না, হবে বিজ্ঞানের শক্তিতে। মনীষীরা বলছেন, সেই দিন নাকি পৃথিবীর সামনে!

কিন্তু আর একটা দিকও আছে। সেদিক থেকে ভেবে অনেকে যন্ত্র-শক্তির এই অতিপ্রসারকে নিন্দাও করছেন। তাঁরা বলছেন, যন্ত্রের উৎকর্ষ যেদিন চরমে পৌঁছুবে, সেদিন এক কোটি লোকের কাজ নির্ব্বাহিত হবে একটি যন্ত্রের দ্বারা এবং সে যন্ত্র চলবে আপন প্রাণ-শক্তির জোরেই। তখন মানুষের আর কোনই প্রয়োজনীয়তা থাকবে না—অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ-সাধনের ব্রত নিয়ে যার জন্ম, জন্মগ্রহণের পর সে-ই বিশ্বে একক প্রভুত্ব স্থাপন করবে এবং মানুষকে অনাবশ্যক বোধে ছেঁটে বাদ দিয়ে দেবে। কর্ম্মহীন, উদ্দেশ্যহীন, প্রয়োজনহীন কোটি কোটি মানুষ সেদিন নিজের সৃষ্ট যন্ত্রের হাতেই নিজের সমাপ্তি দেখতে পাবে। ইতিমধ্যেই নানা স্বতোগামী

যন্ত্র, রোবট ইত্যাদি প্রত্যক্ষ জীবনের ক্ষেত্র থেকে মানুষকে অনেকখানি সরিয়ে দিয়েছে, যন্ত্র-শিশু পর্য্যন্ত বীক্ষণাগারে দেখা দিতে সুরু করেছে— সুতরাং সে-দুর্দ্দিন এলো বলে! এঁরা বলছেন, মানুষের ভেতর শিব এবং অশিব দুই শক্তিই প্রচ্ছন্ন আছে—অতি-লোভ এবং অতি-প্রয়োজনের অজুহাতে মানুষ শুধু অশিব শক্তিকেই জাগিয়ে তুলছে, সেই দুরন্ত অবাধ্য শক্তি ফাউষ্টের প্রেতাত্মার মতোই লক্ষ লক্ষ আশু কল্যাণের ফরমায়েস জুগিয়ে, শেষকালে পারিশ্রমিক স্বরূপ একদিন মানুষের সমস্ত সভ্যতাটাকেই দাবী করে বসবে। সুতরাং আজকের এই বহুমুখী সুখ-সুবিধা ভাবী উন্নতির পূর্ব্বাভাষ নয়, এ সেই বিরাট ধ্বংস-যজ্ঞেরই সূচনামাত্র।

বলা বাহুল্য সেদিন আমরা থাকবো না, সুতরাং তা নিয়ে আমাদের অনর্থক উদ্বেগ প্রকাশও নিস্প্রয়োজন। তবে পৃথিবীর ভবিষ্যৎকে এতখানি ভয়াবহ করে চিত্রিত করার পেছুনে দুটো মনোভাব কাজ করছে, এ বেশ বোঝা যায়—এক হচ্ছে, নীতিশাস্ত্রানুমোদিত সেই সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের মোহ, যা বহু শতাব্দীর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, আর হচ্ছে, অক্ষমতার ক্ষোভ, যা অন্যে পাচ্ছে অথচ আমরা পাচ্ছি না—এমন জিনিষের ভেতর ভালো কখনই থাকতে পারে না! এই দুই মনোভাবই যে পরস্পরের অনুপূরক তা আমি আগেই দেখিয়েছি। কিন্তু এজন্যে দায়ী ত বিশ্বের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা, যা পরিবর্ত্তিত হওয়া হয়ত একদিন অসম্ভব হবে না। মানুষের সেই শুভ ভবিষ্যতের কল্পনাতেই বা আমরা কেন উদ্বুদ্ধ না হই? কেন আমরা এই কথাই মনে করি না যে ভাবী সমাজে নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবনের সঙ্গে মানুষের উপযোগিতা আরও বেড়ে যাবে এবং ধনিক ও বণিকদের ব্যবসায়িক একাধিকার রক্ষা বা রাষ্ট্রনায়কদের যুদ্ধ-বিগ্রহ চালানো ছেড়ে, যন্ত্র সেখানে হবে মানুষের সত্যকার বন্ধু ও সেবক?

[৪] সভ্যতা ও অবদমন

আদিম অবস্থায় মানুষের জ্ঞানের গণ্ডী ছিল সীমাবদ্ধ। বিশ্ব-ব্যাপারের বহু রহস্যই ছিল তার কাছে অনাবিষ্কৃত—প্রকৃতির হাতে সে ছিল নিতান্ত অসহায়। খাদ্য সংগ্রহ, বাসস্থান সন্ধান, বংশ বৃদ্ধি, আর বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ, এই ছিল তার জীবনের লক্ষ্য এবং এদিক থেকে পশুর সঙ্গে তার বিশেষ কোন তফাৎই ছিল না। ধীরে ধীরে তার ভেতর জ্ঞানের বিস্তার ও বুদ্ধির বিকাশ হল—বাইরে থেকে যেখানেই সে পেলো ধাক্কা, সেখানেই সে মননশক্তি প্রয়োগ করে আত্মরক্ষার পথ খুঁজতে আরম্ভ করলো। এই ভাবেই এলো ঘর-বাড়ী তৈরী করা, বিধিবদ্ধ উপায়ে চাষ করা, দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করা, দুর্গ-পরিখা নির্ম্মাণ, ধাতুদ্রব্যের ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-পানীয় ইত্যাদির নিত্য নূতন আবিষ্কৃতি। ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠলো সমাজ। ধর্ম্ম এলো, শিল্প-সাহিত্য এলো, বিবাহ, আচার-অনুষ্ঠান অনেক কিছু এসে, আদিম সরল জীবনকে রীতিমতো জটিল করে তুললো।

(দর্শন বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্যে সমৃদ্ধ, যন্ত্রশক্তি সমন্বিত আজকের যে জীবন, তার স্থিতি এই আদিম ভূমিকার উপর।) এদিক থেকে সভ্যতার একটা স্পষ্ট অর্থ আমরা বুঝি—তা হচ্ছে ধাপে-ধাপে আদিম বর্ব্বরতার অবস্থাকে ছাড়িয়ে ওঠা। যে সোপান পরম্পরার ভেতর দিয়ে মানুষের এই অগ্রগতি হয়েছে, তার প্রত্যেকটিকেই আমরা বলি সভ্যতার এক একটি স্তর। এক স্তর থেকে আর এক স্তরে, তা থেকে আবার এক স্তরে মানুষ ক্রমাগত এগিয়েই চলেছে—এর বিরাম নেই। আর তা নেই বলেই সভ্যতা জিনিষটা আমাদের কাছে একটা চলমান ক্রমোন্নতির স্রোত

বিশেষ। আদি যুগ থেকে মধ্যযুগে, তা থেকে আধুনিক যুগে, মানুষের ইতিহাস ক্রমশঃ জটিলতর, বিচিত্রতর, সূক্ষ্মতর হয়েই এসেছে—এক যুগের অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা করেছে আর এক যুগকে পথ নির্দ্দেশ এবং সে যুগের প্রয়াস-প্রচেষ্টার বর্গফল দিয়েছে তার পরের যুগকে প্রেরণা।

কিন্তু সভ্যতার এই যেমন একটা দিক, তেমি আছে আর একটা দিক, যেখানে মানুষ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হারিয়েছেও প্রচুর। সে হল সভ্যতা-জনিত অবদমনের ফল। আদিম মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি ছিল সবলতর, তাদের চরিতার্থতার পথ ও পদ্ধতিও ছিল অনেক বেশী প্রশস্ত। যৌন ব্যাপারে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে তার কোন জবাব-দিহি ছিল না, বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে লড়াইয়ে তাকে কোন আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানের মুখ চাইতে হত না—যথেচ্ছ স্বাধীনতার অপরিমিত ব্যবহারে জীবন তার ছিল যোল-আনা স্বপ্রতিষ্ঠ। সভ্যতার যত প্রসার হয়েছে, ততই তার স্বাধীন প্রবৃত্তির মুখে পড়েছে বিধি-নিষেধের লাগাম—শক্ত হতে হতে ক্রমেই তা অনতিক্রমনীয় হয়ে উঠেছে! সভ্য মানুষের বহির্জীবনে তাই স্বাধীনতার সীমা এসেছে ছোট হয়ে। বাইরের এই ক্ষতিপূরণ করার তাগিদেই সভ্য মানুষের জীবন ধারা হয়ে পড়েছে বড় বেশী রকম অন্তর্মুখী এবং তার ফলও ফলেছে।

আদিম মানুষ তার প্রতিপক্ষকে যখন হাতে পেয়েছে, ছিঁড়ে কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে, নয়ত নিজে তাই হয়েছে। কাম চরিতার্থ করার জন্যে চালিয়েছে নির্লজ্জ নির্ম্মমতার অভিযান। সভ্য মানুষ তার বদলে শত্রুকে শিক্ষা দিতে নেয় আদালতের আশ্রয়, কামবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য করে আইনসম্মত উপায়ে পাণিগ্রহণ। বলা বাহুল্য বাইরে থেকে এসবের বেশ একটু সুষমাই দেখা যায়—পশুর মতো প্রত্যক্ষ উপায়ের সাহায্য না নিয়ে, পরোক্ষভাবে বুদ্ধির প্রবর্ত্তনা

দিয়ে মানুষ প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধন করে এবং সেই ভাবে সভ্য-জীবনের শ্রী ও শৃঙ্খলা বাঁচিয়ে চলে। কিন্তু সত্যি সত্যিই মানুষ যে তার আদিম পশুত্বকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি, শুধু বাইরে তার ওপর একটা শিষ্টতার আবরণ টেনে দিয়ে ভেতরে তাকেই সযত্নে লালন করে চলেছে, এটা বোঝা যায় অনায়াসেই। আজ সে দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে সেই হত্যা হানাহানিই করে, সমাজ বহির্ভূত পতিতাদের সংসর্গে সেই যৌন যথেচ্ছাচারই চালায়—শুধু লোক-সাধারণের দৃষ্টিতে সেটা ঢাকা দিয়ে রাখতে চায় এই জন্যে যে সভ্যতার প্রভাবে যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়সেবা ও খুনোখুনিকে আমরা নিন্দনীয় ভাবতে শিখেছি।

এই ভাবে চাপা-দিয়ে চলবার বুদ্ধি ও তার অনুকূল উপাদান-উপকরণ আবিষ্কারও তাই সভ্যতার সঙ্গে-সঙ্গেই বেড়ে চলেছে। প্রকৃতির রহস্য-ভাণ্ডার তোলপাড় করে এক দিকে মানুষ যেমন জলে স্থলে শূন্যে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে, স্বাভাবিকভাবে যেখানে তার ছিল যে বাধা, কৃত্রিম উপায়ে সেখানেই করেছে তার ক্ষতিপূরণ, অন্যদিকে তেমনি তার প্রচ্ছন্ন বর্ব্বরতাকে বুদ্ধির পালিস দিয়ে মানানসই করে নেবার জন্যেও করেছে লক্ষ লক্ষ উপায় উদ্ভাবন। ব্যভিচার করা এবং জন্ম-নিরোধকের সাহায্যে তার পরিণতিকে এড়ানোই হক, আর সরাসরি অস্ত্রাঘাত না করে, ইনজেক্সনের সাহায্যে শরীরে প্লেগের বীজাণু চালিয়ে দেয়া এবং সেই ভাবে হত্যাপরাধ থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টাই হক—সর্ব্বত্রই চলেছে সেই অন্তর্নিহিত পশুত্বের ক্রিয়া, শুধু বিশেষত্ব এইটুকু যে ওপর থেকে ধরবার উপায় নেই।

আদিম মানুষের আচরণ ছিল নৃশংসতর, কিন্তু তাকে আবৃত করার তার কোন তাগিদ ছিল না, কারণ তাকে দোষ বলে বুঝবার সামর্থ্যই ছিল না তার। সভ্যতার প্রভাবে এগুলিকে আধুনিক মানুষ

জানে দোষ বলে, তবু এগুলির অনুষ্ঠান করে—প্রতি মুহূর্ত্তে তাই সে নিজের পদচিহ্ন মুছে চলতে চায়। এই যে ভেতরের তাগিদ ও বাইরের প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে বিরামবিহীন সঙ্ঘর্ষ, এর ভেতর দিয়েই সভ্য মানুষের জীবন চলে বলে সে জীবনে অবদমনের এত উৎপাত! ইচ্ছা মাত্রেই শত্রু নিধন, উদ্রেক মাত্রেই কামতৃপ্তি, আবশ্যক মাত্রেই শরীর-ধর্ম্ম পালন আমরা করতে পারি না—পুলিশ আছে, জনসাধারণ আছে, পরলোক আছে। পদে-পদে বাধা, পদে-পদে বিধি অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে আমাদের গলা আঁকড়ে রয়েছে। অথচ এই সমস্ত স্বাধিকারের মোহ আমরা ভুলতে পারি নি, তাই এই সমস্ত বিধিবিধানকে ফাঁকি দেবার প্রয়োজনেই আমাদেরকে বের করতে হয়েছে রকমারি কল-কৌশল! (অবশ্য অনেকগুলো ব্যাপারে দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে আমাদের ভেতরকার প্রবৃত্তিগুলোও এমন ভাবেই পোষ মেনে গিয়েছে যে অর্থ না বুঝে, সার্থকতা না ভেবে, আমরা তাদের দাসত্ব করি। সম্পূর্ণ একক ভাবে আপন ঘরেও যে আজ উলঙ্গ থাকতে পারি না, কি তার কারণ? সে ঐ পুরুষাগত অবদমনেরই ফল।)

যারা বাইরের কল-কৌশলে ঢেকে ভেতরকার প্রবৃত্তিগুলোকে চরিতার্থ করতে অসমর্থ, তাদের ভেতরও অবদমনের আর একটা রূপ দেখা যায়—তারা নকল প্রতীকের আশ্রয়ে আসলের অভাব পূরণ করে থাকে। (আদিম মানুষের আরণ্যক জীবনকে আজ আমরা ফিরিয়ে আনতে চাই টবে গাছ পুঁতে, বাড়ীতে জীব-জন্তু পুষে—আদিম মানুষের যৌন স্বাধীনতাকে উপভোগ করি কলা-চর্চ্চার ভেতর দিয়ে, তার গোষ্ঠী-জীবনের সংগ্রামশীলতাকে বাঁচিয়ে রাখি রাজনীতিক হট্টগোল দিয়ে। ভেতরে তরঙ্গিত হচ্ছে প্রবল ও প্রতিরোধহীন ইচ্ছাশক্তি—বাইরে বাধার অন্ত নেই, যেখানে বাধা অতিক্রমের বাঁকা

পথ আছে, সেখানেও মাথা খাড়া করে রয়েছে সংস্কৃতির অহঙ্কার। সুতরাং সাধারণের চেয়ে সংস্কৃতিবানদের অবদমনের প্রয়োজন আরো বেশী এবং এই কারণে তাদের জীবনধারা আরো বেশী জটিল।)

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে মানুষের ইতিহাস দিনের পর দিন যতই এগিয়ে এসেছে, ততই তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি যেমন নূতন নূতন পথে প্রসারিত হয়ে গেছে এবং তার ফলে তার বস্তু-জীবন ও ভাব-জীবনে নব নব সঞ্চয় ও সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছে, তেম্নি তার স্বাভাবিক ও সহজাত বৃত্তিগুলিকে আবেষ্টনী এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজনে এসেছে সুকঠোর অবদমনের তাগিদ। (অর্থাৎ মানব-সভ্যতার একটা দিক হল আহরণ, আর একটা দিক অবদমন—এই দুয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই সভ্য মানুষের জীবন প্রকৃতির এলাকা থেকে এমন দূরে এসে পড়েছে।) এত দূরেই এসেছে যে আজ আর প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের কোন যোগ আছে বলেই মনে হয় না। প্রকৃতির আলো বাতাস জলকে আজ আমরা পাই কৃত্রিম যন্ত্রের ভেতর দিয়ে, কৃত্রিম উপায়ে করি খাদ্য-পানীয় প্রস্তুত, পোষাক-পরিচ্ছদ, গাড়ী-ঘোড়া ইত্যাদির প্রভাবে খোলা হাওয়া, উন্মুক্ত আকাশ, অবারিত মৃত্তিকার সঙ্গে আমাদের সকল সংস্রবই গেছে ছিন্ন হয়ে। প্রকৃতির যে-সমস্ত শক্তি জীবদেহের অনুকূল, তা থেকে বঞ্চিত হয়ে আমরা তাই আজ শারীরিক স্বাস্থ্য হারাচ্ছি এবং কৃত্রিম ওষুধ দিয়ে সেই ক্ষতিপূরণ করছি।

(এই কৃত্রিমতার প্রভাব আমাদের মন পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়েছে এবং সেদিক থেকেও আমরা কম ঠকছিনে।) ক্রমাগত চেপে চেপে চলার ফলে, আমাদের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলো ভেতরে অযথা তরঙ্গিত হতে হতে অনেক স্থলে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ছে, কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ধরছে বিকৃত রূপ। সভ্য সমাজে হিষ্টিরিয়া, নিউরসথেনিয়া, উন্মাদনা

প্রভৃতির দ্রুত প্রসার কি জন্যে হচ্ছে, তা আমরা সকলেই জানি। আগেই বলেছি ভব্যতার পালিস দিয়ে আদিম বৃত্তির উদ্দামতা যথা-সম্ভব টিঁকিয়ে রাখবার চেষ্টা হয়েছে—তারি জন্যে চরমতম সভ্যতার স্তরে এসেও মানুষ বেশ্যাবৃত্তিকে স্বীকার করেছে, যুদ্ধকে মেনে নিয়েছে এবং চুরি, জুয়াচুরি, জালিয়াতি. ঠকামিকে বিতাড়িত করে নি। তবু ব্যাপক ভাবে এদের প্রয়োগ যে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, সেকথা বলাই বাহুল্য—আর সেই জন্যেই ব্যক্তি-জীবন সভ্যতার প্রভাবে বিকৃত না হয়ে পারে নি। বাইরে থেকে দেখলে যাঁকে অত্যন্ত শিষ্ট সজ্জন বলে মনে হয়, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, তাঁরো ভেতর একাধিক উদ্ভটপণা রয়েছে—অন্যান্য ব্যাপারের চেয়ে কাম-ব্যাপারেই এর প্রকাশ অধিকতর স্পষ্ট। কেউ আত্মরতি পরায়ণ, কেউ সমজাতীয় আসক্তি-গ্রস্ত, কারুর পশুপ্রীতি প্রবল—এ ছাড়া মূত্রপায়ী, শুক্রভোজী, পদলেহী, মুখমেহী, নানাশ্রেণীর বিকারগ্রস্তই আছেন, যাঁদের এই দিকগুলি ছাড়া আর সব দিকেই বেশ স্বাভাবিক সুস্থতা দেখা যায়। এমন কি, সমাজে এবং রাষ্ট্রে যাঁদের স্থান অনেকের ওপরে, তাঁদের মধ্যেও এই সব জিনিষের অভাব নেই।

যাঁরা ঠিক এই স্তরে নেমে আসেন নি—কোন না কোন একটা সুকুমার বিদ্যার চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন, যেমন কবি-সাহিত্যিক, ধর্ম্মগুরু, স্বদেশকর্ম্মী—বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাঁদের মনের ধারা-ধরণও যথেষ্ট সুস্থ নয়। উপকরণানুরাগ বা প্রতীকোপাসনার ভেতর দিয়ে তাঁরা বাস্তবকে ভুলে থাকেন এবং তথাকথিত কল্প-লোকের আশ্রয়েই তাঁদের প্রবৃত্তিগুলির চরিতার্থতা লাভ করে থাকে। সামাজিক জীবনের গণ্ডীতে এলে এঁরাও যে কি ভীষণ বিকৃত ও কৃত্রিম চেহারা ধরতে পারেন, তার পরিচয় আমরা হামেশাই পেয়ে থাকি।

সাহিত্যসেবী, দেশসেবী, ধর্ম্মজ্ঞ ইত্যাদির ব্যভিচার-কাহিনী তাই সব দেশেই প্রসিদ্ধ। (কিন্তু এর জন্যে তাঁরা দায়ী নন, দায়ী সভ্যতা, যার বাধ্যতামূলক অবদমন তাঁদের করেছে বাস্তববিমুখ এবং সে-বিমুখিতা তাঁদের মস্তিষ্কক্রিয়াকে চালিয়েছে বিকৃতির দিকে। সুতরাং একেবারে বর্ব্বরতার স্তরে যারা নেই, তারা ছাড়া বিকৃতি প্রায় সকলের পক্ষেই আজ অপরিহার্য্য এবং এই হল সভ্যতার সর্ব্বশেষ ফসল।)

(এখনকার কতক চিন্তাশীল এই কৃত্রিমতার বিরোধী হয়ে উঠেছেন, তাঁরা আবার নগ্নতাকে ফিরিয়ে আনার, প্রকৃতিতে গিয়ে মিশবার আন্দোলন চালিয়েছেন। কিন্তু সে বৃথা! ধাপের পর ধাপ অতিক্রম করতে করতে, মানুষ আজ এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, এখান থেকে পিছুহটে অতীতে যাবার তার আর উপায় নেই।) আজকের এই শিল্প-সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ, যন্ত্রোপকরণ-চালিত, রাজনীতি ও সমাজনীতি নিয়ন্ত্রিত জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে-চুরে আমরা আর বর্ব্বর হতে পারি না—এগুলোকে রাখতেই হবে বাঁচিয়ে। আর এগুলি থাকলেই, এদের ক্রিয়ার সঙ্গেই থাকবে প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ যতক্ষণ সভ্যতা থাকবে, ততক্ষণ থাকবে অবদমন—এবং অবদমন থাকলেই আসবে কৃত্রিমতা, আসবে অস্বাভাবিকতা, আসবে বিকৃতি।

[৫] সভ্যতা বনাম বর্ব্বরতা

আদিম অবস্থা থেকে সভ্যতার স্তরে আসতে মানুষকে অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছে। এই স্তরগুলো মানুষ একের পর এক করে অতিক্রম করেছে তার অন্তর্নিহিত মননশক্তির প্রভাবে—বাইরে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব এবং বিপদের আশঙ্কাই দিয়েছে তার আভ্যন্তরীণ বৃত্তিগুলিকে মুহুর্মুহু বিকশিত হয়ে উঠবার তাগিদ। দৈবাগত ফলমূল ও জীব-জন্তুর ওপর খাদ্যের জন্যে এবং যদৃচ্ছালব্ধ গুহা-গহ্বর, অরণ্য ও পর্ব্বত-প্রান্তরের উপর বসবাসের জন্য নির্ভর করার অনিশ্চয়তাই আদিম মানুষকে দিয়েছিল বিধিবদ্ধ প্রণালীতে শস্য-উৎপাদন, গৃহ-নির্ম্মাণ ইত্যাদির প্রেরণা। তার থেকেই এসেছে ধীরে ধীরে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ, দুর্গ গঠন, আরো বিবিধ উপায়ে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার শিক্ষা। এসেছে ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ঔষধ, শীতাতপ নিবারণের জন্যে পোষাক-পরিচ্ছদ, জলপথ অতিক্রম করার জন্যে নৌকো, ভার বহন ও যাতায়াতের জন্যে শকট, কৃষি কাজের জন্যে, গমনাগমনের জন্যে, খাদ্য আহরণের জন্য পশুপালন, অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য ধাতুর ব্যবহার—অন্ধকার বিতাড়ন, শীত নিবারণ, রন্ধন ইত্যাদির জন্যে আগুনের, ও স্নান, পান, শস্য-উৎপাদন ইত্যাদির জন্যে জলের ব্যবহার। অর্থাৎ প্রাত্যহিক জীবনের যে-সমস্ত উপায় ও উপকরণ আজ আমরা অত্যন্ত সহজেই আয়ত্ত করে নিয়েছি, দিনের পর দিন যা করে চলেছে দ্রুত উন্নতি, একদা মানুষকে বহু আঘাত প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে অন্ধের মতো মাথা ঠোকাঠুকি করেই তা বার করতে হয়েছে।

এই হল মানব-সভ্যতার ব্যবহারিক দিক। এদিকটার বিকাশ,

বিস্তার ও উৎকর্ষ হয়েছে, প্রতিকূল বহিঃসংস্থানের সঙ্গে সংগ্রাম করে নিজেকে টিঁকিয়ে রাখার জন্যে, মানুষের মানসিক শক্তিকে চরমভাবে মন্থন করার চেষ্টা থেকে। কিন্তু এইখানেই যদি মানুষের শক্তির শেষ হয়ে যেতো এবং একক ভাবে নিজেকে ও সমগ্রভাবে গোষ্ঠীকে ঘরে-বাইরে নিরাপদ স্বাচ্ছন্দ্যে এবং ক্রমবর্দ্ধমান শান্তিতে রাখাই যদি হতো মানুষের একমাত্র ইতিহাস, তাহলে মানব সভ্যতা হতো নিতান্তই স্থূল। সৌভাগ্য বশতঃ মানুষের মননশীলতার ভেতর উদ্ভাবনীশক্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিকশিত হয়েছে অলঙ্করণশক্তি, যা দিয়েছে তার সমস্ত সৃষ্টিকে শ্রী ও সুষমা—তার অতিরিক্ত আর একটা জিনিষ দিয়েছে, সে হল প্রাত্যহিক প্রয়োজনের এলাকা ছাপিয়ে জীবনকে বড় করে দেখবার প্রেরণা। যেমন-তেমন একটা ঘর হলেই মানুষের থাকা এবং যা-তা একটা আহার্য্য হলেই মানুষের খাওয়া চলতো। এম্নি চলতো সব বিষয়েই। কিন্তু মানুষ তা পর্য্যাপ্ত মনে করে নি। তাই সে ঘর-বাড়ী, যান-বাহন, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-পানীয়, সব কিছুকেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য দিয়ে সুন্দর করে গড়ে তুলেছে। এই যে বাহুল্যটুকু দিয়ে অপরিহার্য্যের সীমাকে প্রসারিত করে নেওয়া, এইখানেই হলো সভ্যতার শিষ্টতা।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আগেই বলেছি যে প্রাত্যহিক জীবনকে বস্তু-সীমার বাইরে নিয়ে গিয়ে দেখবার প্রেরণাও দিয়েছিল এই অলঙ্করণী বুদ্ধি। তাই মানুষ অরণ্য-পর্ব্বত, আকাশ-জলের পশ্চাৎ পটে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির শোভা দেখে, পাখীর গান, বাতাসের মর্ম্মরধ্বনি, জলের কলস্বর শুনে এবং একে অন্যের সঙ্গে প্রয়োজন সিদ্ধির তাগিদে ভাষা বিনিময় করে সন্তুষ্ট থাকে নি। সে এই সমস্ত শোভাকে অঙ্কনের মধ্য দিয়ে, এই সমস্ত ধ্বনিকে সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে এবং এই সমস্ত ভাষাকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নূতন করে সৃষ্ট করেছে, যা থেকে এসেছে তার শিল্প ও

সাহিত্য। বিশ্ব-ব্যাপারের বিবিধ বৈচিত্র্য, বিভিন্ন অবস্থান্তর, দিন-রাত্রির আনাগোনা, ঋতুর পরিবর্ত্তন, ফুল-ফলের আবির্ভাব-অন্তর্ধান, মানুষের জন্ম-মৃত্যু, এ সমস্তও তাকে ভাবিয়েছে। এই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ঘটনার মালাকে গ্রথিত করে, তাদের পেছনে কোন ক্রিয়াশীল সত্তার অস্তিত্ব মানুষ অনুভব করেছে—এবং তাকে কেন্দ্র করে আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-কর্ম্মের সুদীর্ঘ বিধি-পদ্ধতি সৃষ্টি করেছে। নিজের জন্ম-কর্ম্ম, বিবাহ, বংশবৃদ্ধি থেকে সুরু করে ক্ষয়, অপচয়, মৃত্যু পর্যন্ত সব-কিছুকেই সে এই পরম সত্তার অভিপ্রায় সঞ্জাত ক্রিয়া বলে মনে করেছে। এইভাবেই এসেছে তার ধর্ম্ম। খাওয়া-পরা, বাঁচা, বংশবৃদ্ধি করা এবং ব্যাধি-বিঘ্ন উৎপাত-অপঘাতের হাত থেকে নিজেকে ও গোষ্ঠীকে নিরাপদ করার প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে সমাজ, রাষ্ট্র, ব্যবসা—আর নিজের অনুভূতি, চিন্তা, কল্পনা ও কামনাকে বিকশিত করার প্রয়াস গড়ে তুলেছে শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য। মানুষ যতটা অংশে জন্তু, ততটার জন্যে প্রথম, এবং যে অংশে সে জন্তুর অতীত, তার জন্যে দ্বিতীয় পর্য্যায়—এই দুয়ের সমন্বয়েই মানুষের সভ্যতা। একটা হল তার স্থূল রূপ, অন্যটা হল দিব্য রূপ।

আজকে আমরা সভ্যতা বলতে যে জটিল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বুঝি, তা এইভাবে দিনে দিনে তিলে তিলে বিকশিত, বিস্তৃত ও পল্লবিত হয়েছে। ইতিহাসের আদি থেকে বয়ে এসেছে এর ধারা এবং অদ্যাবধি অব্যাহত বেগে এ বয়ে চলেছে—কোন এক জায়গায় থেমে দাঁড়ায় নি, তার কারণ ধাপে ধাপে মানুষ যতই এগিয়ে এসেছে, যতই প্রত্যক্ষ ও ভাব-জীবনের ওপর তার অধিকারের প্রসার হয়েছে, ততই সে পেয়েছে নূতনতর বিচিত্রতর পথের সন্ধান। এই করতে করতেই আদিকালের সরল সভ্যতা কালক্রমে জটিল হয়ে উঠেছে। তাতে এসেছে বহু অনুষ্ঠান-

প্রতিষ্ঠান, বহু উপায়ন-উপকরণ, মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিছক বিধেয় রূপে তারা আজ লক্ষ লক্ষ হাত বাড়িয়ে মানুষকে জড়িয়ে ধরেছে। এই জটিলতা ও সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যারা যতখানি এগুতে পেরেছে, তারাই ততখানি সভ্য, ইতিহাসে তারাই ততখানি অগ্রবর্ত্তী।

কিন্তু উদ্ভাবন ও অলঙ্করণের সহজাত প্রেরণা থেকে মানুষ যেমন তার জন্তু-জীবনকে বহু পিছনে ফেলে এসেছে, কি বিশ্বলোকে, কি অন্তর্লোকে, তার অসামান্য প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে হারিয়েও এসেছে অনেক কিছু। আদিম অবস্থায় মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির স্ফুরণ ও চরিতার্থতার যে অবাধ স্বাধীনতা ছিল, সভ্যতা ক্রমশঃ যত জটিল হয়ে এসেছে, ততই তা নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে। বস্তুতঃ সভ্যতা বলতেই আজ আমরা সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের এমন একটা অবস্থাকে বুঝি, যাতে যথেচ্ছভাবে বাঁচবার অধিকার কারুর নেই, সে তথাকথিত ভালোর দিকেই হক, আর তথাকথিত মন্দের দিকেই হক। সমাজের, রাষ্ট্রের, ধর্ম্মের লক্ষ লক্ষ আইন-কানুন বিধি বিধান তার অবাধ আত্ম-বিকাশের পথকে আটক করে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে বলবেন, এই যে নিয়ন্ত্রণ, এই ত হল সভ্যতার আসল দান। দান হতে পারে, কিন্তু মানুষকে যে মূল্য দিয়ে এটা কিনতে হয়েছে তার পরিমাণ কম নয়।

সভ্যতার এই নিয়ন্ত্রণের ফলে মানুষ তার সহজাত বৃত্তিগুলিকে অবদমিত করতে অভ্যস্ত হয়েছে, কিন্তু তাই বলে সেগুলোকে সে উচ্ছিন্ন করতে পারে নি। আদিম অবস্থায় প্রকৃতির সঙ্গে তার ছিল সুনিবিড় যোগ —সভ্যতার অবস্থায় তা তার নেই। যৌন-জীবনে তার ছিল অসঙ্কুচিত উলঙ্গতা, আজ তা শৃঙ্খলাবদ্ধ—হত্যা হানাহানিতে ছিল তার উল্লাস, আজ তা গর্হিত বলে বিবেচিত। তবু মানুষ এইগুলোকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি—তাই আজো টবে গাছ লাগিয়ে, পশুপক্ষী পুষে, নকল ঝর্ণা-ঝিল

তৈরী করে সে ফিরিয়ে আনতে চায় তার আরণ্যক অতীতকে। নৃত্য এবং অভিনয় থেকে সুরু করে, গণিকা-গমন পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আজো চলেছে তার যৌন স্বাধীনতার দাপট, আর চলেছে দেশাত্মবোধ, মানবতা, ধর্ম্ম ও সামাজিক সংহতির নাম দিয়ে সেই হানাহানি ও হত্যাকাণ্ডেরই অনুবৃত্তি! অসভ্য অবস্থায় মানুষের দরকার হয়নি এগুলিকে সঙ্কুচিত ও আবৃত করে রাখার—(উন্মুক্ত বর্ব্বরতার সঙ্গেই সেদিন তার ছিল একটি অকপট সরলতা, যা আজ সে হারিয়েছে।) আর সেই ফাঁক দিয়ে তার ভেতর ঢুকেছে প্রবঞ্চনা, ব্যভিচার, মাৎসর্য্য, ইতরতা ও অনাচার, এবং সেগুলোকে ঢাকবার জন্যে নূতন নূতন কৌশল অবলম্বনের ফন্দী। এই ফন্দীর প্রভাবেই মানুষের বহির্জীবন আজ যেমন জাঁকালো হয়ে উঠেছে, অন্তর্জীবন তেমনি হয়েছে অবদমন ও সঙ্কোচনের আতিশয্যে উৎপীড়িত। উন্নতি, বিস্তৃতি ও পরিপুষ্টির ভেতর দিয়েও মানুষ তাই দিনের পর দিন তীব্রতর অশান্তি, দুঃখ ও দুর্দ্দশার সম্মুখীন হয়েই চলেছে।

(এই জন্যেই আজ থেকে থেকে আন্দোলন হচ্ছে, প্রকৃতির ভেতর ফিরে যাবার, নগ্নতাকে পুনঃ প্রবর্ত্তন করবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ভেঙে ফেলে, আদিম সরল জীবনকে ফিরিয়ে আনবার। কিন্তু সে আর সম্ভব নয়। যে আভ্যন্তরীণ মননশক্তি মানুষকে ধাপে ধাপে আদিমতা থেকে আজকের জটিলতম অবস্থায় এনে ফেলেছে, এও এসেছে তারি সঙ্গে সঙ্গে। একটা দিক যখন আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছে, আর একটা দিকই বা তার পাওনা আদায় করতে ছাড়বে কেন?

[৬] সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

লণ্ডনে সম্প্রতি ফ্রয়েডের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে অষ্ট্রিয়া জার্ম্মাণীর করতলগত হলে, ইহুদী হবার অপরাধে তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়। (জীবনের শেষ ক'দিন তিনি লণ্ডনেই ছিলেন এবং এখানেই তাঁর সর্ব্ব শেষ কীর্ত্তি ইহুদী ধর্ম্মতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় নিয়োজিত ছিলেন। দুঃখের বিষয় এ কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি)। চিরকালই বিশ্বে প্রতিভাধরদের ওপর রাষ্ট্রশক্তির নিপীড়ন চলেছে, নাৎসী শাসকদের হাতে ফ্রয়েড-আইনষ্টাইনের লাঞ্ছনা তারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার ক্ষুদ্র সীমা থেকে বহিষ্কৃত হলেও, আচার্য্য ফ্রয়েড পৃথিবীর চিন্তারাজ্যে যে চিরন্তন শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হলেন, তার কাছে দেশ ও কালের প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর।

ফ্রয়েডের আবিষ্কার ও গবেষণা আজ বিশ্বের ভাব-জগতে যে পরিবর্ত্তন এনেছে, তার ওপর নির্ভর করেই বিংশ শতাব্দীর শারীর বিজ্ঞান ও আচার বিজ্ঞান একটি নূতনতর পরিণতির সন্ধান পেয়েছে॥ মানুষের শিক্ষা ও সভ্যতার, জ্ঞান ও কর্ম্মের অন্তর্নিহিত যে সমস্ত সংস্কার বহুকাল ধরে সশ্রদ্ধ অনুরাগে স্বীকৃত হয়ে এসেছে, আচার্য্য ফ্রয়েড তাদের মূলে সজোরে নাড়া দিয়েছেন—শুধু নাড়া দেওয়াই নয়, পুরাতন বিশ্বাস ও সংস্কারের জীর্ণ সৌধকে ভেঙে তিনি তার ওপর নূতন চিন্তার প্রাসাদ গড়ে তুলেছেন। (বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে মার্কসের দর্শন যেমন সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনে একটি নূতন আদর্শের সন্ধান দিয়েছে, আচার্য্য ফ্রয়েডের গবেষণা তেমনি তার ভাব-জীবনে একটি বিচার-বিশুদ্ধ সত্য দৃষ্টির সন্ধান দিয়েছে। এই সত্যকে যাঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন, তাঁরা ত বটেই, যাঁরা স্বীকার

করেন নি, তাঁরাও একে বাতিল করতে পারেন নি। বস্তুতঃ যন্ত্র বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার ও গবেষণাসমূহ বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসকে যেমন গরিমা ও মর্য্যাদার সপ্তম স্বর্গে উন্নীত করেছে, তেমনি মানুষের ইতিহাসে যা শ্রেষ্ঠতর মহত্তর, সেই মনোরাজ্যের ওপর মার্কস, ফ্রয়েড ও আইনষ্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানী যে নূতন আলোক সম্পাত করেছেন, তার তুলনা এর আগে পাওয়া যায়নি।

আচার্য্য ফ্রয়েডের সমুদয় আবিষ্ক্রিয়ার সঠিক এবং সমগ্র আলোচনা সাময়িক পত্রের নিরূপিত গণ্ডীর ভেতর হওয়া সহজ বা সম্ভব নয়—তা করার শক্তিও আমার নেই। মোটামুটিভাবে তাঁর প্রধান গবেষণার মূল তত্ত্বগুলো শুধু আমি এখানে হাজির করতে চেষ্টা করবো।

অষ্ট্রিয়ার এক উন্মাদাগারে পর্য্যবেক্ষকের কাজ করতে করতে ফ্রয়েড অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করেন এবং স্বাভাবিক মানুষই কি কারণ-পরম্পরায় অস্বাভাবিক অবস্থায় এসে দাঁড়ায়, তার মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। এই অনুসন্ধানের মুখেই তিনি দেখতে পান যে স্বাভাবিকভাবে মানুষের মনে যে সমস্ত বাসনার জন্ম হয়, তাদের যথাযথ চরিতার্থতা না হওয়ার ফলেই মানুষের মনে বৈকল্য দেখা দেয় এবং এই বিকৃতি কোন মহৎ পথে আত্মপ্রকাশের সুযোগ না পেলে, শেষ পর্য্যন্ত উন্মাদনায় পর্য্যবসিত হয়। অর্থাৎ মানব মনের সু ও কু দু'রকম পরিণতির মূলেই আছে এক বা একাধিক অবদমিত ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া। লোকাচার, ধর্ম্মাচার, রাষ্ট্রবিধি, নানা শাসন-অনুশাসনের ভেতর দিয়ে মানুষের জীবন। সুতরাং ইচ্ছা-শক্তি দমন করবার প্রয়োজন হয় না, এমন মানুষই নেই। এই অবদমনই শিল্পীর ক্ষেত্রে আর্টের ভেতর দিয়ে, কবির ক্ষেত্রে কাব্যের ভেতর দিয়ে, সাধকের ক্ষেত্রে সাধনার ভেতর দিয়ে, কর্ম্মীর ক্ষেত্রে কর্ম্মের মধ্য দিয়ে চরিতার্থতার রাস্তা খোঁজে। জীবনে যা মিললো না, বাস্তবে যা সফল হল

না, কল্পনার ভেতর দিয়ে তাকে সত্য, সম্ভব এবং উপভোগ্য করে আত্মবিনোদনের প্রবৃত্তি থেকেই আর্ট ও সংস্কৃতির জন্ম—কিন্তু এ হল দমিত বাসনার দিব্য রূপ (sublimated form)। আবার এই বঞ্চনা ও ব্যর্থতাকে ভোলার জন্যে কুক্রিয়া করা, ইতর পথের অনুসরণ করা, অনৈসর্গিক আচরণের পশ্চাদ্ধাবন করা থেকে আসে যে অপরাধপ্রবণতা, তা হল অবদমিত ইচ্ছাশক্তির স্থূল রূপ (gross form)। এই দুই রূপেই অবদমিত বাসনাসমূহ প্রকাশ পেয়ে থাকে—মানুষের ইতিহাসের উজ্জ্বলতম কীর্তি এবং জঘন্যতম কুকীর্তি, দুয়েরই মূল নিবদ্ধ এক জায়গায়—আর সে জায়গাটি হচ্ছে মানুষের অবচেতন মন।

প্রত্যক্ষ জীবনে যে সমস্ত কামনা স্ফূর্তি পায় না, সফল হয় না, সেগুলো পোষকতার অভাবে নিষ্প্রাণ হয়ে যায় বটে, কিন্তু নিঃশেষ হয় না। তারা গিয়ে এই মগ্ন-চৈতন্যে বাসা বাঁধে—তারপর শিক্ষা, সংস্কার, পারিপার্শ্বিক এবং বৈজিক প্রভাব অনুসারে সেগুলি মানুষকে ভালো বা মন্দের দিকে চালিত করে। মানুষের সমস্ত কাজ, এক কথায় মানুষের সমস্ত ইতিহাসেরই গোড়ার কথা এই।

কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, তা হলে কি স্বাভাবিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষই নেই? আচার্য্য ফ্রয়েড বলেন, 'আদর্শ স্বাভাবিক' বলতে যা বোঝায়, সে রকম মানুষ দুর্ল ভ। কোন-না-কোন দিকে একটু বৈলক্ষণ্য, একটু বৈপরীত্য মানুষ মাত্রেরই আছে এবং বাইরের বাধা-নিষেধের taboo ফলে স্বতস্ফূর্ত ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণই তার একমাত্র কারণ। এই অপূর্ণ ইচ্ছাগুলো পূরণ করতে পারলে বা তাদেরকে যথাযথ আত্মপ্রকাশের পথ দেখাতে পারলে, তাদের আনুষঙ্গিক বিকৃতিগুলোও সারিয়ে তোলা যায়, এ কথাও ফ্রয়েডই প্রথম প্রতিপন্ন করলেন। উন্মাদ রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত গবেষণা হয়েছিল, তাদের ষোল-আনা ব্যর্থতা, ফ্রয়েডের এই 'ইচ্ছা পূরণ'

পদ্ধতির দ্বারা যেমন অনেকাংশে নিরাকৃত হল, তেমনই এই গবেষণার পর থেকে মানুষের মনোবৃত্তির মূলসূত্র নিয়েও টানাটানি পড়ে গেল। মানব-মনের ভালো-মন্দ সমস্ত অবস্থান্তরই কোন-না-কোন অবদমনের ফল, এ কথা সহসা কেউ স্বীকার করতে পারেন নি। কিন্তু ফ্রয়েড দেখালেন, স্বপ্ন ও মূর্চ্ছার অবস্থায় মানুষের সামাজিক মন যখন বাইরের শাসন-বল্গা থেকে মুক্ত, তখন সে যা বলে, যা করে, তা তথাকথিত সংস্কারের মুখ চায় না, বরং তার বিরুদ্ধ পথেই চলে। গোপন মনের এই স্পৃহা-শক্তিই বাইরের চাপে ঢাকা পড়ে আশপাশ দিয়ে নানা আকারে ফুঁড়ে বার হয়—ভাবের উন্নয়ন (sublimation) বা অধোগমন (perversion) দুয়েরই মূল এখানে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই দুই বৃত্তির সমমাত্রিক ক্রিয়া প্রতি-নিয়ত চলে বলেই তারা দলে দলে ধার্ম্মিক, শিল্পী, কর্ম্মীও হয় না, আবার খুনী, দুশ্চরিত্র, কদাচারীও হয় না। যার একটা দিক প্রবল হয়ে ওঠে, সে-ই তদনুযায়ী রূপ নেয়। বলা বাহুল্য, তারাই অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন।

অবদমিত বাসনার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে ফ্রয়েড আর একটি বিস্ময়কর সত্যে উপনীত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, বাসনা মাত্রেরই মূলে প্রচ্ছন্ন বা প্রকটরূপে থাকে রতি-প্রেরণা (sex urge)। এই হচ্ছে মানুষের ইচ্ছাশক্তির মোটর স্বরূপ। সাহিত্যে ও শিল্পে চিরকাল ধরে যে কেবল প্রেমই একাধিপত্য করে আসছে, তার কারণ এই। বৈষ্ণব, সুফী, খৃষ্টান···সকল ধর্ম্মেই যে সাধ্য ও সাধকের মধ্যে একমাত্র কান্তা ভাবই প্রাধান্য লাভ করে আসছে, তারও কারণ এই। এই ভাবে মানুষের সকল কাজ, সকল চিন্তা, সকল সৃষ্টির স্বরূপ নিয়ে বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে গৌণ বা মুখ্যভাবে যৌন-বাসনাই তাকে চালিয়ে নিয়ে চলছে। এই বৃত্তির পরিপূর্ণ চরিতার্থতা মানব জীবনে দুর্লভ—তাই মনুষের জীবন ষোল-আনা স্বাভাবিক হওয়াও দুরূহ।

আচার্য্য ফ্রয়েডের এই গবেষণায় নৈতিক শুচিবায়ুগ্রস্তেরা ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। (ধর্ম্ম, শিল্প, সংস্কৃতি, এক কথায় মানব সভ্যতার যাবতীয় মহৎ অনুষ্ঠান এইভাবে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় রূপান্তরিত হওয়ায় পৃথিবীর যুগার্জ্জিত ঐতিহ্যই গেল পাল্টে।) তাঁরা ফ্রয়েডকে অশ্লীলতার প্রচারক এবং সভ্যতার শত্রু বলে ঘোষণা করতে লাগলেন। কিন্তু আচার্য্য ফ্রয়েড যে নিষ্ঠুর সত্য উদ্ঘাটিত করে দিলেন, অনধিকারীর হাতে তার অপব্যবহার হলেও, বিজ্ঞানী সমাজ এই মতবাদকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

অবশ্য একথা সত্যি যে মানুষের ইচ্ছা-শক্তির মূল যা-ই হক, বাইরে যেটা যেরূপে প্রকাশ পায়, পার্থিব হিসাবে তার তা-ই মূল্য। সুতরাং শিল্পীর শিল্পকে প্রচ্ছন্ন রতি-বাসনার ভাবগত বিলাস বলে উড়িয়ে দেওয়া বা দুষ্কৃতকারীর অপকার্য্যকে অবদমিত ইচ্ছা-শক্তির প্রতিক্রিয়া বলে ক্ষমা করে যাওয়া সঙ্গত নয়। আদি সত্য যাই হক, দীর্ঘদিনের সংস্কার ও অভ্যাসে মানুষ যে আপেক্ষিক সত্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে, তার ওপরই সভ্যতার স্থিতি। তা ভেঙে দিলে মানুষের কল্যাণ করা হবে না। ফ্রয়েড নিজেই সেকথা বলেছেন। তিনি বলেছেন একথা আমি কখনো বলি নি যে জগতে সেক্সই একমাত্র সত্য, আর সবই মিথ্যা। সব বস্তুই আসলে ইলেকট্রন, তাই বলে সোনার কি কোন নিজস্ব অস্তিত্ব নেই? সেক্স যদিও চরম সত্য, তবু দয়া, মায়া, প্রেম, প্রীতি, যাবতীয় মহৎবৃত্তিও ব্যবহারিক দিক থেকে সত্য। হাতের কাছকার সত্যকে সত্য জেনেই, পিছনের পর্দ্দাটা সরিয়ে দেখা দরকার—নইলে দু'দিকেই ভরাডুবি হবার সম্ভাবনা। আমরা যদি এই কথাটি মনে না রেখে ফ্রয়েডকে বিচার করতে বসি, তাহলে শুধু ভুলই করবো না, বিংশ শতাব্দীর এই ধ্যানী মনীষীর জীবনব্যাপী সাধনাকেও অপমানিত করবো।

[৭] ফ্রয়েডের স্বপ্ন-বিশ্লেষণ

অল্পকাল আগেও স্বপ্ন জিনিষটাকে ধরা হত অমূলক চিন্তা বলে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় কি করে যে এটা মানুষের মনে সঞ্চারিত হয়, তা কেউই জানতেন না। অনেক দেশের মতো এদেশেও মেয়েদের মধ্যে একটা সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে মানুষকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়ে, দেবতা ও ভূতপ্রেতরা তাদের মনে প্রবেশ করে এবং যার যে রকম আধার, তাকে সেই রকম স্বপ্ন দেখায়—পুণ্যাত্মা যারা তাঁরা দেখেন পারমার্থিক স্বপ্ন, আর পাপীরা দেখেন বিভীষিকা! শিক্ষিত লোকেরা এতে বিশ্বাস করতেন না বটে, কিন্তু স্বপ্ন-ব্যাপারের সঙ্গে মানুষের বাস্তব অবস্থার, মানে তার দৈহিক ও মানসিক সত্তার কোন যোগ আছে বা থাকতে পারে, এ তাঁদেরও মনে হতো না। দুর্জ্ঞেয় বলেই জিনিষটা তাঁদের কাছে ছিল রীতিমতো রহস্যাচ্ছন্ন এবং সেই জন্যেই একে কেন্দ্র করে নানা সম্ভব-অসম্ভব জল্পনা কল্পনা চলেছে চিরকাল।

তবে একটা কথা মোটের ওপর বলা হতো, এখনো হয় যে, বাস্তব অবস্থায় যে সমস্ত ঘটনা, বিষয় ও ব্যাপারের সঙ্গে আমরা সংশ্লিষ্ট থাকি, ঘুমুলে স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে তাদেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হতে থাকে। যেমন খেলার মাঠে একটা গোল ফস্কানো দেখে এলাম, রাত্রে ঘুমের ঘোরে দেখলাম গোল ফস্কাচ্ছে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে চালালাম এক লাথি—বলের অভাবে তা লাগলো হয়ত কারুর গায়ে, নয়ত কোন জিনিষে। এম্নি ভাবেই খাওয়া, ঝগড়া করা, চাকরি করা, দেশ-বিদেশে যাওয়া—অনেক কিছুরই স্বপ্ন আমরা প্রতিনিয়ত দেখে থাকি। এর থেকে

অনেকে মনে করেন, স্বপ্ন জিনিষটা হল জাগ্রত অবস্থার ঐকান্তিক মননক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া মাত্র। যে জিনিষ নিয়ে মনে-মনে আমরা বড্ড বেশী তোলাপাড়া করি, যা আমাদের চিত্তকে উদ্রিক্ত এবং অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে, স্বপ্নে তাই আমাদের মস্তিষ্ককে অধিকার করে বসে। এ এক রকম মীমাংসা বটে, এবং অনেক কাল পর্য্যন্ত স্বপ্ন-ব্যাপারকে এর সাহায্যেই ব্যাখ্যাও করা হতো বটে, কিন্তু বর্ত্তমানকালের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নয়।

এই সব পরিচিত এবং অভ্যস্ত জিনিষ ছেড়ে এমন কোন জিনিষ বা ব্যাপার যদি স্বপ্নে দেখেন, যা আমাদের মন কথনো ভাবেনি, কল্পনা যার কাছ ঘেঁসেও হাঁটে নি—তখন তার কি ব্যাখ্যা দেবেন? ধরুন স্বপ্ন দেখলেন, আপনি ছুটো হাত ডানার মতো করে নাড়তে নাড়তে আকাশে উঠছেন—খানিকটা উঠেছেন, এমন সময় একটা ঈগল পাখী সোঁ করে উড়ে এলো আপনার দিকে—ভয়ে আঁৎকে উঠে যেই সরে আসতে যাবেন, অম্নি ছিটকে পড়ে গেলেন নীচের অতল সমুদ্রে। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে জেগে উঠে দেখলেন বিছানায় শুয়ে আছেন—আপনার গা ঘেমেছে, গলা শুকিয়ে কাঠ! এ রকম আজগুবি ও অপ্রত্যাশিত স্বপ্নগুলোকে পূর্ব্বেকার নজির দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। অথচ এ রকম স্বপ্নও আমরা কম দেখি না। বলা বাহুল্য জাগ্রত অবস্থায় প্রকৃতিস্থ মানুষ কেউই এই শ্রেণীর উদ্ভট কল্পনা নিয়ে সময়ক্ষেপ করে না, তাহলে ঘুমের ভেতর এ জিনিষ আমাদের চেতনায় এসে হাজির হয় কি করে? এই প্রশ্নের সমাধান করতে হলে, প্রথমে চৈতন্যের স্বরূপ নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার।

আমাদের মনের কাজ প্রধানতঃ বর্ত্তমান নিয়ে। যা দেখছি, শুনছি, করছি বা ভাবছি, মন তাই নিয়েই রয়েছে ব্যস্ত—কত উপায় ভাবছে,

কত ফন্দী আবিষ্কার করছে, কত কৌশলে হাঙ্গামা এড়াচ্ছে। কিন্তু তাই বলে যা আগে হয়ে গেছে, তার সঙ্গেও মনের ধর্ম্মঘট নেই—যদিও অতীতের সঙ্গে সেই যোগসূত্রটা অধিকাংশ সময়ই টের পাওয়া যায় না। আট বৎসর আগে হাজারীবাগে একটা অদ্ভুত রকম পিঠ-কুঁজো তালগাছ দেখেছিলাম—কিন্তু আট বৎসরের ভেতর আর কোন দিনই এই গাছটা আমার মনে পড়েনি, হঠাৎ সেদিন নৈহাটিতে দেখলাম অনেকটা ঐ রকমেরই আর একটা তাল গাছ। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো হাজারীবাগের গাছটির কথা, সেই সঙ্গে মনে পড়লো সঙ্গের সেই নেপালী চাকরটার কথা, যে ঐ গাছটার নকল করে পিঠ মুড়ে দাঁড়াতো। এই যে জিনিষগুলো এতকাল আমার মনে পড়েনি, হঠাৎ আজ পড়লো, এরা এ পর্য্যন্ত ছিল কোথায়? চেতনায় নিশ্চয়ই, কিন্তু তার সাম্নের কুঠরিতে নয়, পেছনের অন্ধকার কোন কোণে—সমধর্ম্মী আর একটা জিনিষ দেখবামাত্র তড়াক করে বেরিয়ে এলো সজীবতার আলোয়। এম্নি লক্ষ লক্ষ জিনিষ মানুষের মনে সঞ্চিত আছে, যা উদ্দীপনা পেলে সজাগ হয়, নইলে চাপা থাকতে থাকতেই শেষ হয়ে যায়।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, (আমাদের মনের আর একটা পিঠ আছে, যার কাজ হল হারানো জিনিষ জমা করে রাখা। যে মন বর্ত্তমান নিয়ে কারবার করছে সে হল চেতন, আর চেতন মন যে সমস্ত জিনিষ দু'হাতে ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে চলেছে, তাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে স্মৃতির ভাণ্ডারে পুঁজি করছে যে-মন, সে হল অবচেতন) এই চেতনা ও অবচেতনা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আর গায়ে গা মিলিয়েই চলেছে, একটা অকেজো হয়ে পড়লেই, আর একটা তাকে খোঁচা দিয়ে সজাগ করে দিচ্ছে। কি করে, তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। আপনি গভীর মনোযোগ দিয়ে একখানা বই পড়ছেন, বাইরের অন্য কোন বিষয়েই আপনার হুঁস নেই, আপনার চেতন মন

পাতার পর পাতা লাফিয়ে চলেছে বইয়ের বিষয়ের পিছন পিছন। কিন্তু তার বাইরে সমস্ত পৃথিবীটা রয়েছে, যার সম্বন্ধে সাময়িকভাবে আপনি অনবহিত। হঠাৎ এলো একটা দমকা ঝড়—আলোটা গেল নিভে, জানলা দরজাগুলি গেল উল্টেপাল্টে, সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের বিষয়টা গেল আড়ালে সরে, আর বাইরের পৃথিবীটা এগিয়ে এলো আপনার মনের পর্দ্দায় —অথচ এক সেকেণ্ড আগেও তার সম্বন্ধে আপনি সজাগ ছিলেন না। চেতনা এবং অবচেতনার পারস্পরিক যোগটা এই ভাবে ঘুম-আসার ঠিক আগেও অনুভব করা যায়। (স্বপ্ন জিনিষটার জন্মভূমি হল এই অচেতন মন।) (অবশ্য মন বলতে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ এই ক'টি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের বোধবিশিষ্ট মস্তিষ্ককেই বুঝতে হবে। তার বিভিন্ন কোষ থেকে বিভিন্ন বোধের জন্ম এবং সমগ্রভাবে এরা একে অন্যের অনুপূরক রূপেই আমাদের চেতনাকে সৃষ্টি করেছে। এই চেতনা একই সঙ্গে আহরণী ও সৃজনী বৃত্তির অধীন, তাই মন একই সঙ্গে 'মনে' রাখে এবং কাজেও প্রবর্ত্তনা দেয়। এর বাইরে মন বলতে আর কোন কিছুই নেই।)

এইবার গোড়ার কথায় ফেরা যাক। যে সমস্ত জিনিষ আমরা সর্ব্বদাই নাড়াচাড়া করছি, যা নিয়ে আমাদের নিত্যকার জীবন, তারা ত বটেই, তা ছাড়া যে সমস্ত জিনিষ আমাদের ব্যক্তিসীমার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট নয়, তারাও এসে অবচেতন মনে বাসা বাঁধে এবং স্বপ্নে তারাও অনেক সময় রঙবেরঙের চেহারা ধরে দেখা দেয়। উত্তর বিহারের ভূমিকম্পটা আমি দেখিনি—কাগজে পড়েছি এবং লোকের মুখে শুনেছি তার বিবরণ। একদিন দেখলাম ঘর-বাড়ী ভেঙে পড়েছে—আমার ঠিক মাথার ওপরই একটা কড়িকাঠ এসে পড়লো, আমি জখম হলাম, তারপর গাড়ীতে তুলে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল, মাথা ভাঙাটা তবু সহ্য হয়েছিল, কিন্তু ডাক্তারের ছুরি দেখেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, আর

সেইখানেই স্বপ্নের সমাপ্তি। এই যে স্বপ্ন, এর বিষয়টা আমার মন পেলো কোথা থেকে? নিশ্চয় পরোক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করেছে। মজা এই যে অবচেতন মন শুধু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই পুঁজি আহরণ করে না, আপন খেয়াল-খুসীতে উপকরণ গড়েও নেয়। মুস্কিল হয় এই জাতের স্বপ্নগুলোকে নিয়েই—কিন্তু এদেরও কারণ অনুসন্ধান করলে পাওয়া যায়।

সব রকম কল্পনাই জন্মায় ইচ্ছা থেকে। জগতে মানুষের ইচ্ছার শেষ নেই, বাঁচা মানেই একটা-না-একটা ইচ্ছার দাসত্ব করা। এর মধ্যে খুব কম ইচ্ছাই মানুষের পূর্ণ হয়, বেশীর ভাগ ইচ্ছাই মনের মধ্যে জোর করে দাবিয়ে রেখে মানুষকে দিন কাটাতে হয়। কিন্তু দাবালে কি হবে? চেতন মন থেকে তাড়া খেয়ে তারা গিয়ে অবচেতন মনে বাসা বাঁধে। অসুখ, ঘুম বা মূর্চ্ছার সময় প্রত্যক্ষ সম্বিৎ যখন আচ্ছন্ন, তখন তারা এই অজ্ঞাতবাস থেকে চুপিসাড়ে উঠে আসে মনের সামনের পর্দায়! বিশেষ করে এরা প্রাধান্য নেয় স্বপ্নে, যেহেতু চেতন মনের তখন একেবারেই ক্ষমতা থাকে না এদের অভ্যুদয়ে বাধা দেবার।

যত রকমের আজগুবি স্বপ্ন, যাদের কোন হেতু বা মূল নির্দ্দেশ করা যায় না, তাদের জন্ম এই সব দাবিয়ে রাখা ইচ্ছা থেকেই। ধরুন আগে যেটা বলেছি—আপনি আকাশে উড়তে উড়তে হঠাৎ পড়ে গেলেন! এমন কি ইচ্ছা আপনার হয়েছিল যা দমিত করার ফলে আপনার অবচেতন মন এটা সৃষ্টি করে বসলো? মনে করুন, আপনার পরিচিত কোন ব্যক্তি একদিন এরোপ্লেন চড়েছিল, সেই গল্প শুনে আপনারও ইচ্ছা হয়েছিল আকাশে উড়বার, কিন্তু নানা কারণে সেটা হয়ে ওঠেনি! এই ওড়ার ইচ্ছাটা দাবাতে হয়েছিল বলেই ঘুমের ঘোরে আপনার কল্পনা আপনাকে উড়িয়ে নিয়ে চললো। কিন্তু আপনার এরোপ্লেন নেই—তাই

শুধুই উড়ছেন, কাজেই শেষটা গেলেন পড়ে! আর ঈগল পাখী? কিছুদিন আগে সিনেমায় দেখেছিলেন, এরোপ্লেন থেকে প্যারাসুট ধরে একটি লোক লাফিয়ে পড়লো, আর ঈগল পাখী তাকে ঠুকরে দিলে! সমধর্ম্মী বলে একটি ব্যক্তিক ও আর একটি নৈর্ব্যক্তিক ঘটনা পরস্পর যুক্ত হয়ে আপনার স্মৃতিতে এক হয়ে গেছে, যা জাগ্রত অবস্থায় কোন দিনই আপনি টের পাননি। ঘুমন্ত অবস্থায় চেতনার রাশ যখন আপনার আল্গা, তখন আপনার মনে এসে তারা উপদ্রব বাধিয়ে দিলে। এই ভাবেই সমস্ত দমিত বাসনা একটা-না-একটা প্রতীকের ভিতর দিয়ে মুক্তিলাভ করে, তাইতেই রক্ষা! নইলে অবদমিত ইচ্ছার উৎপীড়নে কোন মানুষই বাঁচতো না।

বলা বাহুল্য, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইচ্ছা-শক্তিকে দমিয়ে চলতে হয় প্রত্যেক সভ্য মানুষেরই, নইলে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন টিঁকিয়ে রাখা যায় না। যখনই যা মনে উদয় হয়, তাই যদি কাজে পরিণত করা যায়, তাহলে প্রতি মানুষকেই করতে হয় চুরি, ডাকাতি, খুন, লুঠতরাজ ও হাজার রকম বিশ্রী কাজ—কারণ যত ভালো লোকই হন, সময় সময় এই সব ইচ্ছা অন্তরকে অধিকার করে না এমন মানুষই নেই! শুধু ধর্ম্মের ভয়ে, সমাজের ভয়ে, পুলিশের ভয়ে, প্রাণের ভয়ে মানুষ আত্ম-সম্বরণ করে চলে। এই সব অবদমন বা Tabooর ফলে অন্তর্লোকে গিয়ে এই ইচ্ছাগুলো চোরের মতো লুকিয়ে থাকে, আর বাইরে বেরিয়ে এসে চরিতার্থতার পথ খুঁজতে থাকে। ঘুমিয়ে পড়ার পর বাইরের বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে, মানুষের মননক্রিয়া যখন স্বেচ্ছায় চলাফেরার স্বাধীনতা পায়, তখন এরা দলে দলে বেরিয়ে আসে মনের পর্দ্দায়, আর এই-ই হল আজগুবি, অসাধারণ, অস্বাভাবিক ও বীভৎস স্বপ্নগুলোর মূল। (সুতরাং স্বপ্ন জিনিষটাকে আমরা যতটা অমূলক বলে মনে করতাম, আসলে তা নয়)

এর মূল আছেই। শুধু তাই নয়, আমাদের সুস্থ ও শিষ্ট ভাবে বাঁচার জন্যে এর প্রয়োজনও কম নয়। স্বপ্নের ভেতর দিয়ে স্তূপীকৃত অবদমিত ইচ্ছাগুলির মুক্তি হয়ে যায় বলেই আমাদের মস্তিষ্কবৃত্তি অতিভারে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে না। এদের প্রকাশ-পথ যদি অবারিত না হতো তাহলে মন কিছুতেই এত জিনিষ বইতে পারতো না—এদেরই কোন-না-কোনটাকে আঁকড়ে ধরতো এবং অত্যাবশ্যক অনেক কিছুকেই ছেঁটে বাদ দিত। এই অবস্থাই হল fixed ideation এবং এর পরের ধাপই হল উন্মত্ততা। সুতরাং স্বপ্ন জিনিষটার জন্ম মনন-ক্রিয়া থেকে হলেও, দেহের সঙ্গে এর যে সুগভীর যোগ রয়েছে, এটা অনায়াসেই বোঝা যাচ্ছে। এর উৎপত্তি এবং ক্রিয়া দুইই দেহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট—স্বপ্নে আমরা যখন কাঁদি, ভয় পাই, আঘাত পাই, ঘামি বা অপরাপর শারীর ধর্মের অধীন হই, সেগুলোর বাস্তব প্রভাব আমরা দেহের উপর প্রত্যক্ষ করি। এ থেকেও বোঝা যায় যে স্বপ্নটা একটা দেহাতীত ব্যাপার নয়। দেহীমাত্রেই স্বপ্ন দেখেন এবং প্রতিদিন প্রত্যেকবার ঘুমুলেই দেখেন। নিদ্রার গাঢ়তা ও স্বপ্নের লঘুতা হেতু কতক স্বপ্ন জাগলে মনে থাকে না, কতকগুলোর খেই হারিয়ে যায়, দিবালোকে সেগুলিকে আর গুছিয়ে তোলা যায় না। নইলে স্বপ্ন দেখেন না এমন মানুষই নেই, মানে প্রকৃতিস্থ মানুষ!

[৮] হ্যাভলক এলিস

হ্যাভলক এলিসের রচনার সঙ্গে আমাদের যখন পরিচয় হয়, তখনো প্রকাশ্যভাবে তাঁর বই পড়ার রেওয়াজ হয়নি। ছেলেরা তখন নলচে আড়াল দিয়ে Psychology of Sex পড়তেন। স্বামী বিবেকানন্দের, অশ্বিনী দত্তের বা মহাত্মা গান্ধীর রচনাবলী কর্ত্তারা পড়তেন এবং আমাদেরও পড়বার নির্দ্দেশ দিতেন—সেটা নিছক আমাদের নৈতিক মঙ্গলের জন্যেই, তাতে আর সন্দেহ নেই, কিন্তু তখনই আমরা মনে মনে তথাকথিত সংযম ও সদাচারের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। আমরা বুঝেছিলাম, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি আদর্শ হিসাবে সুন্দর, কিন্তু আদর্শ বলেই এরা মানুষের আয়ত্তের বাইরে। এত বেশী বাইরে যে, মানুষের বাস্তব জীবন চলে ঠিক এই সব আদর্শের বিপরীত পথ ধরে এবং মানুষের ইতিহাসে সেটা অন্যায়ও নয়, অস্বাভাবিকও নয়। বরং সন্ন্যাসই বলুন, সংযমই বলুন আর নৈতিক অনুশাসনের অপরাপর পর্ব্বই বলুন, সবই হচ্ছে রীতিমতে দুষ্কর এবং দুরধিগম্য—অতএব সাধারণ মানুষের পক্ষে অনেকটা অস্বাভাবিক।

এই ধারণার পোষকতা করেছিলেন আচার্য্য ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামীবর্গ, যাঁদের লেখা আমরা তখনো পড়িনি—জনশ্রুতি থেকে ছিটেফোঁটা বক্তব্য আহরণ করেই ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছি। এই ওলট-পালটের মুখে হ্যাভলক এলিস এলেন আমাদের আসরে পাঠ্যপুস্তকের নামাবলী মুড়ি দিয়ে। এ কথা আজ আর গোপন করে লাভ নেই যে,

বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে নয়, স্রেফ আদিম ঔৎসুক্যবশেই আমরা তাঁর সব ক'টি খণ্ড গলাধঃকরণ করেছিলাম। এলিসকে আমরা যে এই ভাবে পর্ণোগ্রাফী লেখক করে তুলেছিলাম, তার জন্যে আমাদের বয়স অনেকটা দায়ী ছিল, কিন্তু সবচেয়ে বেশী দায়ী ছিল কর্ত্তাদের নীতিনিষ্ঠার প্রচণ্ড পীড়ন।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এলিসের আসল উদ্দেশ্যটা আমরা ভুল করেছিলাম। তাঁর সূত্র ও প্রতিপাদ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দৃষ্টান্তগুলিকে পড়ার ফলে বৈকল্যটা আমাদের কাছে এমনই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যে ভেতরে-বাইরে ষোল-আনা সুস্থ মানুষের অস্তিত্বেই আমাদের বিশ্বাস হতো না। কথায় কথায় আমরা আবিষ্কার করতাম একটা-না-একটা কোন অবদমন এবং তার অনিবার্য্য পরিণাম স্বরূপ স্যাডিসম্, ম্যাসোকিসম্, নার্সিসিসম্, ইডীপাস কমপ্লেক্স, কপ্রোফিলিয়া, নেক্রোফিলিয়া হরেক রকমের মানসিক ব্যারাম নির্ব্বিচারে এর-তার ঘাড়ে চাপিয়ে আমরা বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিতাম। আমাদের এই অকালপক্কতার খোরাক জুগিয়েছিলেন হ্যাভলক এলিস। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সময় থাকতেই বুঝতে পেরেছিলাম যে এলিস যে কাজ করেছেন, তা আর কেউই করতে পারতেন না এবং তিনি যা করেছেন, তার মূল্য নিরূপণের সময় আজো আসে নি।

আচার্য্য ফ্রয়েডের কথা আগেই উল্লেখ করেছি—তাঁর ও তাঁর পরিমণ্ডল, যথা এডলার, য়ুং ইত্যাদির সম্মিলিত সাধনায় এক দিন অবচেতন লোকের রুদ্ধ দরজা খুলে গেল এবং আমরা পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে মনোবৃত্তিগুলির উৎসমূল খুঁজে পেলাম। প্যাভলভ পণ্ডিতের গ্রন্থিবিষয়ক গবেষণাকে আশ্রয় করে ইতিমধ্যে ওয়াটসন প্রমুখ মনীষীদের হাত দিয়ে আবার একটা 'আচার বিজ্ঞান' গড়ে উঠলো। এই দুটোকে

একত্র করে দেখা গেল যে, শরীর ও মন নিয়ে মানুষের যে সমগ্র সত্তা, তার চালকশক্তি হচ্ছে যৌনবৃত্তি এবং এই দুয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকেই মানুষের মনোধর্ম্ম তার নিজস্ব পরিণতি লাভ করে। খারাপের দিক থেকে বৈপরীত্যই হক, আর ভালোর দিক থেকে বৈশিষ্ট্যই হক, (অর্থাৎ কোন হতভাগ্যের সমলৈঙ্গিক আসক্তিই বলুন, বা এই জাতীয় কোন উদ্ভট অভ্যাসই বলুন, আর কোন কৌমার্য্যব্রতীর নিরাসক্তি বা কোন ভাবুকের কাব্যোন্মাদনাই বলুন) সবই এই যৌগিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলাফল। এদের পেছুনে যৌনবৃত্তি কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও প্রকট, কোথাও 'সহজ', কোথাও বিকৃত—কিন্তু সর্ব্বত্রই তা, এবং তা ছাড়া আর কিচ্ছু না। এই হল আধুনিক কাম-বিজ্ঞানের মোটামুটি কথা।

কিন্তু এই কথাগুলোতে পৌছুতে হলে মাঝখানে আছে শারীর বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞান। তাদের পারিভাষিক জটিলতা ও তাত্ত্বিক গূঢ়তা ভেদ করে সাধারণের পক্ষে ওর ভেতর ঢোকা প্রায় অসম্ভব। এটা অসম্ভব বলেই প্রাকৃত জনের হাতে যৌনতত্ত্ব তার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জাত খুইয়ে, নিতান্তই অশ্লীলতার অনুশীলন হয়ে দাঁড়ায়, যা হয়েছিল আমাদের বেলায়। এই বিপদ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করেছেন হ্যাভলক এলিস—তিনি অপারিভাষিক প্রাঞ্জল এবং অলালস ভঙ্গীতে এই বহু শাখায় বিভক্ত জটিল বিজ্ঞানকে শিক্ষিত সমাজের দরজায় এনে হাজির করেছেন। মানুষের জন্ম ও জীবন-বৃত্তির মৌলিক তত্ত্ব যে বিজ্ঞানের অবলম্বন, তাঁর বই না পেলে, কোন দিনই আমরা তা এত অনায়াসে আয়ত্ত করতে পারতাম না। ক্রিয়াগুলোকে লক্ষ্য করে তাদের প্রকার ও প্রকৃতি নিয়েই আমরা লড়াই করতাম, কিন্তু ভেতরকার প্রাণ-শক্তি আমাদের কাছে অস্পষ্টই থেকে যেতো। এইদিক থেকে

এলিসকে আধুনিক যৌন-শাস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার বলে মনে করা যেতে পারে।

কিন্তু ছেলে বয়সে এলিসকে আমরা কি চোখে দেখতাম, তা আগেই বলেছি। শুধু আমরাই নই, তাঁর স্বদেশবাসীরা, যাঁরা নাকি জ্ঞানের বোদ্ধা ও সত্যের উপাসক, তাঁরাও তাঁকে পর্ণোগ্রাফী লেখক বলেই ধরে নিয়েছিলেন এবং এই বিংশ শতাব্দীতেই তাঁকে গ্যালিলিওর মতো বিড়ম্বিত করতেও ছাড়েন নি। সুতরাং নাবালক বাঙালী বালকদের আর দোষ কি?

দ্বিতীয় স্তবক ঃ শিল্প

[১] বাংলা চিত্রকলার এক অধ্যায়

বাংলা চিত্রশিল্পের যে পর্য্যায়টিকে আধুনিক আখ্যা দেওয়া হয়, তার বয়স এখনও নিতান্তই কম। বিগত শতাব্দীর শেষ পর্ব্বেও এদেশে আর্ট বলে একটা বিশিষ্ট সংস্কৃতি ছিল না। জনসাধারণের মধ্যে পাটা, পট, কাঠের বা মাটির কাজের ওপর খোদাই, ঘরের দেয়ালে বা প্রাচীর-গাত্রে আলপনা, কলকা ইত্যাদির চল ছিল, অর্থাৎ যাকে পপুলার আর্ট বলে, সে ধরণের জিনিষ কিছু কিছু দেশে ছিল। কিন্তু তার অনুশীলন ছিল প্রধানতঃ মিস্ত্রী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সম্পন্ন সমাজের ভেতর উচ্চাঙ্গের আর্ট বাইরে থেকে অল্প-স্বল্প এসেছিল বটে, কিন্তু তা দেশের সৃজনী-দৃষ্টিকে উদ্রিক্ত করে নি, বাইরে থেকে এসেছিল বলেই বোধ হয় বাইরের জিনিষ হয়েই ছিল, আমাদের মনের অন্দর মহলে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেনি। তিব্বত ও নেপাল দিয়ে চীনা শিল্প, বাদশাহী দরবার দিয়ে মোগল এবং রাজপুত শিল্প, দ্রাবিড়ী ও উড়িয়া ঔপনিবেশিকদের হাত দিয়ে দক্ষিণী শিল্প (মানে ভাস্কর্য্য) বাংলার সংস্কৃতিতে স্থান লাভ করেছিল —কিন্তু সেগুলো যে ভালো জিনিষ বা বিবেচনার জিনিষ একথা কারুরই মনে হয়নি। তাই এদেশের চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে তাদের ছায়া পড়েনি। খাঁটি বাঙ্গলা আর্ট এই আধুনিক যুগেও তার মধ্যযুগীয় আদিমতা নিয়ে আত্মস্বতন্ত্র পথেই প্রবাহিত ছিল।

বিদেশী মিঃ হ্যাভেলই প্রথম ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতির ভেতর বৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্য্যের সন্ধান পান—দেশের লোককেও তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তারপর থেকেই খোঁজাখুঁজি সুরু হল—অজন্তা, এলোরা, এলিফেন্টা, কোনরক, ভুবনেশ্বর তখন থেকে রসিক সমাজের তীর্থ হয়ে উঠলো। আজ পদ্মপাণি বুদ্ধ বা ভিক্ষানিরতা সুজাতা, নটরাজ শিব বা প্রজ্ঞা-পারমিতার ব্যঞ্জন-নিগূঢ় শিল্প-রীতি সম্বন্ধে সানুরাগ প্রশংসা আজ ছেলেদের মুখেও শোনা যায়—কিন্তু মাত্র সেদিনও কেউ এদের খবর রাখতেন না। সমগ্রভাবে একটা দেশের রসবোধ এমন প্রগাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল, শিল্পকলার ইতিহাসে এ একটা বিস্ময়কর ঘটনা।

কিন্তু হ্যাভেল সাহেব রসিক সমাজের দৃষ্টি প্রাচ্য-শিল্পের দিকে ঘুরিয়ে দিলেও, শিল্পী সমাজ বলতে দেশে তখন যাঁদের বোঝাতো, তাঁরা নিতান্তই খেলো বিলাতী অয়েল পেন্টিং-এর ওপর দাগা বুলাতেন। বিলাতী পদ্ধতিকে তখনো পর্য্যন্ত কতকটা আয়ত্ত করেছিলেন স্বর্গীয় রবি বর্ম্মা—তাঁর বঙ্গীয় শিষ্য অন্নদা বাগচীই বোধ হয় বাংলায় এ বিষয়ে প্রথম। রবি বর্ম্মার ছবি আজ প্রশংসা পায় না—তাতে জীবনীশক্তির দৈন্য, এবং মাংসলতার বাহুল্য আছে ঠিকই, কিন্তু তাঁর পরিপ্রেক্ষণীর জ্ঞান তীক্ষ্ণ ছিল, বর্ণ-বিন্যাসেও তিনি অনুল্লেখযোগ্য ছিলেন না। তাঁর অনুগামীরা, মানে অন্নদা বাগচী প্রভৃতিও তাঁর হাত অনেকটা পেয়েছিলেন। আজ বৌবাজার স্কুল বলে নাক সিটকানোর রেওয়াজ হয়েছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই স্কুলটিকে আশ্রয় করেই দেশে প্রথম শিল্পকলার একটি আবহাওয়া তৈরী হয়েছিল। আজ অতুল বসু, সতীশ সিংহ, হেমেন্দ্র মজুমদার, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, রমেন চক্রবর্ত্তী প্রমুখ শিল্পীদের হাত দিয়ে বাংলা ছবিতে প্রতীচ্যকলার বিভিন্নমুখী টেকনিক যে এমন সজীব স্বচ্ছন্দ রূপ নিয়েছে, তার পূর্ব্ব ইতিহাসও এক হিসাবে এই বৌবাজার স্কুলেই নিবদ্ধ।

অবশ্য রবি বর্ম্মা বা অন্নদা বাগচীর প্রভাবেই যে বাংলার চিত্রকলা তার আধুনিকতম উন্নত অবস্থায় আসেনি তা বলাই বাহুল্য। (আজকের শিল্পীদের সামনে আদর্শ রয়েছেন ইউরোপীয় মাষ্টাররা, এঁরা জুগিয়েছেন সেই আদর্শ নেবার উদ্দীপনা—কাজ হিসাবে যার মূল্য নিতান্ত কম নয়। সর্ব্বত্রই যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনি চেতনা-সঞ্চার করে তাঁরা অদৃশ্য হয়েছেন। তারপর নব নব পথ ও পাথেয় সেই চেতনাকে দিনের পর দিন বৃহত্তর সম্ভাবনার পথে টেনে নিয়ে গেছে।) কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

যখন বৌবাজার শিল্পীদের কেন্দ্র করে এই ভাবে পাশ্চাত্য আদর্শে জল-রঙা ও তেল-রঙা ছবির প্রাথমিক আদরা তৈরী হচ্ছে, তখনি হ্যাভেলকে ঘিরে সরকারী আর্ট স্কুল গড়ে উঠলো এবং প্রাচ্য পদ্ধতির প্রথম পায়োনিয়ার রূপে দেখা দিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অজন্তা ও মোগল রীতিকে তিনি ষোল-আনা আয়ত্ত করেছিলেন। (অবশ্য সেই সঙ্গে প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় স্কুলকেই তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন তন্ন তন্ন করে)। তাই অবনীন্দ্রনাথের হাত দিয়ে দেশে যে শিল্প-আন্দোলন দেখা দিল, তাতে প্রাচ্য পদ্ধতির প্রাধান্য থাকলেও, প্রতীচ্য পদ্ধতিও একেবারে উপেক্ষিত হল না। অবনীন্দ্রনাথের স্বরচিত ছবিগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যাবে যে, তাতে প্রাচ্য শিল্পের প্রাণ-ধর্ম্ম যেমন স্বীকৃত হয়েছে, প্রতীচ্য শিল্পের কারু-কর্ম্মও তেমনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। তাঁর 'আরব্য উপন্যাস' বা 'তাজমহলের স্বপ্ন' এই দুটি সুপরিচিত ছবির উল্লেখ করছি—এদের আঙ্গিকে এবং বর্ণ সমাবেশে যে বিশেষত্ব দেখা যায়, তা কি একান্তভাবে ভারতীয় পদ্ধতি থেকেই পাওয়া?

(এইখানে বলে রাখা দরকার যে, প্রাচ্যকলা বলতে আসলে রাজপুত, মোগল, দক্ষিণী, নেপালী সব স্কুলকেই বোঝায়—কিন্তু মোটা কথায় আমাদের দেশে প্রাচ্যকলা বলতে এখনো শুধু অজন্তা স্কুলকেই লক্ষ্য করা

হয়ে থাকে এবং তথাকথিত প্রাচ্য শিল্পরীতি নিয়ে যা কিছু আন্দোলন-উদ্যোগ হয়েছে, তাও হয়েছে প্রধানতঃ অজন্তা. স্কুলকে কেন্দ্র করেই)। (এঁরা বলেন প্রাচ্যরীতির মূল কথা হচ্ছে অন্তর্মুখিতা—তার মানে এই যে, প্রত্যক্ষ জগতে যেটা যে রকম, সেটাকে আমরা ঠিক সেই রকম করে দেখি না, দেখি আমাদের আত্মকেন্দ্রিক বাসনার রঙে রঙীন করে—তাই আমাদের দর্শনীয় বিষয়গুলো ততটা বাস্তব নয়, যতটা দিব্য)। বস্তুসত্তার ওপর এই দিব্যতা আরোপই এঁদের মতে শিল্প-সৃষ্টির চরম লক্ষ্য, বস্তুটা তাতে উপলক্ষ্য মাত্র, অর্থাৎ ছবিকে কাব্যের ব্যঞ্জনা দিয়ে এঁরা গভীর করে তোলার পক্ষপাতী এবং সেইজন্যে এঁরা বাস্তব সম্পর্কে উদাসীন। এই মতবাদ নিয়ে প্রাচ্যকলা সুরু হয়ে থাকলে ভালোই, কিন্তু ছবি কাব্যও নয়, গানও নয়—তার ভাষা হল স্থূল, কাজেই তাতে কোন ব্যঞ্জনায় পৌঁছুতে হলে, বাস্তব সংস্থানের ভেতর দিয়েই আসতে হবে। সুতরাং অন্তর্মুখিতার নাম দিয়ে বহিরঙ্গিক রূপায়ণকে অপূর্ণ রাখলে বা বিকৃত করলে, তা থেকে ছবির ধর্ম্মানুযায়ী ব্যঞ্জনায় আসা কোন মতেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ ছবির প্রাথমিক ধর্ম্মই হচ্ছে বাস্তবতা। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, অজন্তা স্কুলের ভালো ছবি যেগুলো, পদ্মপাণি বুদ্ধ বা ভিক্ষানিরতা সুজাতা ইত্যাদি, তাতে অন্তর্মুখিতা আছে ঠিকই, কিন্তু সেই অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনায় আসবার পথে আঙ্গিক বিন্যাসকেও বিন্দুমাত্র ফাঁকি দেওয়া হয় নি, তাহলে ব্যঞ্জনাটাও মাঠে মারা যেতো। কিন্তু প্রাচ্য পদ্ধতির নাম দিয়ে ইদানীং এ দেশে এক শ্রেণীর চিত্রাঙ্কণ চলছে, তাতে দেহকে, বাইরের পারিপার্শ্বিককে অনর্থক বিকৃত করে উপস্থিত করাই হয়েছে একমাত্র প্যাটার্ণ! বাস্তবতার বিচারে সে সব ছবি একেবারেই অর্থহীন—অন্তর্গূঢ়তার হিসাবেও যথেষ্ট সহজবোধ্য কিনা সন্দেহ! এগুলো যে অনধিকারীর অনায়াসজাত কপি তা আমি নির্ভয়েই বলতে পারি। অবনীন্দ্রনাথ বা

তাঁর অনুগামী নন্দলাল বসু আর যাই করুন, এত সহজে বাজিমাৎ করেন নি। প্রাচ্য প্রাণ-ধর্ম্মের অজুহাতে যেখানে এঁরা বস্তুকে ছেড়ে ভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন বা আকারে ও আনুষঙ্গিকে স্বাভাবিকতার বিরোধিতা করেছেন, সেখানে অবশ্য আর্টের বিশুদ্ধ আদর্শকে ক্ষুণ্ণই করেছেন, কিন্তু দু'জনেরই আছে সত্যিকার সৃজনী-প্রতিভা, যার জোরে মূলনীতির এই অসঙ্গতি সত্ত্বেও এঁরা বাংলা শিল্পে একটি প্রাণ-শক্তি সঞ্চার করতে পেরেছেন। এঁদের অনুকারীরা তার অভাবে বিকৃত ড্রইংকেই তাঁদের মূলধন করে তুলেছেন এবং বাজারে তাই প্রাচ্য টেকনিক নামে হু হু করে চলতে সুরু করেছে। বস্তুতঃ এ জিনিষ প্রাচ্যও নয়, প্রতীচ্যও নয়—এ হল শিল্পধর্ম্মেরই ব্যভিচার।

কিন্তু অবনীন্দ্র-নন্দলালের ছবির প্রাণবেগ যা তাঁরা আহরণ করেছিলেন পাশ্চাত্য থেকে, তাই পরবর্ত্তীকালের শিল্পীদের হাত দিয়ে বাস্তবানুগামিতায় রূপান্তরিত হল। এখানেই প্রাচ্যকলার সমাপ্তি এবং প্রতীচ্যকলার সূচনা। রবি বর্ম্মা ও অন্নদা বাগচীর দল আসর জমাতে পারে নি, কারণ তাতে সত্যিকার তাগিদ ততটা ছিল না, যতটা ছিল বিলেতী মডেলের নকল। এতদিনে পরে বিদেশী অনুপ্রেরণাকে দেশীয় উপাদানের ভেতর দিয়ে (সমসাময়িকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে) রূপ দেওয়া হল এবং বাংলা ছবিতে বাস্তবতা স্কুলের প্রতিষ্ঠা হল। পূর্ব্বে যে আধুনিক শিল্পীদের নাম করেছি, তাঁরাই হলেন এই পর্য্যায়ের অগ্রদূত স্বরূপ।

কিন্তু এইখানে একটু ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা আছে। ছবির বাস্তবতা জিনিষটা যে কি তা একটু বিশদ করে ব্যাখ্যা করা দরকার। বস্তুর অন্তর-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব হয়ত আছে, কিন্তু আমি যখন তাকে দেখি, তখন সত্যিই দেখি আমার মতো করে এবং যেহেতু আমার মননশীলতার পেছনে আছে, আমার ব্যক্তি-মনের সংস্কার এবং বৃত্তিসমূহ, সেইজন্যে

আমার দিক থেকে যে তার অস্তিত্ব 'সবিশেষ', তাতে আর ভুল নেই। নিরুপাধিক বাস্তব সেইজন্যে মানববুদ্ধির অগম্য—তাই আর্টে বা সাহিত্যে যখন বাস্তবকে আনা হয়, তখন তা রচয়িতার ব্যক্তিমনের অনুরঞ্জন নিয়েই আসে। সুতরাং আর্টে বাস্তবতা এলো শুনে যাঁরা মনে করবেন, ব্যঞ্জনা-হীন জড় বাস্তবের ফটোগ্রাফী সুরু হল, তাঁরা ভুল করবেন। বাস্তবকে আশ্রয় করে যে সমস্ত বৃত্তির স্থিতি, তারা ছবিতে রইলোই—বাস্তবকে অস্বীকার করে বৃত্তির রূপায়ন পদ্ধতি (যা অবনীন্দ্র স্কুলের বৈশিষ্ট্য), শুধু সেইটাই গেল বাতিল হয়ে এবং এইটুকুই হল বাংলা আর্টে এযুগের বিশেষ দান।

আমার মতে ছবির এই বস্তুমুখিতা সর্ব্ব দেশের এবং সর্ব্বকালের—ভারতীয় শিল্পের অজন্তা স্কুলে, দক্ষিণী স্কুলে, গান্ধার স্কুলেই হক, আর পাশ্চাত্য শিল্পের গ্রীক, ভিনিসিয়ান, ইটালীয়ান, ডাচ বা ফরাসী স্কুলেই হক, সর্ব্বত্রই যেটুকু ভালো, তাতে দেখা যাবে, আঙ্গিকে এবং বিন্যাসে শিল্পীতে-শিল্পীতে যত পার্থক্যই থাকুক, প্রাণবস্তুতে একই জাতের সহজপূর্ণতা রয়েছে। এদিক থেকে মোনালিসায় আর ভিক্ষানিরতা সুজাতায়, এপোলো বেলভেডিয়ারে আর পদ্মপাণি বুদ্ধে সত্যিই কোন তফাৎ নেই। ম্যানে, ডেগাস, মোনে, গগাঁ, সিজাঁ প্রভৃতি ফরাসী শিল্পীদের ইদানীং বাস্তবপন্থী সংজ্ঞা দেওয়া হয়ে থাকে—অবশ্য রৈখিক পরিপ্রেক্ষণীর বলিষ্ঠতায় এবং ছায়াহীন আলোকসম্পাতের চাতুর্য্যে (তাঁরা প্রচলিত ঐতিহ্যের উচ্ছেদ করে টেকনিকের রাজ্যে আমূল পরিবর্ত্তনই এনেছেন, কিন্তু বাস্তবের যা সহজ আবেদন, তা অতি প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত হয়ে আসছে উঁচু জাতের আর্টে।) হয়ত অজ্ঞাতসারেই হয়েছে, কিন্তু উপেক্ষিত হয়নি কোন দিনই। বাংলার তথাকথিত প্রাচ্যকলায় তার অভাব ছিল, তাই এত বড় বড় প্রতিভাধররা তার পুরোভাগে থেকেও তাকে বাঁচাতে পারেন নি।

নন্দলাল বসু, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, চৈতন্য চট্টোপাধ্যায়, যামিনী রায় প্রমুখ শিল্পীরা সত্যিই বড়, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের অবলম্বিত কলাদর্শের মর্ম্মস্থানেই ছিল ত্রুটি, যার ফলে অনধিকারীদের হাতে প্রাচ্যধারায় শেষ পর্য্যন্ত অধোগতিই হয়েছে।

পুরাণ এবং ইতিহাসের সুদূরবর্ত্তী রোমান্টিক পরিবেশ ভিন্ন এই অন্তঃসারহীন আর্ট তাই মুক্তির পথ পায় নি। প্রাত্যহিক সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন এই অলৌকিক আর্টকে বস্তুজগতে নামিয়ে আনলেই দেখা যাবে, এর রঙ অত্যন্ত ফিঁকে—এর আবেদন একেবারেই 'অসৎ'! সেই জন্যেই দূরবিসর্পী রোমান্সের জৌলুষ দিয়ে এই ফাঁকিকে বাজারে চালু করতে হয়। এর সঙ্গে মাইকেল এঞ্জেলো বা টিসিয়ানের তুলনা করুন—বিষয়-নির্ব্বাচনে তাঁরাও পুরাণেরই অনুসরণ করেছেন, কিন্তু তাঁদের অঙ্কিত নর-নারীরা যে কোন কালের মানুষের সঙ্গেই রক্ত-মাংসের সম্বন্ধ দাবী করতে পারে—কারণ তারা জীবন্ত। প্রাচ্যকলায় এই vitalityর ষোল-আনা অভাব। সৌভাগ্যবশতঃ এর দিন গেছে, যে আবেষ্টনীর ভেতর আমরা চলি ফিরি অথচ অতি-পরিচয়ের দরুণ যার রূপ আমাদের চোখে প্রায় নেই বললেই হয়, তাকেই পরিপূর্ণ করে ছবির ভেতর দিয়ে রূপায়িত করা সুরু হয়েছে এবং আধুনিক পর্ব্বের শিল্পীরা প্রায় সকলেই এদিকে মনোনিবেশ করেছেন। এঁদের মধ্যে সতীশ সিংহ এবং রমেন চক্রবর্ত্তী ইদানীং যে দ্রুত উন্নতির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে ভরসা হয়, ডেগাস ও ম্যানের অভাব নিয়ে আমাদের আর বেশী দিন ক্ষোভ করতে হবে না।

কিন্তু আধুনিকতার পেছুনেই এসেছে কিছু কিছু অতি-আধুনিকতা—ত্রিভুজিক অঙ্কন (cubic) বা অতি-বাস্তবিক অঙ্কনের (sur-realistic) দিকেও অনেকের ঝোঁক পড়েছে। অন্তর্মুখতার নাম দিয়ে প্রাচ্যকলায় যেমন এক ধরণের ফাঁকি দেখা দিয়েছিল, অবচেতনার নাম নিয়ে অতি-

বাস্তবিক অঙ্কনেও আজ তেমনি আর এক ধরণের ফাঁকি ঢুকেছে—এবং যেহেতু বুঝতে না পারাটাই এই শ্রেণীর আর্টের একমাত্র কৌলীন্য, সেই হেতু বোধশক্তিকে বিভ্রান্ত করাই হয়েছে এই স্কুলের প্রধান এবং প্রথম লক্ষ্য। অন্তর্মুখী পদ্ধতিরই এটা চরম অবস্থা সন্দেহ নেই, যদিও এরো জন্ম বিদেশী নকল থেকে।

(এই জাতীয় আর্টকে আমি আর্টের রাজ্যে চর্ম্মরোগের শ্রেণীভুক্ত মনে করি।) অবচেতনায় বস্তুবোধের পারম্পর্য্য হয়ত নেই, কিন্তু চেতনার সাহায্যে সেই আদি জন্মভূমি থেকে যখন কাব্য বা চিত্রের প্রেরণা সংগ্রহ করি এবং প্রচলিত শাব্দিক বা রৈখিক ভাষা দিয়ে তাকে ব্যক্ত করি, তখন তাতে সংলগ্নতা না থেকেই পারে না, কারণ অবচেতনার স্বরূপ যাই হক, তাকে প্রকাশ করতে হলে চেতনাকে বাহনস্বরূপ নিতেই হবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাতে আসবে পারম্পর্য্য, যেহেতু চেতনাধারার (stream of consciousness) বৈশিষ্ট্যই তাই। অতি-বাস্তবিক পদ্ধতির পাণ্ডা যাঁরা, মনোবিজ্ঞানের গোড়ার কথাটা তাঁরা জানেন না বলেই এই সব কু-রচনাকে উঁচু জাতের আর্ট নামে চালিয়ে নিরীহ লোককে ঠকিয়ে থাকেন। কিন্তু এইখানে নির্ভয়েই বলবো যে ছবিতে পিক্যাসো, ভাস্কর্য্যে এপিষ্টিন এবং কাব্যে পাউণ্ড ও তাঁর চেলা কামিংস যা করেছেন, তা নির্জ্জলা পাগলামি এবং সে পাগলামি ভেবে-চিন্তে আমদানী করা। বাঙালী শিল্পী ও সাহিত্যিকরা এর মোহে পড়ছেন এটা দুঃখের বিষয়। পাশ্চাত্য থেকে প্রেরণা নেবার দরকার আছে, কিন্তু প্রেরণা মানে সার, খোসা-ভূষি নয়!

[২] কার্টুন

স্বাভাবিক চেহারাকে অস্বাভাবিক করে আঁকা এবং তার দ্বারা হাস্যরসের উদ্রেক করাই কার্টুনের উদ্দেশ্য বলে অনেকের বিশ্বাস এবং ব্যক্তিবিশেষকে প্রকাশ্যভাবে হেয় বা হাস্যাস্পদ করে তোলার কাজেই এর ব্যবহার ভেবে, অনেকে একে খেলো জাতের আর্টও মনে করে থাকেন। তাঁদের ধারণা যে এলোমেলো কালির আঁচড় টেনে, অবলম্বিত বিষয়টিকে একটি উদ্ভট চেহারা দিতে পারলেই কার্টুন হয় এবং তার জন্যে শারীর-সংস্থান বা শিল্পীক-নৈপুণ্যেরও কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। এই মত শুধু যে প্রকৃতজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়, শিল্পীদের মধ্যেও অনেকের এই বিশ্বাস এবং এই জন্যেই বাংলাদেশে কার্টুন-শিল্প এখনো যথেষ্ট পরিমাণ উৎকর্ষ বা বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে নি।

কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র আঁকা যে কাজ হিসাবে খুব সহজ নয়, বরং সাধারণ চিত্রাঙ্কনের চেয়ে অনেক বেশী কঠিন এবং শারীর-সংস্থান সম্বন্ধে রীতিমতো মাত্রাজ্ঞান না থাকলে যে কার্টুন আঁকা একেবারেই সহজ নয়, এটা হাতে-কলমে করে না দেখলে বোঝা সম্ভব নয়। সার্কাসের খেলোয়াড় যখন খেলা দেখায়, তখন তার পেছনে ক্লাউন তার প্রত্যেকটি সুকঠিন কৌশলের সমান সুকঠিন ক্যারিকেচিওর দেখাতে থাকে। এক একবার এমন হয়, মনে হয়, বুঝি আনাড়ী ক্লাউনটা পড়বে এবং মরবে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সে পড়েও না, মরেও না। এর কারণ হচ্ছে খেলোয়াড় যে কৌশল আয়ত্ত করে খেলা দেখাচ্ছে, ক্লাউন সেই কৌশল পূর্ণমাত্রাতেই আয়ত্ত করেছে, তার ওপর শিখেছে কৌতুক করতে—কাজেই বাইরে থেকে তার কৌতুক-ক্রীড়া দেখে আমরা

যখন তা অনভিজ্ঞের ভাঁড়ামি বলে মনে করি, তখন তার ভেতরকার সযত্ন-শিক্ষিত কৌশলটা ধরতে পারি না বলেই এই ভুল করি। কার্টুন জিনিষটাও ঠিক তাই—এর বাইরের বিকৃতিটা আমরা বাইরে থেকেই বিচার করি, তাই এর ভেতর যে শিল্পাক নৈপুণ্য ও সূক্ষ্মমাত্রাজ্ঞান প্রচ্ছন্ন আছে, সেটা আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। মনে হয়, বুঝি অত্যন্ত অনায়াসে তুলির টান দিয়ে গেলেই এই জিনিষ করা যায়। অনায়াসে করা যায় তা ঠিকই, কিন্তু হাতের সেই অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য কত আয়াসে আয়ত্ত করতে হয়, প্রচলিত অঙ্কনে কতটা অধিকার অর্জ্জন করলে তবেই এমন যথেচ্ছভাবে হাত চালানো সম্ভব, সেটা মনে রাখা দরকার। ধরা যাক নাচের মুদ্রা—হাতের একটা বিশেষ ভঙ্গী, যা নৃত্যশিল্পী একদা বহু সাধনায় আয়ত্ত করেছেন এবং এখন অতি অনায়াসেই সর্ব্বসমক্ষে প্রদর্শন করছেন, তা আমার বা আপনার কাছে খুব সহজ মনে হয়, তার কারণ আমরা দেখি ওপর থেকে, যে টেকনিকের ধারাবাহিক অনুশীলনের ভেতর দিয়ে সেই ভঙ্গীটি তার পূর্ণতায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার সোপান পরম্পরার খবর আমরা জানি না। তা জানি না বলেই জিনিষটা আমাদের কাছে নিতান্তই বহিরঙ্গিক।

কার্টুনের ক্ষেত্রেও তাই। চিত্রাঙ্কনের মৌলিক যে সব উপকরণ, তার এনাটমি, তার পরিপ্রেক্ষণী, তার আঙ্গিক বাস্তবতা ইত্যাদি সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান, তা না থাকলে, সত্যিকার কার্টুন আঁকা মোটেই সহজ নয়। কার্টুনে যে চরিত্রটির অবতারণা করা হচ্ছে, সে রক্ত-মাংসের মানুষ, এটা সর্ব্বাগ্রে মনে করানো দরকার—তারপর দেখাতে হয়, তার সেই স্বাভাবিক মানুষী অবস্থার সঙ্গে কি কি অস্বাভাবিক খেয়াল, ঝোঁক বা প্রকৃতিগত বিশিষ্টতার সংযোগ ঘটেছে, অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থাটাকে আশ্রয় করেই অস্বাভাবিক অবস্থাটা আরোপ করতে হয়—সুতরাং স্বাভাবিকতার

কাঠামোটা সমগ্রভাবে পশ্চাৎপটে রাখতে না পারলে, আরোপিত অবস্থাটাকে রূপ দেওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। এই আদি কাঠামোটা খাড়া করতে হলে, ড্রইং জীবন্ত হওয়া দরকার—তবে তার ওপর অলঙ্করণের সম্ভাবনা। ড্রইং-এ-অপটুর এলোপাথাড়ি টানে তাই সত্যি জাতের কার্টুন হয় না—ভাঁড়ামি ও রসিকতায় যে তফাৎ, প্রচলিত ব্যঙ্গচিত্রের সঙ্গে সত্যিকার কার্টুনেরও সেই তফাৎ। সত্যিকার কার্টুন নিছক রঙ্গের প্রয়োজনে আঁকা হয় না—যেমন খাঁটি জাতের রসিকতার একমাত্র লক্ষ্য কোন দিনই হয় না কেবল হাসানো। কার্টুনের আবয়বিক বিন্যাসে হাসির খোরাক থাকে ঠিকই, কিন্তু তার পেছনে সুগভীর ভাব-ব্যঞ্জনাও নিহিত থাকে। তাই কার্টুনকে আমরা হাল্কা আর্টের পর্য্যায়ভুক্ত করতে পারি না, চিত্রশিল্পের রাজ্যে এ হল দস্তুরমতো ভারী জাতেরই আর্ট এবং এখানে মাত্রা-বোধের যতটা প্রয়োজন, স্বাভাবিক অঙ্কনেও ততটা কিনা সন্দেহ। স্বাভাবিক অঙ্কনে, অর্থাৎ পোর্ট্রেট-পেন্টিং-এ শিল্পী কি করেন? অবলম্বিত বিষয়টিকে ব্যবহারিক দিক থেকে রূপায়িত করাই হল তাঁর প্রধান কাজ—সুতরাং তাঁর আসল লক্ষ্য থাকে চেহারার আদলটা আঁকার ওপর, বাইরের চেহারা থেকে ভেতরকার গতি-প্রকৃতির যতটা আভাস পাওয়া যায় (এক কথায় দৈহিক চেহারার যেটাকে ব্যঞ্জন বলা যেতে পারে), তাও অবশ্য আনুষঙ্গিক রূপে আঁকতে হয় তাঁকে, নইলে ফটোগ্রাফে আর পোর্ট্রেটে-তো কোনই প্রভেদ থাকে না, তবু পোর্ট্রেটে যা আঁকা হয়, তা চেহারাটাই এবং মনটা থেকে যায় তারি আড়ালে প্রচ্ছন্ন। কিন্তু কার্টুনে চেহারটা আঁকা হয় গৌণভাবে, আর চারিত্রিক উদ্ভটপনাগুলো (idiosyncracies) আনাহয় অঙ্কনের পুরোভাগে।

সুতরাং ছবি জিনিষটা মোটের উপর objective বা বস্তুকেন্দ্রিক হলেও, কার্টুন ওরি মধ্যে বেশ একটু subjective বা হৃদয়কেন্দ্রিক।

এদিক থেকে প্রাচ্য কলা-পদ্ধতির সঙ্গে কার্টুন চিত্রের বেশ একটু মিল দেখা যায়। প্রাচ্যকলায় বলা হয় যে, দেহ-সংস্থানের লীলায়িত আরোহ-অবরোহের ভেতর দিয়ে অন্তর্গত মনের বিভিন্ন অবস্থান্তরকে রূপ দেওয়া হয়—এই জন্যে ইণ্ডিয়ান আর্টে শারীর সংস্থানের যে ভাঙাচোরা ভাবটা দেখা যায়, তা কি ভেতরকার চলমান ঘটনা-প্রবাহকেই রূপায়িত করতে চায়? কার্টুনে অবশ্য অবচেতন মনের লীলাকে দেহবিন্যাসের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করতে যাওয়া হয় না, অবচেতন মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে স্বভাবে যে সমস্ত বিদঘুটেমি বা বিকৃতি বাসা বাঁধে, সেগুলোকে কালির আঁচড়ে পরিস্ফুট করে তোলবারই চেষ্টা হয়। বাইরে থেকে যে লোক দেখতে অত্যন্ত নরম প্রকৃতির, ভেতরে সে হয়ত অত্যন্ত গোঁয়ার এবং হিংস্রক—পোট্রেটে আমরা পাবো তার সিধে চেহারাটা, যার ভেতর তার স্বভাবটি থাকবে লুকানো, কিন্তু কার্টুনে আমরা পাবো তার ষোল-আনা স্বভাবটাই। এদিক থেকে কার্টুন হল মানব স্বভাবের পূর্ণাঙ্গ কমেণ্টারী স্বরূপ এবং ফটোগ্রাফই বলুন, পোট্রেটই বলুন, এর তুলনায় যথেষ্ট অপূর্ণ।

নিপুণ কার্টুনিষ্ট যিনি, তিনি সাধারণ চেহারার ওপরই এমন একটা-দুটো টান দেন, যাতে ভেতরটা এক ঝলকে আমাদের চোখের সামনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অনিপুণ শিল্পী অনেক সময় এজন্যে প্রতীকের আশ্রয় নিয়ে থাকেন—বাইরে ভদ্র, ভেতরে লোভী বা কৃপণ, একটা লোককে যদি আঁকতে হয়, তাহলে তিনি একটি ধোপদুরস্ত চেহারা আঁকেন, তারপর হয়ত তাতে একটি শকুনির মুখ বসিয়ে দেন…নয়ত এমনি কোন একটা সিম্বলের আশ্রয় নেন। আরও অপটু যিনি, তিনি গল্পের সহায়তা নিয়ে, নয়ত এক দৃষ্টিতেই যা হাসির উদ্রেক করে, এমনি কোন মোটা পদ্ধতির শরণ নিয়ে আসর জমাতে চেষ্টা করেন।

আমাদের দেশে এখনো পর্য্যন্ত যে সমস্ত কার্টুন আঁকা হয়েছে, তাতে এই সব টেকনিকেরই ছড়াছড়ি দেখা যায়। যে উঁচু পদ্ধতির কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, তার ছিটেফোঁটা আভাস দিয়ে গেছেন স্বর্গীয় গগনেন্দ্র ঠাকুর এবং চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়। আধুনিকদের মধ্যে সতীশ সিংহ, বিনয় বসু, যতীন সেন প্রভৃতির হাত দিয়েও অনেকগুলি ভালো কার্টুন এসেছে। যতীন সেনের হাত প্রধানতঃ illustration-এ হলেও তাতে প্রথম শ্রেণী কার্টুনের বৈশিষ্ট্যও সুস্পষ্ট। এই বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতর বিকাশ দেখা যাচ্ছে অতি-আধুনিক কার্টুনিষ্ট পি-সি-এল এ। মনে হয়, এঁর হাত দিয়ে বাংলা কার্টুন তার নিজস্ব ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পারবে। তাঁর ছবির ক্রমবর্দ্ধমান সমাদর থেকে বোঝা যায়, দেশও সত্যিকার কার্টুন উপভোগ করতে আরম্ভ করেছে।

[৩] প্রাচ্যনৃত্য ও উদয়শঙ্কর

উদয়শঙ্কর গ্রুপের জনৈক প্রভাবশালী বন্ধু আমাকে প্রাচ্য নৃত্যের মর্ম্মবস্তু নিয়ে আলোচনা করতে অনুরোধ করেছেন। নিজে কোন দিন নৃত্যবিদ্যার অনুশীলন করিনি—এমন কি নৃত্য-কলার তত্ত্ব নিয়েও যথোচিত চর্চ্চা করেছি কিনা সন্দেহ। কাজেই এ কাজের দায়িত্ব নেওয়া আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চার মতো। তবু যে দু'চার কথা বলতে যাচ্ছি, সে শুধু এই জন্যে যে সাধারণ্যেও আর্টের একটা অপ্রবুদ্ধ আবেদন আছে —এবং সেদিক থেকে অপারিভাষিক আদর্শে এক রকম আলোচনাও হতে পারে, যার মূল্য রসিক সমাজে না থাকলেও, প্রাকৃত সমাজে আছেই।

উদয়শঙ্কর প্রবর্ত্তিত নৃত্যধারা আমি বেশ মনোযোগ সহকারে অনুসরণ করেছি এবং যতদূর সম্ভব সহজ বুদ্ধিতেই তার মর্ম্ম উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছি। আমি যতদূর বুঝেছি, উদয়শঙ্কর ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্য্য থেকে দেহভঙ্গীর বিভিন্ন রীতি আহরণ করেছেন এবং যা পটে বা মূর্ত্তিতে এতদিন অচল সৌন্দর্য্যে অক্ষয় হয়েছিল, তাকেই তিনি দেহবিন্যাসের ভেতর দিয়ে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। পদ্মপাণি বুদ্ধ, নটরাজ শিব, বা অপরাপর ভারতীয় ভাস্কর্য্য-শিল্পের বিখ্যাত নিদর্শনগুলোর ভেতর নৃত্যভঙ্গিমার যে ব্যঞ্জনানিগূঢ় অন্তর্মুখিতা দেখা যায়, দেহলীলার বিচিত্র আরোহ-অবরোহ এবং বিবিধ ভঙ্গীর ভেতর দিয়ে তিনি সেই অন্তর্গূঢ় ভাবনৃত্যকেই ফোটাতে চেয়েছেন। কতকাল আগে যে সব আদর্শ জন্মেছিল শিল্পীর কল্পনায়, আধুনিক কালে তাদের নৃত্যের ভেতর দিয়ে ভাষান্তরিত করতে চেয়েছেন উদয়শঙ্কর।

বলা বাহুল্য অঙ্গক্রিয়াই নৃত্যের একমাত্র অবলম্বন—কারণ তাই হল নৃত্যবস্তুর ভাষা। সে ভাষা নৃত্য-কাব্যের পরস্পর বিচ্ছিন্ন অভিব্যক্তিকে একটি অবিচ্ছিন্ন এবং সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ ভাব-ক্রিয়ার দিকে নিয়ে যায়, আর তাই হল আর্ট। যেখানে তা নেই তা হল জিমনাষ্টিক, পাশ্চাত্য নৃত্যে বা এ দেশের ব্রতচারী নৃত্যে যার নিদর্শন পাওয়া যায় প্রচুর। ফক্সট্রট, ট্যাঙ্গো বা ক্যাবারে নৃত্যে কোন ব্যঞ্জনার বালাই নেই, যেমন নেই রাইবেঁশে, কি কাঠি নৃত্যে। ওগুলো বহিরঙ্গিক নৃত্য-উদ্দাম কামবিহ্বলতায় নয়ত উত্তাল সামরিক উল্লাসে স্ত্রী-পুরুষ যখন মেতে ওঠে, ও হল তখনকার নৃত্য। ওতে পেশীর কসরৎ, দৈহিক শক্তির খেলা, বড় জোর ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মের উদ্বেল আতিশয্যের লীলা প্রকাশ পায়। তাই ওর প্রভাবও ইন্দ্রিয়ের এলাকাতেই সীমাবদ্ধ—তাকে ছাড়িয়ে ওরা অন্তরের রসলোকে প্রবেশাধিকার পায় না।

তথাকথিত প্রাচ্য নৃত্যে একটি ধ্যানমগ্ন প্রশান্তির রূপ দেখা যায়। বহিরঙ্গিক চাঞ্চল্য থেকে উৎসারিত নয় বলেই, এ নৃত্য দেহকে কেন্দ্র করে যেতে চায় দেহাতীতে—দেহটা এখানে উপাদান মাত্র, যা মুখর ও প্রাণবান হয়ে ওঠে ভেতরকার প্রেরণায়। মনের এক-একটি স্থায়ী ভাব, অনেকগুলি সঞ্চারী ভাবের সঙ্ঘাতে অন্তর্লোকে অহরহ যে বিচিত্র ভাবের তরঙ্গ সৃষ্টি করে, তার প্রক্রিয়াও এক রকমের নৃত্য, সেই ভাব-নৃত্যকে দেহের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হলে, দেহ-ভঙ্গীর ক্ষুদ্রতম অবস্থান্তর টুকুর ওপর পর্য্যন্ত সজাগ দৃষ্টি দিতে হয়। চোখের, মুখের, হাত-পায়ের, বুক, কোমর ও উরুর ছন্দায়িত বিন্যাস ত চাই-ই, এমন কি অঙ্গুলীর মুদ্রা এবং ভ্রূর ভঙ্গিমা পর্য্যন্ত সেই ছন্দ-লীলার অনুপূরক রূপেই কাজ করা দরকার। বলা বাহুল্য এই ছন্দ-সঙ্গীতের একটা ব্যবহারিক আবেদন আছে, দেহসৌষ্ঠবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম অনুসারেই সেটা হয়—কিন্তু সেটা প্রাচ্য

নৃত্যে বড় কথা নয়, যে বৃহত্তর অন্তর্সঙ্গীতের আশ্রয়ে বাইরের দেহচ্ছন্দ এই রূপ পরিগ্রহ করে, সেটাকে হারালে, এর প্রাণটাই হারাণো হয়। সেই প্রাণধর্ম্মকে উপলব্ধি করতে হলে, ভারতীয় শিল্পের ধ্যানগম্ভীর পরিকল্পনাটাও উপলব্ধি করা দরকার।

বলা বাহুল্য উদয়শঙ্কর-নৃত্যের রীতিটা প্রাচ্য শিল্প থেকে নেওয়া বলেই একে প্রাচ্য নৃত্য বলা যাবে—কিন্তু তিনি যে নৃত্যাদর্শের প্রবর্ত্তক, প্রাচ্য দেশে কোথাও তা প্রচলিত ছিল না। নানা স্থানের মঠে-মন্দিরে, চৈত্যে-বিহারে, পুঁথি-পত্রে যে সমস্ত আলেখ্য বা পরিকল্পনা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল, সেগুলোকে তিনি কুড়িয়ে কুড়িয়ে এক করেছেন এবং তাদের পরস্পরকে যুক্ত করে একটা বিশেষ নিজস্ব ধরণ তৈরি করে নিয়েছেন।

কিন্তু আদর্শ এই হলেও, কার্য্যতঃ কি এই আদর্শ তথাকথিত প্রাচ্যনৃত্যে সমগ্রভাবে রূপ পেয়েছে? অর্থাৎ উদয়শঙ্করের নৃত্যরীতি আগাগোড়াই কি অন্তরে-বাইরে সামঞ্জস্য রেখে চলে? ভাব-ক্রিয়া যে সব অবস্থান্তরের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়, দেহ-ক্রিয়া কি সব ক্ষেত্রেই তার অনুকূল? আমার ত মনে হয়, অনেক স্থলেই তা হয় না। তার কারণ. এঁরাও ঠিক সেই দোষই করেছেন, যা করেছেন তথাকথিত প্রাচ্য স্কুলের চিত্রশিল্পীরা। দেহের স্বাভাবিক সংস্থানকে অন্তশ্ছন্দের নামে, অকারণ ভেঙেচুরে, তারি ভেতর কোথাও দুর্নিরীক্ষ্য ব্যঞ্জনা প্রচ্ছন্ন আছে বলে দাবি করা এঁদেরও মূলধন হয়ে পড়েছে। নৃত্যাভিনয়ের নাটকীয় দিকটা, অর্থাৎ তার গল্পাংশ (যেমন কিরাত নৃত্যে, কি হরপার্ব্বতী নৃত্যে, কি পাশুপত নৃত্যে) এবং বাদ্য বা আলোকসজ্জা ইত্যাদির প্রাধান্যে অবশ্য অনেক সময়েই এ ত্রুটিটা চাপা থাকে (যেমন ছবিতে থাকে রঙের প্রাধান্যে), কিন্তু এটা ত্রুটিই! তাই আমার মনে হয় উদয়শঙ্কর যদি আভিনয়িক দিকটা কমিয়ে, বিশুদ্ধ একক বা যুগ্ম-নৃত্যের প্রবর্ত্তন করতেন,

তাহলেই তাঁর পরিকল্পনা সুন্দরতর রূপে ফুটতো। উদয়শঙ্করের একক নৃত্য সম্বন্ধে আমার ধারণা অত্যন্ত উঁচু—কিন্তু তাঁর পরিমণ্ডলের আর কারুর ভেতরই আমি প্রতিভার পরিচয় পাই নি। উদয়শঙ্কর সম্বন্ধেও আমার একটি আপত্তি আছে, তাঁর পায়ের কাজ আমার পছন্দ হয় না—তাঁর মনোরম পরিমার্জ্জিত দেহলীলার ভেতর পা দুটির অসংস্কৃত কঠোরতা সমগ্র নৃত্যেই লালিত্যের অভাব ঘটায় বলে আমার বিশ্বাস। একান্তভাবে মুদ্রাপ্রধান দক্ষিণী নৃত্যকে অনুসরণ করাই বোধ হয় এর কারণ—গুজরাটী, মণিপুরী, বা এম্নি কোন লালিত্যময় নৃত্যের প্রলেপ দিয়ে নিলে বোধ হয় এটা মানিয়ে যেতো, যা হয়েছে শান্তিনিকেতন স্কুলের নৃত্যে বা নটরাজ বশীর নৃত্যে। অন্ততঃপক্ষে সিমকির ত এর প্রয়োজন আছেই। এ্যনা প্যভলোভা বা রাগিণী দেবীর নৃত্যলীলায় যে শিল্প সৌকুমার্য্য দেখেছি, তাঁতে তার অর্দ্ধেকও দেখিনি—আবার উদরশঙ্করের উদাত্ত গম্ভীর ভাবনিগূঢ়তাও তিনি আয়ত্ত করতে পারেন নি, তাই তাঁর ‘পেয়ার’ হিসাবে উদয়শঙ্করের নৃত্য একেবারেই সম্পূর্ণতায় পৌঁছুতে পারে না বলে আমার ধারণা।

কিন্তু এখানেই ইতি করি। তার আগে আর একবার বলে নিই যে নৃত্য ব্যাপারে আমি প্রাকৃতজন—কোন বিশেষজ্ঞতার দাবী আমার নেই, কোনদিন গভীর নিষ্ঠা নিয়েও এর আলোচনা করি নি। ইদানীং কবি রবীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তনায় নৃত্যকলা রঙ্গমঞ্চ এবং বাইরের আসর থেকে বেরিয়ে, অভিজাত সমাজে শ্রদ্ধার আসন নিয়েছে—উদয়শঙ্কর তাকে বহিঃ-পৃথিবীতে বরণীয় করে এই আসনের মর্য্যাদা আরো বাড়িয়েছেন, এজন্যে এঁরা উভয়েই ধন্য। উদয়শঙ্করের নৃত্য আমি উপভোগ করেছি এবং সেই জন্যেই তার যেটুকু ত্রুটি আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, তাও দেখাতে চেষ্টা করেছি।

[৪] শান্তিনিকেতনে চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য

শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠিত চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের অভিনয় দেখে সম্প্রতি বিশেষ আনন্দ লাভ করলাম। নৃত্যনাট্য জিনিষটি বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রায় নূতন—কাজেই এর স্বাদে আমরা এখনো সবিশেষ অভ্যস্ত হইনি। সেই জন্যেই বোধকরি এই মনোরম অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

আলোচ্য নৃত্যনাট্যে নৃত্য ও গীত উভয়ের সমন্বয়ে নাটকের কথা-বস্তুকে পরিণতির মুখে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—কিন্তু গীত এতে আনুষঙ্গিক, নৃত্যই এর প্রধান অবলম্বন। গীত এবং বাদ্য এর পরিবেষ্টনের অন্তর্গত, তা দর্শকের অনুভূতিকে পরিপুষ্ট হ'তে সহায়তা করেছে মাত্র। কিন্তু নাটকীয় সংস্থান ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রূপায়িত হয়েছে নৃত্য-ভঙ্গিমার ভেতর দিয়েই। কাজেই এর অভিনয় ভাষার দিক থেকে প্রায় মূক—দেহ-বিন্যাসের আরোহ-অবরোহের ও তার সূক্ষ্ম তারতম্যের মধ্যে দিয়েই তা বিস্ময়কর রূপে মুখর। গীত যেহেতু এতে নৃত্যের সহকারী, সেইজন্যে এর অন্তর্গত অধিকাংশ গানই লেখা অনেকটা কথোপকথনের ধারায়। অবশ্য বিশুদ্ধ জাতের সঙ্গীতও যে এতে নেই তা নয়, বরং নৃত্য-ক্রিয়ার সঙ্গে সর্ব্বত্রই গীতি-ধর্ম্মের যে রকম আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখা গেল, তাতে গীতের সাঙ্গীতিক ন্যূনতা কোথাও আছে তা সহসা যেন বোঝাই যায় না। কবি যে ইচ্ছা করেই এর গানগুলিকে এই রকম বাচনিক ঢঙে লিখেছেন তাতে সন্দেহ নেই, কারণ আমরা আগেই বলেছি, এই নাটকে গানকে তিনি নৃত্য-ক্রিয়ার অনুপূরক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তা নাটকে পেছন থেকে গল্প জোগানোর ভার নিয়েছে—এবং সেই সঙ্গে

সুরের সহযোগিতায় নৃত্যকেও জীবন্ত করেছে। অর্থাৎ কিনা আলোচ্য নৃত্য-নাট্য রচনায় কবিকে একাধারে লিখতে হয়েছে গীত, আবার তাকে খাপ খাওয়াতে হয়েছে নৃত্যের বিষয়-বস্তুর সঙ্গে।

গীতি-নাট্যের সঙ্গে নৃত্য-নাট্যের প্রভেদ সুস্পষ্ট। গীতি-নাট্যের চরিত্রগুলি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যে-সব দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়, তাকে গীতের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে। কাজেই সেখানে অভিনয়ের বাচনিক আবেদন প্রত্যক্ষ—বরং সঙ্গীতের সহায়তা পাওয়ায় তার দ্যোতনা অধিকতর স্পষ্ট। কিন্তু কেবল মাত্র দেহ-ভঙ্গীর ভেতর দিয়ে সমুদয় অন্তর্দ্বন্দ্বকে ভাষা দেওয়া এবং সেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন অসংখ্য ব্যঞ্জনাকে একটি অর্থপূর্ণ সমাহিত পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া শুধু কঠিন নয়, প্রায় অসম্ভবই বলা যেতে পারে —বিশেষতঃ দর্শকের বোধবৃত্তি যখন আখ্যানাংশের সঙ্গতিপূর্ণতার অপেক্ষা রাখে। এই দুরূহ কার্য্যে অভিনেতৃবৃন্দের আশ্চর্য্য কৃতিত্ব লক্ষ্য করা গেল।

চণ্ডালিকার কাহিনীর আমরা পুনরুল্লেখ করবো না—কারণ কবি ইতিপূর্ব্বে এই নামে যে গদ্য-নাটিকা রচনা করেছিলেন, এর বিষয় ভাগ তা থেকেই আহৃত এবং সেই সমস্ত পাত্রপাত্রীই এতে পুনরাবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু আগে তারা যেরূপে দেখা দিয়েছিল, এখন তা থেকে রূপভেদ ঘটেছে এবং এই রূপভেদে তাদের জন্মান্তর ভেদও ঘটেছে বলতে পারি। ভাষা ও ক্রিয়া-কলাপের সহজ আবেদন নিয়ে যে অভিনয়, তা প্রত্যক্ষ সংসারের প্রতিরূপ বলেই তার গতি হয়ত অধিকতর তীক্ষ্ণ এবং সত্যাভিমুখী হয়, কিন্তু সেই আপাত সত্যকে আড়াল করে, ভঙ্গী ও মুদ্রা মাত্র মূলধন নিয়ে, সমস্ত বিষয়টিকে জীবন্ত করে তোলা তার চেয়ে উচ্চ অঙ্গের শিল্প। এতে ছন্দায়িত দেহ-বিন্যাসের ভেতর দিয়ে দেহাতীত ভাব-ব্যঞ্জনা সৃষ্টি আবশ্যক হয়ে পড়ে। এখানে পেলব মাংসলতা বা ভঙ্গীর সহজ চাতুর্য্য দিয়ে বাজীমাৎ করা যায় না। তাই এর উপলব্ধিও

আজো বিদগ্ধ সমাজের এলাকায় সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। প্রাকৃতজন দেখে তারিফ করে, কিন্তু মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারে না। চণ্ডালিকা সম্বন্ধে অবশ্য আমরা এতটা আশঙ্কা রাখিনি, তবে তা হলেও যে খুব আশ্চর্য্যান্বিত হতাম তা বলতে পারি না।

আলোচ্য নৃত্যাভিনয়ে মণিপুরী নৃত্য ও দক্ষিণী নৃত্য, দুটি স্বতন্ত্র ধারাকে একত্র মেলানো হয়েছে। সেই সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণ ক্যাণ্ডি নৃত্যেরও মিশেল দেওয়া হয়েছে। এই মিশ্রণ এমন সহজ স্বচ্ছ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যাতে দুই ধারার বিশিষ্টতা দুয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে গিয়ে তৃতীয় একটি রসাদর্শ গড়ে তুলেছে—যাকে শান্তিনিকেতনের নিজস্ব আদর্শ বলা যেতে পারে। দক্ষিণী নৃত্য একান্তভাবে মুদ্রাপ্রধান—কাজেই অভিনয়ের আঙ্গিক আবেদনে তা বিশেষ সহায়তাই করে। অবশ্য তাই বলে পাশ্চাত্য acrobatic নৃত্যের মতো দক্ষিণী নৃত্য ব্যঞ্জনা-বিমুখ নয়, বরং অন্তর্বস্তুর রূপায়নে তার আঙ্গিক আনুপূর্ব্বিকতাই যেন কতকটা আতিশয্যের মতো। পক্ষান্তরে মণিপুরী নৃত্য ভঙ্গী-প্রধান, কাজেই তা লালিত্যময়। টেকনিকে এই কঠোর-কোমলের যুগপৎ মিশ্রণ হওয়ায় চণ্ডালিকা নাট্যের বিয়োগ-মিলনাত্মক সুর, তার চরম দ্বন্দ্ব ও পরম সমাধান সুন্দররূপে মূর্ত্ত হয়েছে। 'আনন্দের' পতনের যে সুতীব্র ট্র্যাজেডী, যাদুর প্রভাবে তাঁর সমাহিত তপস্যালোকের যে বিঘ্ন, তার জন্যে প্রয়োজন ছিল এমনি দার্ঢ্যময় একটি টেকনিকের, আবার হৃদয়াবেগের আতিশয্যে পূজনীয়ের হীনতাসাধনের মধ্যে যে অনুতাপ ও আর্ত্তির সুর, তার জন্যে প্রয়োজন ছিল এমনি একটা পেলব অভিব্যঞ্জনার। এ দুয়ের মিশ্রণ চণ্ডালিকার বিষয়বস্তুকে মেঘ-রৌদ্রের বিচিত্রতা দান করেছে—কবির পরিকল্পনা আশা করি এই রকমই ছিল।

এবার অভিনেতাদের কথা। 'আনন্দের' ভূমিকায় কেরু নায়ার যে

কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা আমাদের বিশেষ খুসী করেছে—তাঁর হাত-পা ও চোখের ক্ষুদ্রতম পরিবর্ত্তনটুকুও আশ্চর্য্যজনক রূপে ভাবমুখর। নিরাসক্ত নির্ব্বাণ-পন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষুর তপোমূর্ত্তিকে তিনি সম্যকভাবেই রূপ দিয়েছেন। শুধু শেষাংশে আমরা আর একটু মসৃণতা আশা করেছিলাম, তবে শেষাংশে তাঁর আবির্ভাবটা প্রত্যক্ষ নয়, ওটা 'প্রকৃতি'র অন্তর্দৃষ্টিতে —সেখানে হয়ত তপস্যাহানির ঝঞ্ঝামূর্ত্তিকে সে ঐ ভাবেই দেখে থাকবে। 'প্রকৃতি'র অভিনয় আগাগোড়া অব্যাহত ছন্দে বয়ে গেছে, তাতে খুব বেশী আরোহ-অবরোহের বৈচিত্র্য নেই, কিন্তু কারুণ্যের স্নিগ্ধতা আছে। এত বড় ভূমিকায় আনুপূর্ব্বিক সুর রেখে চলা শুধু কৃতিত্ব নয়, প্রতিভা সাপেক্ষ—তবে তাঁর মুখে অল্প দু'একটা গান না বসালেই হতো, কারণ গান ত পরিবেশ থেকেই জোগান দেওয়া হচ্ছে। এই ভূমিকায় নেমেছিলেন নন্দিতা কৃপালনী। মায়ের ভূমিকায় মৃণালিনী স্বামীনাথনও যথেষ্ট রসজ্ঞতা ও ভাব-গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন। ডাকিনীবিদ্যাপরায়ণা চণ্ডালপত্নীর দুর্দ্ধর্ষ ভয়ঙ্করতা একদিকে, অন্যদিকে স্নেহশীলা জননীর দুর্ব্বল হৃদয়াবেগ, এই দুই পরস্পর-বিরোধী ভাবকে সর্ব্বাঙ্গীনরূপে রূপায়িত করে, তিনি চমৎকার নৃত্যাভিনয় করেছেন। এ ছাড়া দইওয়ালার নৃত্য বা পল্লীনারীদের নৃত্য বা গাথক সঙ্ঘের গীতও আমাদের বিশেষ প্রশংসনীয় মনে হয়েছে।

সর্ব্বসমেত চণ্ডালিকা নৃত্য-নাট্যের অভিনয় যে বিশেষ উপভোগ্য হয়েছে একথা অসংশয়েই বলা যেতে পারে। এজন্যে প্রথমে ধন্যবাদার্হ কবি রবীন্দ্রনাথ, যিনি এই নৃত্য-নাট্যের প্রবর্ত্তক, তারপরে ধন্যবাদার্হ শান্তিনিকেতনের উদ্যোক্তৃবর্গ, যাঁরা আমাদের এই নাট্য-রস সম্ভোগের সুযোগ দিলেন।

[৫] বাংলা গানের বিশেষত্ব

আমাদের ছেলেবেলায় গাইয়ে সমাজে বাংলা গান সম্বন্ধে একটা অনুকম্পার ভাব দেখা যেতো। অতি ছোটোখাটো গোছের ওস্তাদও মস্ত একটা তাম্বুরা ঘাড়ে করে বসতেন এবং যে হিন্দীর এক বিন্দুও জানতেন না, তাতেই বেঁকিয়ে-চুরিয়ে গলার কসরৎ দেখাতেন। যদি কোন অতি সাহসী বাংলা গান গাইবার ফরমায়েস নিয়ে হাজির হতেন, তাহলে তাঁরা চটে লাল হয়ে যেতেন। হার্মোনিয়াম বাজানো আর বাংলা গান গাওয়া তাঁরা ওস্তাদী আভিজাত্যের বিরুদ্ধ বলে মনে করতেন। স্পষ্ট করেই বলতেন, বাংলা গানে কথার বাড়াবাড়ি—সুরের কারিকুরি ও গলার কাজ দেখানোর ওতে অবকাশ কোথায়? সুরকে ছাপিয়ে ওঠে কথা—প্রাকৃত জনের পক্ষে তা বোঝা সহজ, কিন্তু ও ত গান নয়, গানের ভ্যাংচানী!

সাদৃশ্য টেনে তাঁরা দেখাতেন যে ছবির ক্ষেত্রে যেমন অঙ্কনটাই হল মুখ্য, বিষয়-বস্তু সেই অঙ্কনের উপকরণ, সুতরাং গৌণ ছাড়া কিছুই নয়, গানের ক্ষেত্রেও তেমনি সুরই আসল বস্তু, বাণী তার বাহন মাত্র। ক্ল্যাসিক্যাল গানে এই জন্যে কথার স্থান অনেক নীচেয়। যেমন-তেমন করে গোটা কতক লাইন দাঁড় করিয়ে, সুরের চলা-ফেরার পথটা তৈরি করে দিলেই হয়ে গেল। কথা গাঁথার যে বিশেষ পদ্ধতিকে কবিতা বলে, গানের রাজ্যে তা অবাঞ্ছিত—কারণ, গান হল একটা আত্মস্বতন্ত্র শিল্প, তাকে কাব্যের ভেজাল দিয়ে ঘোলা করে তোলা শুধু অন্যায়ই নয়, অসঙ্গত। এরপর বাংলা গানের কথা তুলে তাঁরা বলতেন যে বাংলা গান প্রথমে কাব্য, তারপর গান—সুতরাং গান হিসাবে তার প্রয়োগ

আর যাই করুক, সাঙ্গীতিক বিশুদ্ধির দাবী করতে পারে না, তাই কুলীন গাইয়ে সমাজে ওর জলাচরণীয়তা স্বীকৃতব্য নয়।

বলা বাহুল্য ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতের চর্চা আমি এমন ভাবে করিনি যে সে সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করতে পারি। তবে এটুকু বুঝেছি যে ক্ল্যাসিকাল স্কুল গানের ভাষাগত আবেদনকে স্বীকার করেন না, করেন সুরগত আবেদনকে—অর্থাৎ তাঁদের মতে সুরের আরোহ-অবরোহ, গমক-গিটকারী, মীড়-কর্ত্তব ইত্যাদি থেকে শ্রোতার মনে যে শব্দ-সঙ্গতির আনন্দ জাগে, গানের দিক থেকে সেই হল চরম লক্ষ্য। এই মূক শব্দ-ক্রীড়ার পেছনে কোন অর্থের যোগ আছে কিনা এবং সেই অর্থ অন্তর-রাজ্যের নানা ভাব-স্মৃতিকে আশ্রয় করে মুখর হয়ে ওঠে কিনা সেটা গানের দিক থেকে মোটেই বিচার্য্য নয়। গান সুর-লীলার ভেতর দিয়ে সৃষ্টি করবে নানা নিরুপাধিক অনুভবকে—তাকে জীবন্ত ও অর্থবান করে তারি সাহায্যে গানকে বরণীয় করে তোলার কাজ তার নয়। যেখানেই এ কাজ করা হয়, সেখানেই এই স্কুলের মতে, গান তার জাত খুইয়ে খেলো হয়ে পড়ে এবং বিশুদ্ধ সমাজের কাছে তার আর পাংক্তেয়ত্ব থাকে না।

কেতাবী মত হিসাবে এ কথার কদর যাই হক, এই ক্ল্যাসিকাল গোঁড়ামির সঙ্গে অন্তরের যোগ নেই অনেকেরই। আমাদের সমস্ত আবেগ সমস্ত সহানুভূতিই অন্তরের রাজ্যে তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু নাম ও সংজ্ঞার নির্দ্দেশ না পেলে তারা দানা বাঁধতে পারে না, পরস্পরের সংস্রব কাটিয়ে তারা এক-একটা অখণ্ড বোধে রূপান্তরিতও হতে পারে না। অর্থাৎ চেতনার যা-কিছু সক্রিয় বৃত্তি, তার মূলেই আছে বস্তুর সঙ্ঘাত, ভাষা এই বস্তুর নির্দ্দেশ দেয় বলেই ভাষাকে বাদ দিয়ে চলবার উপায় নেই। ক্ল্যাসিকাল গান যখন ভাষাকে চাপা দিয়ে কেবল

মাত্র সুরের উপর দাঁড়ায়, তখনই তা চলে যায় আমাদের বোধবৃত্তির বাইরে—তার সঙ্গে আমাদের অন্তরের যোগ ছিন্ন হয়ে যায়, মস্তিষ্ক দিয়ে আমরা করি তার কারিকুরির বিচার, মন দিয়ে তাতে মৌজ হয়ে যাইনে। পাখীর গানে, জলের শব্দে, অরণ্যের মর্ম্মরধ্বনিতে, যন্ত্র-সঙ্গীতের বিচিত্র কলা-কৌশলে আমরা যে আনন্দ পাই, তাই যদি সত্যিকার সাঙ্গীতিক আনন্দ হয়, তাহলে অবশ্যই বলতে হবে সে আনন্দ মূক, তার কোন আবেদন নেই। নিজের নিজের মনোধর্ম্ম ও বাস্তব অবস্থার প্রভাবে তাতে যে আবেদন আমরা সৃষ্টি করে নিই, সে হল আরোপিত—একান্তই বাইরের জিনিষ।

এই জন্য আমার মতে বিশুদ্ধ ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত হল, ঠিক ততটা আর্ট নয়, যতটা বিজ্ঞান—তার বাঁধা ফরমিউলা আছে, সেই দাগে দাগে পা মিলিয়ে চললেই এবং নির্ভুল করে. নিখুঁত করে সেই চলাটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই তাতে উৎকর্ষ লাভ করা যায়। যাঁদের জানা, তাঁরা এই চলাচলির কেরামতীতে মুগ্ধ হন, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশায় মানুষের মনে প্রতিনিয়ত চলছে যে ভাঙাগড়ার খেলা, তারি ভিতর দিয়ে পথ করে সমস্ত সুখ-দুঃখের উর্দ্ধে মানুষকে নিয়ে যেতে পারে যে প্রাণবন্ত ভাষা, তা এতে নেই বলেই এর অবুঝ ধ্বনিগুলো অন্তরের আনাচে কানাচে অযথা মাথা ঠোকাঠুকি করে বেড়ায়। এতে রস পেতে হলে এই জন্যেই তৈরি বিশেষ শ্রেণীর সমজদার দরকার, যার বাইরে এ জিনিষের দাম কাণাকড়িও নয়।

সৌভাগ্যের বিষয় বাংলা দেশে এই বিজ্ঞান-বিশুদ্ধ গানের চর্চ্চা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সমাদর পেলেও, দেশের জন-মনে আসন পেয়েছে অন্য রকমের গান—সে হল রোমান্টিক গান, ওস্তাদী স্কুলের অনুকারীরা যাকে বাংলা বুলি বলে উপেক্ষায় মুখ ফিরিয়ে নেন। এই গানে সুরের

কারিকুরি ও গলার কেরামতীকে অবশ্য ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়নি, কিন্তু তাকে করা হয়েছে বাণীর বাহন—সুন্দর সুগ্রথিত কথার উপর সুষ্ঠু সুর বসিয়ে, প্রতিনিয়ত ব্যবহারে ভাষার চেহারায় যে অভ্যাস-মলিন বর্ণহীনতা জমা হয়েছে, তা দূর করা ও তাকেই নিবিড় করে নূতন করে বিচিত্র করে মনের সাম্নে পরিবেষণ করে দেওয়া হল তার কাজ। একেই বাঙালী মনে করেছে সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলে। এই জন্যেই বাংলা গান চিরদিন প্রাণ-ধর্ম্মী, তাতে কথার আসন সবার উপরে। ক্ল্যাসিকাল আইন-কানুনের নাকের ওপরেই বাংলা গানের যে সমস্ত নিজস্ব ঢং এদেশে চিরদিন সম্মানিত, তারা সবাই গেছে ভাষা-শিল্পের কুসুমিত পথ দিয়ে, রাগ-সঙ্গীতের কণ্টকাকীর্ণ শব্দ-ক্রীড়া তাদের আকৃষ্ট করতে পারেনি। কার্ত্তন, ভাটিয়াল, বাউল, রামপ্রসাদী, খাস বাংলা গান বলতে যা বোঝায় —তার সবই হল প্রাণধর্ম্মে ঋদ্ধ—সুর তাদের আছে, কিন্তু সে সুরে মাধুর্য্যই পেয়েছে একমাত্র স্বীকৃতি, কারণ তা হল ভাবানুভূতির অনুপূরক, তার বাইরে, হৃদয় সংস্রবহীন নিরর্থক কণ্ঠ-কুস্তিকে কলা হিসাবে বাংলা সম্মান করেনি। রোমান্টিক বাঙালীর গানও রোমান্টিক—ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতের গাণিতিক ছকে তাকে বাঁধা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু তথাকথিত ওস্তাদী গানের পাণ্ডারা বাংলা গানের এই বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করতে চাননি, তার কারণ খাস বাংলা গানকে বরণীয় করে প্রচার করবার যোগ্য নেতা আগে ছিলেন না। তাই বাজার-চলতি কীর্ত্তনীয়া, ফকির, দরবেশ, মাঝি-মাল্লা ও চাষী-মজুরদের ভেতরে সসঙ্কোচে আত্মগোপন করেই এদেরকে দিন কাটাতে হয়েছে। দেশের নাড়ীর সঙ্গে এদের সুগভীর যোগ সকলেই টের পেয়েছেন, কিন্তু যোগ্য মর্য্যাদা দিয়ে এদের প্রতিষ্ঠিত করার সুবিধা হয়নি, একই সঙ্গে বড় গায়ক ও গীত-রচয়িতা না থাকায়। রবীন্দ্রনাথ এ অভাব পূরণ করার পর থেকে বাংলা

গানের অস্পৃশ্যতা ঘুচে গেল। ভদ্র সমাজে কলা-চর্চ্চার প্রাত্যহিক ভোজে তার আসন কায়েম হল, শুধু কায়েমই নয়—অনেক দিক থেকে, তথাকথিত ক্ল্যাসিকাল গানের ওপরেই তার স্থান হল। (এইখানে বলে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথ নিজে বাল্যে যদুভট্ট এবং মধ্যবয়সে গোঁসাইজির সংস্রবে থেকে ক্ল্যাসিকাল গানের অনুশীলন কম করেন নি)। রবীন্দ্রনাথের মতো বড় রচয়িতা ও সুরস্রষ্টা কীর্ত্তন, বাউল, প্রভৃতিকে পাংক্তেয় করে তুললেন বলেই দেশের শিক্ষিত সমাজ কালোয়াতী কসরতের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারলো। সেখান থেকেই নূতন করে সুরু হল বাংলার গীত-আন্দোলন। দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল ইসলাম, ইত্যাদির দানও এদিক থেকে কম নয়—কিন্তু রবীন্দ্রনাথই হলেন বাংলা-দেশের এযুগের সঙ্গীতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তি-দাতা।

আজকে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে সুরু হয়েছে গানের অনুশীলন। এতদিন এটা হতে পারেনি, তার কারণ দেশের প্রত্যেকটি অলিগলি আটক করে পাগড়ী ও তাম্বুরাধারী পালোয়ানরা পাহারা দিচ্ছিলেন সঙ্গীত-লক্ষ্মীর মন্দির। আজ তাঁদের আসন হয়েছে যথাস্থানে এবং যে-কোন লোক, সামান্য চর্চ্চা ও প্রচুর প্রাণের আনন্দ নিয়েই গানের আসরে এগিয়ে এসেছে। এর জন্য ধন্যবাদার্হ রবীন্দ্রনাথ। সেদিন বিশ্বভারতী সম্মেলনের বৈঠকে কবি যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে দেশের এই সাঙ্গীতিক অনুপ্রেরণার তিনি যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। সেই সঙ্গে যাঁরা তাঁর গানকে তাদের মূল সুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে আপন খুসী মাফিক সুর দিয়ে গেয়ে থাকেন, তাঁদের নিন্দাও করেছেন প্রচুর। জিনিষটা ভালো বুঝতে পারিনি। ক্ল্যাসিকাল গানের প্রচার নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভেতর—তার রীতি-পদ্ধতিও ছক-বাঁধা। কাজেই ওতে সুর-বিশুদ্ধি রাখা সম্ভবপর। কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীত দেশের জন-মনে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে—তার ধরণ-ধারণেও

কোন বাঁধাবাঁধির বালাই নেই, কাজেই কণ্ঠ থেকে কণ্ঠান্তরিত হতে হতে তার গোত্র পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নয়, বরং তা হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ তা না হলে সঙ্গীতের রাজ্যে সর্ব্বসাধারণের অবাধ প্রবেশ কি করে সম্ভব হবে? প্রাচীন বাংলা গানে এই স্বাধীনতা ছিল, তাই তা মরেনি। আধুনিক গানও মরবে না, যদি তাতে সেই স্বাধীনতার অধিকার মঞ্জুর করা হয়, আর বাংলা গানের (মানে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের) মেজাজেই সে অধিকার দাবী করে। সুতরাং যে ক্ল্যাসিকাল কড়াকড়ি ভেঙে রবীন্দ্রনাথ দেশকে দিলেন মুক্তির স্বাদ, সেই মুক্তি কেড়ে নিয়ে আবার তিনিই কড়াকড়ির প্রবর্ত্তন করতে চাইছেন কেন, এ আমার বুদ্ধিতে আসে নি।

তৃতীয় স্তবক : রসাদর্শ

[১] সাহিত্য ও বাস্তব

এখনকার সাহিত্যে বাস্তবকে এত বেশী প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে যে যা সচরাচর সুলভ নয়, যাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায় না, তাকে অসত্য বলে, অপ্রয়োজনীয় বলে বর্জ্জনই করা হচ্ছে। আগেকার আমলে বলা হতো, যা প্রত্যক্ষ যা প্রাত্যহিক, তা ত চোখের ওপরই রয়েছে—উঠতে-বসতে প্রতি-পদেই ত তাকে আমরা দেখছি শুনছি, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে অনুভব করছি—শিল্পে এবং সাহিত্যে আবার তাদেরই আবির্ভাব কি দরকার? বরং এই প্রত্যক্ষতা বা বাস্তবতার অতিমাত্রিক অত্যাচার থেকে ক্ষণিক মুক্তি পাওয়াই ছিল প্রাচীনদের মতে আর্টের পরম প্রসাদ। এই মতের পোষকতা করেই তাঁরা আর্টের সংজ্ঞা নির্দ্দেশের সময় রসকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

তাঁরা বলতেন, বাস্তবকে আশ্রয় করেই আর্ট সৃষ্ট হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সৃষ্টি হয়ে যাবার পর তার এমন ভাবেই রূপান্তর ও জাত্যন্তর হয়ে যাবে যে তখন আর তাকে বাস্তবের প্রতিরূপ বলে মনে করা চলবে না। অর্থাৎ একটা শোককে অবলম্বন করে যদি কবিতা লেখা হয়, তাহলে কবির অন্তরের অনুভূতি ও ভাব-ব্যঞ্জনার মিশ্রণে তাকে ব্যক্তি-বিশেষের সীমাবদ্ধ শোককে ছাপিয়ে, বিশ্বমানবের চিরন্তন বেদনার পর্য্যায়ে উন্নীত করতে হবে—নচেৎ কাব্য হিসাবে তা হবে অসার্থক। যদি কোন নারীর আলেখ্য আঁকা হয়, তাহলে বাস্তবে তাঁর যা রূপ, তার ওপর এমন একটা নৈর্ব্যক্তিক সত্তা আরোপ করতে হবে,

যাতে তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অস্তিত্বকে ছাপিয়ে উঠতে পারেন। তাঁরা বলতেন, সংবাদপত্রের বিবরণ যেজন্যে সাহিত্য নয় এবং ফটোগ্রাফ যেজন্যে চিত্রকলা নয়, তা এই যে তাতে হৃদয়বৃত্তির সংস্রব নেই, তা নিতান্তই যান্ত্রিক উৎপাদনের শ্রেণীভুক্ত। তাঁরা শিল্পকে হৃদয়সম্পর্ক সঞ্জাত বলে মনে করেছিলেন এবং বাস্তব উপাদানের ওপর হৃদয়বৃত্তির সংযোজনা করে তাকে বাস্তবাতীত বা অতীন্দ্রিয় করে তোলারই পক্ষপাতী ছিলেন।

এই অতীন্দ্রিয়তা বলতে তাঁরা কি বুঝতেন? তাঁরা বুঝতেন, যা স্থূল এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাতে মানুষের অসীম প্রয়োজন হলেও, পরিতৃপ্তি নেই—জীব হিসেবে তার প্রত্যক্ষ জীবন ইন্দ্রিয়ের জগতে আবদ্ধ হলেও, তার ভাব-জীবন এতে আবদ্ধ নয়। তা মুহূর্তে মুহূর্তে এই স্থূলের মাঝখানে আড়াল রচনা করে স্বপ্নের অনুসরণ করে এবং যা নেই, যা হয় না, যা পাওয়া সম্ভব নয়, তাকেই আপনার বাসনা দিয়ে সৃষ্টি করে নেয় এবং তারই স্বপ্নানুরঞ্জিত আবেষ্টনীর ভেতরে নিজেকে নির্ব্বাসিত করে বাস্তব জীবনের ব্যর্থতা, ক্ষয়, ক্ষতি ও যন্ত্রণাকে ভুলতে চেষ্টা করে। প্রত্যেক মানুষের ভেতরই যে একটা করে প্রত্যক্ষ-পুরুষ এবং একটা করে ভাব-পুরুষ থাকে, এটা পুরানো মতে স্বীকৃত হতো—এবং প্রত্যক্ষ থেকে ভাবে পৌঁছানোকেই এই মত অনুসারে শিল্পের আদর্শ বলে ধরা হতো।

এই মতের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে আর্টের মূলসূত্র এই দাঁড়ায় যে, আর্ট জন্মায় বাস্তব থেকেই, কিন্তু কল্পনার অনুরঞ্জনে সে বাস্তব প্রাত্যহিকতার গণ্ডী কাটিয়ে যখন চিন্ময় রূপ গ্রহণ করে, তখন তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংস্রব ছিন্ন হয়ে যায়—কাজেই বাস্তবে যে জিনিষ যে জৈব-বৃত্তির উদ্দীপক, রসাত্মকতা লাভের পর তা আর তা করে না, শুধু অখণ্ড আনন্দই দেয়। অর্থাৎ বাস্তবের যে সমস্ত জিনিষ কাম-ক্রোধ,

ক্ষুধা-তৃষ্ণা, বা এই জাতীয় জান্তব-বৃত্তির পরিপোষক, আর্টের রাজ্যে তারা নিরুপাধিক—সেখানে তারা নির্ব্বিকল্প ভাবানুভূতির বাহক। যাকে সাধনতত্ত্বে বলে তুরীয়, আর্ট সেই তুরীয় মার্গের সোপান স্বরূপ। এই জন্যেই প্রাচীন রসশাস্ত্র ব্রহ্মানুভূতি ও রসানুভূতিকে দুই সহোদর বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন।)

এখনকার দিনে আর্টের এই আদর্শকে বাতিল করা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে যে এটা ধোঁকাবাজী। প্রত্যক্ষকে, বাস্তবকে, অতিপ্রাকৃত একটা ব্যঞ্জনা দিয়ে, তার সত্য রূপটিকে খর্ব্ব করা এবং সেই মন-গড়া মিথ্যাকে পরম ও চরম বলে প্রকাশ করা, অলস কল্পনা-বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা এখনকার মতে অবৈজ্ঞানিক এবং সেই জন্যেই অসমর্থনীয়।

এখনকার রসিকেরা বলেছেন (আমাদের সমস্ত অনুভূতির মূলই হচ্ছে ইন্দ্রিয়—বহির্জগতের সঙ্গে মনোজগতের বস্তু-দ্বন্দ্ব থেকেই আমাদের চেতনা সক্রিয় হয়। এই ক্রিয়াশীলতার কতকটা দেহগত চরিতার্থতা দিয়ে শেষ হয়, কতকটা বাইরে থেকে বাধা পেয়ে অন্তরে তরঙ্গিত হতে থাকে। অন্তরের এই যে তরঙ্গ, এ শুধু বাস্তবকে উপলক্ষ্য করেই সঞ্জাত নয়—বাস্তবকে কেন্দ্র করেই এর আবর্তন এবং এইজন্যেই এটা অতীন্দ্রিয়ও নয়, তুরীয়ও নয়।) যদি বাইরের সঙ্ঘাত থেকে যে ইন্দ্রিয়াসক্তির উদ্দীপনা এসেছিল, তা পূর্ণতার পথ পেতো, তাহলে হাতে হাতেই তার সঞ্চয় ফুরিয়ে যেতো এবং তা নিয়ে অপরোক্ষ চরিতার্থতার জন্যে ভাব-রাজ্যে নিষ্ফল মাথা-কোটার দরকার হতো না। কিন্তু ক'টা সচেষ্ট ইচ্ছাই বা আমাদের পূর্ণ হয়? মানুষের শক্তির একটা সীমা আছে, তারপর আছে সমাজ, রাষ্ট্র, নীতি—আরো অনেক কিছু, যা মুহূর্তে মুহূর্তে আমাদের বহুবিধ অভিপ্রায়ের মুখে লাগাম টেনে দিচ্ছে। এই ইচ্ছাগুলিকে মনে মনে উপভোগ

করা ছাড়া পথ নেই—এই মনো-রমণ তা বলে ব্রহ্মানুভূতির সগোত্রীয় নয় এবং বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন একটি নিরুপাধিক ভাব-ক্রিয়াও নয়। এর উৎপত্তি বাস্তব থেকে এবং স্থিতিও দেহেই সীমাবদ্ধ—সুতরাং এটা ব্যক্তিক। মানুষের আবয়বিক অস্তিত্বটা জড়, এবং তার মানসিক অস্তিত্বটা চিৎ-শক্তিসম্পন্ন—এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই মানুষ সজীব। এর একটিকে আর একটি থেকে পৃথক্ করে নেওয়া যায় না—একটি আছে বলেই অন্যটি আছে, এবং একটি যখন থাকবে না, অন্যটিও তখনি অন্তর্হিত হবে। অতএব মনের প্রসঙ্গে যা সত্য, দেহের প্রসঙ্গে তা মিথ্যা হতে পারে না—হওয়া সম্ভব নয় বলেই। কিন্তু কথা উঠবে, তাহলে কি কল্পনার কোন অবকাশ নেই? অবশ্যই আছে। কিন্তু সেটা বাস্তব-নিরপেক্ষ নয়, তাই তাকে যখন রূপায়িত করতে হবে, তখন তাকে বাস্তবাতীত ব্যঞ্জনা দেবার কোনই মানে হয়-না।

আগেই বলেছি, যেটা পাওয়া গেল, তার ত হিসাব-নিকাশ চুকেই গেল। যেটা হাতে এলো না, তাই রয়ে গেল মনে এবং তাই নিয়েই আর্ট অর্থাৎ আর্ট হচ্ছে, অবদমিত ইচ্ছাশক্তির স্ফূরণ। কিন্তু আর্ট তাই বলে আফিঙের নেশা নয়—রূপ থেকে অরূপে, ইচ্ছা থেকে ভাবে টেনে নিয়ে গিয়ে মানুষকে বৃথা ঠকানো হয় মাত্র। সুতরাং যা সত্য, যা প্রত্যক্ষ, যা প্রত্যাশিত, মানুষের মনোধর্ম্ম যখন তারই অনুগামী, তখন তাই হওয়া উচিত আর্টের লক্ষ্য এবং যে স্বপ্ন, যে কল্পনা, যে অনুভব প্রত্যক্ষের মাটিকে কেন্দ্র করে জন্মায়, তাকে নিরবলম্ব ঊর্দ্ধে নিরাশ্রয়ভাবে উড়িয়ে দিলে আর্টের কোন মূল্য থাকে না। অর্থাৎ আর্টের জন্যেই আর্ট নয়, জীবনের জন্যেই আর্ট—এবং তার মানে আর কিছু নয়, এই।

প্রাচীন ও আধুনিক রসশাস্ত্রের ভেতর নীতির দিক থেকে এই যে বিরোধ, এটা একদিনেই জন্মায়নি এবং কেতাবী মতে যেমন ফুটো

পর্য্যায়ের নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দেওয়া সহজ, কার্য্যতঃ দুয়ের এলাকা বাঁচিয়ে চলাও তত সহজ নয়। তবু মোটামুটিভাবে একটা হিসেব চলতে পারে।

যে শ্রেণীর সাহিত্যকে ইদানীং কালে বস্তু-অনুগামী বলা হয়ে থাকে, তার স্বরূপ আলোচনা করলে প্রথমেই যে জিনিষটা চোখে পড়ে, তা হচ্ছে দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন। যে সমস্ত বিষয় একসময় শিল্পসৃষ্টির পক্ষে অনভিজাত বলে মনে করা হতো, এখনকার দিনে সেগুলোকে শুধু স্বীকার করেই নেওয়া হয়নি—তাদের রীতিমতো মর্য্যাদা দিয়েই গ্রহণ করা হয়েছে। আগেকার দিনে সমাজ-জীবনের গোড়ার পর্ব্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের নিয়েই সাহিত্য হতো—যা সুন্দর, যা মহান্, যা মনোজ্ঞ, তার ওপরই দেখা যেতো শিল্পীদের ঝোঁক। এখনকার দিনে সমাজের নিম্নতন স্তরের যারা, তারা সবেগে সাহিত্যে এসে ভীড় করেছে—যা কুশ্রী, কদর্য্য, যা উপেক্ষিত, সেগুলো জড়ো হয়েছে রসশিল্পের আসরে। আধুনিকেরা বলছেন, এই দিকটাই হচ্ছে সত্যিকার দিক এবং এদিকে নজর না করায়, প্রাচীনদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অবাস্তব, এবং সেই জন্যেই অসত্য।

কিন্তু সত্য ও অসত্যের স্বরূপ নিয়ে বিচার করলে, কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়ত খুব সহজ নয়। জগতে শুধু পঙ্কটাই সত্যি, আর পঙ্কজটা কি মিথ্যা? ব্যথিত, পতিত, উপেক্ষিতরাই একমাত্র সত্যি, আর ধনী, সম্পন্ন, সৌভাগ্যশালীরা কি মিথ্যা? ভালো ও মন্দ দুই চরমপ্রান্তের সমাবেশেই জগৎ এবং এর একটা দিক যতটা সত্যি, আর একটা দিক ততটা না হক, অনেকটা সত্যি। সুতরাং সত্যই যদি একমাত্র মাপকাঠি হয়, তাহলে প্রাচীন এবং আধুনিক, উভয় আদর্শই খণ্ডভাবে সত্য—বাস্তব সত্যকে প্রাচীনেরা কল্পনার ভেজালে আবৃত করে রাখতেন এবং আধুনিকেরা বাম-মার্গীয় প্রপ্যাগাণ্ডায় ধূমায়িত করে রাখছেন। আসল

সত্য যা, নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধিক, নিছক সত্য—তা ওঁরা বা এঁরা, কেউই অবলম্বন করেন নি। প্রাচীনেরা কল্পনার দোহাই দিয়ে সুন্দরকে একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন, অসুন্দরটা তাঁদের বিচারে ছিল অসৎ। আর আধুনিকেরা এর পাল্টায় অসুন্দরকেই দিয়েছেন ষোল-আনা স্বীকৃতি এবং বলেছেন এটাই সত্যি। এই দৃষ্টি-বিরোধের ফলেই প্রাচীনদের ভাব-বিলাস আধুনিকদের তথাকথিত বাস্তববাদে পর্য্যবসিত হয়েছে।

এ যুগের রাজনীতি ও সংস্কৃতি মানুষকে যে চিন্তা-বিপ্লবের মধ্যে টেনে এনেছে, যন্ত্রবিজ্ঞানের সবিশেষ উন্নতি সেই বিপ্লবকে যে-পরিমাণ পোষকতা করেছে, এবং সর্ব্বোপরি রুশীয় সমাজতন্ত্রবাদের ব্যাপক বিস্তার এই বিপ্লবকে যতটা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনীয়তার সুযোগ দিয়েছে, তাতে সাহিত্যাদর্শেও ওলট-পালট অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ঘটে গেছে। এই ভাব-বিপর্য্যয়কে মোটা কথায় বাস্তবতা আন্দোলন নাম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে হলে বলা দরকার যে বাস্তবতা সংজ্ঞাটা আধুনিক আন্দোলনকে ষোল-আনা বুঝতে সহায়তা করে না।

যা এতদিন অনভিজাত বলে উপেক্ষিত ছিল, তাকে গ্রহণীয় করে তোলাতেই যে বাস্তবতার যথেষ্ট মর্য্যাদা স্বীকৃত হয়েছে, তা নয়। বরং নূতন দৃষ্টি ও ভাবাদর্শ প্রবর্ত্তনের উন্মাদনায় আধুনিকেরাও বাস্তব থেকে ঠিক ততখানিই দূরে গিয়ে পড়ছেন, যতখানি দূরে ছিলেন প্রাচীনেরা রসাত্মকতার নাম নিয়ে। আজকের সাহিত্যে মানুষের স্বাভাবিক জীবনে সচরাচর প্রত্যাশিত নয় যে-সমস্ত জিনিষ, তার যে বিশেষ আধিক্য হয়েছে, সে-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। শুধু যে ব্যথিত-পতিতের জীবনাধিকার প্রতিষ্ঠিত করাই এ যুগের সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন নয়, এ কথাও তর্কাতীত। মনোবিজ্ঞানের আধুনিকতম পরিণতির একটা ধারা ইদানীং আমাদেরকে অবচেতন-লোকের অভিমুখে আকর্ষণ

করেছে—সেই অদৃশ্য লোকের অসংবিন্যস্ত ইচ্ছাপুঞ্জকে চিত্রে এবং কাব্যে রূপ দেবার মুখে যে-শ্রেণীর আর্ট জন্ম নিচ্ছে, তা যে বাস্তব নয় এবং পুরাতন কল্পনাবাদেরই আর এক পিঠ, এ কথা প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন। ঠিক তেমনি, নব্য প্রজ্ঞাবাদের তাড়নায় মানুষকে পরস্পর-বিরোধী আইডিয়ার বাহন রূপে দাঁড় করিয়ে, তাদের ব্যক্তি-জীবনের সমস্ত দ্বন্দ্বকে আইডিয়ার সঙ্গে আইডিয়ার দ্বন্দ্বে পরিণত করার দ্বারা যে নৈর্ব্যক্তিক সাহিত্য সৃষ্টি চলছে, তার সঙ্গেও বাস্তবের কোন যোগ নেই।

(সমাজতন্ত্রবাদের প্রেরণায় বামপন্থী সাহিত্য নামে যে-শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে, তা অবশ্য বাস্তবানুগামী। কিন্তু ফ্রয়েড, আইনষ্টাইন, প্যাভলভ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার প্রভাবে যে সাহিত্য জন্ম নিচ্ছে, তা আগাগোড়াই বস্তু-নিরপেক্ষ এবং সেইজন্যেই প্রচলিত হিসাবে সত্য-বিরোধী। এই দুটি বিরুদ্ধ আদর্শই সমান শক্তিতে আজকের সাহিত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে চলেছে। এর ভেতর, প্রথমের গতি জনতার দিকে, আর দ্বিতীয়ের গতি মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবিদের দিকে—কিন্তু বুদ্ধিজীবি ও বৃত্তিজীবি, ক্লাস ও ম্যাস, দুই নিয়েই সমাজ এবং সাহিত্য সমগ্রভাবে সমাজেরই প্রতিরূপ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাস্তবতার চেয়ে ঢের বিস্তৃত পটভূমিতেই আজকের সাহিত্যের প্রাণবস্তু নিবদ্ধ।)

বলা বাহুল্য, ভালো-মন্দের কথা আমি তুলিনি। যুগধর্ম্মে স্বভাবতঃই সাহিত্যে পরিবর্ত্তন এসেছে, এবং সে-পরিবর্ত্তন, নানা কার্য্য-কারণ প্রভাবেই অত্যন্ত জটিল ও যৌগিক হয়ে উঠেছে। এরই খুব বড় একটা দিক হচ্ছে, তথাকথিত বাস্তবতাবাদ—যার স্বরূপ নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি।

[২] সাহিত্য ও গণসাহিত্য

গত মহাযুদ্ধের হট্টগোল থেমে যাবাব পর পৃথিবীর চিন্তা-রাজ্যে কয়েকটা স্পষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা দিলে। পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব এবং সমাজতন্ত্রবাদেব ব্যাপক বিস্তাবে দুনিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায ভাঙন ধবলো, দীর্ঘদিন প্রচলিত যে নীতি ও বিধিকে আশ্রয় করে মানুষের সভ্যতা এগিয়ে এসেছে, তার পেছনে যে একটা মস্ত বড ফাঁকি লুকিয়ে আছে, এটা এর আগে এমন করে আর জানা যায় নি। এই ফাঁকিটা যেদিন ধরা পডলো, সেদিন মানুষ বুঝলো, পৃথিবীর সমাজ বলো, সংস্কৃতি বলো, ধর্ম্ম বলো, আর শিল্প-বাণিজ্যই বলো, সবকিছুই দাঁডিয়ে আছে মুষ্টিমেয পুঁজিবাদীর সুবিধার জন্যে—আর লক্ষ-লক্ষ মূক জনসাধারণ উদযাস্ত পরিশ্রম করে, নিজের রক্ত-জল-করা পযসা দিযে তাদের সেই অব্যাহত সুবিধার পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে। তাদেব এই অজ্ঞতা ও অসহায়তার সুযোগেই ওদেব সুখ ও সৌভাগ্যের কারবার।

বিশ্বের জনগণকে এর পর থেকে দুটো মোটা ভাগে ভাগ করা হতে লাগলো—যাদের আছে, আর যাদের নেই। যাদের আছে, সংখ্যায তারা সামান্য হলেও দুনিয়ার অর্থ-ভাণ্ডার তাদেরই হাতে—তাই খাটিয়ে তারা কল-কারখানা, [illegible]-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য ফাঁদছে। যাদের নেই অর্থ, পৌরুষের দায়ে এই সব জায়গায় মেহনৎ করছে, তাদের দেহের শক্তি আর মনের একাগ্রতা দিয়ে ওরাই সব কারবারে সোনা ফলাচ্ছে, তার বিনিময়ে মুষ্টিভিক্ষা স্বরূপ পাচ্ছে কিছু-কিছু বেতন—আসল লভ্যাংশঃ যা, তা গিয়ে জমা হচ্ছে মালিকদের

তহবিলে, দরিদ্রের সঙ্গে তার কোনই সংস্রব নেই। এই কৃচ্ছ্রলব্ধ যৎসামান্য আয়ে তাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটে না, তারা লেখাপড়া শিখতে পারে না, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরাম-আয়েস পায় না, পশুর মতো ক্ষুন্নিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করেই তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধনীদের সৌভাগ্যের ইমারত গড়ে চলেছে। মুষ্টিমেয় ক্ষমতাপন্নের তহবিলে সঞ্চিত কোটি-কোটি টাকা দুনিয়ার বাজারে ঝিক্‌মিক্ করছে, তার বাইরের জৌলুষ সংখ্যাতীত দরিদ্রকে উদ্‌ভ্রান্ত করছে এবং তাদের যথাসাধ্য খাটিয়ে নিয়ে পুঁজিবাদীদের পেট ভরাচ্ছে। তারা ন্যূনতম পরিশ্রমকে প্রচুরতম উৎপাদন করিয়ে মোটা-মোটা অঙ্ক ব্যাঙ্কের খাতায় তুলছে—ব্যবহারিক জীবনের যা-কিছু সম্পদ, বিজ্ঞানের যা-কিছু অবদান, সবই তাদের জন্যে। কৃষক হক, কুলী হক, আর কেরানী-কর্ম্মচারীই হক, সবাই হল এই পুঁজিবাদীদের সৌভাগ্যসাধনের যন্ত্র—এদের নিজস্বভাবে বাঁচার কোন অধিকারই নেই।

বলাবাহুল্য, এই বিভেদ একদিনের সৃষ্টি নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই জিনিষ চলে আসছে, কিন্তু মানুষ কোনদিনই মানুষের এই অসহায়তা, এই বাধ্যতামূলক আত্মঅপচয়কে সোজা দিক থেকে ধরতে পারেনি। চিরদিন শুনে এসেছে তারা, যে কর্ম্ম অনুসারে জন্ম এবং জন্মগত দুর্ভাগ্য অনতিক্রমনীয়। তাই রাজা, গুরু-পুরোহিত, মালিক-মহাজন—এক কথায় পুঁজিবাদের সহায়ক সব রকম প্রতিনিধিকেই তারা অক্ষুন্ন গৌরবে আপনার ওপর প্রভুত্ব করতে দিয়েছে। এই আত্মসমর্পণের ওপরই গড়ে উঠেছে বিশ্বের তথাকথিত সভ্যতার ইতিহাস, যাতে গরীবের কোন স্থান নেই। ইতিহাসে স্থান হয়েছে শাজাহানের, যে দরিদ্রকে বুকের পাঁজর খসিয়ে তাজমহল বানাতে বাধ্য করেছিল! পৃথিবীর সভ্যতার কাহিনী তাজমহলের

মহিমান্বিত সুষমায় ঝলমল করেছে, কিন্তু এর পেছনে কত নিরন্নের অশ্রু, কত উৎপীড়িতের দীর্ঘশ্বাস, আর কত অভাগ্যের আত্মদান সঞ্চিত, সে-কথার কোন সাক্ষী নেই! এমনিধারা সব ব্যাপারেই।

বিংশ শতাব্দীতেই মানুষ প্রথম টের পেলো যে মানুষে-মানুষে এই বৈষম্যের মূলে কোন অনির্ব্বচনীয় দৈবী-শক্তির হাত নেই—এ হল মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীর বুজরুকির ফল। তারা মানুষকে শাসন এবং শোষণ করবার কৌশলেই দিয়েছে প্রাকৃব্যবস্থিত দৈব-শক্তির দোহাই। বলেছে, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, জীবিকার্জ্জন, শিল্পচর্চ্চা, শিক্ষা, কোন বিষয়েই তুমি পাবে না আত্মস্বতন্ত্র পথে চলবার অধিকার—তোমাকে ডাকতেই হবে গুরুকে, পুরোহিতকে, রাজাকে, জমিদারকে, মালিক-মহাজন, কুলপতি, সমাজপতিকে। তাদের আদেশ-নির্দ্দেশ পালন করতে হবে, তাদের করতলগত শাস্ত্র, শস্ত্র এবং সঞ্চয়কে শ্রদ্ধা দিতেই হবে। দুর্ব্বল, অশক্ত, অনভিজ্ঞ জনগণ নতশিরে বলেছে তথাস্তু, আর তার ফলে তথাকথিত সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং ধর্ম্ম-ব্যবস্থা পরস্পরের অনুপূরক রূপে পৃথিবীতে শাখাপল্লবে ছড়িয়ে পড়ে পুঁজিবাদকে পুষ্ট করেছে এবং কৌশলী ভাগ্যান্বেষীদের করেছে কল্যাণ-সাধন, আর সাধারণকে করেছে সর্ব্বহারা।

বিংশ শতাব্দীতে মানুষ যেদিন এই পরম সত্যটি আনুপূর্ব্বিক বুঝতে পারলো, সেদিন সে চীৎকার করে বললো, সমাজ ভাঙো, রাষ্ট্র বদলাও, ধর্ম্ম ওঠাও, মানুষকে দাও মানুষের অধিকার—মজুরে-মজুরে, বড়োতে-ছোটতে, এই বৈষম্য—একের প্রয়োজনাতিরিক্ত লাভ, অন্যের ন্যূনতম প্রয়োজনেও অসঙ্গতি, এ চলবে না—পুঁজিবাদীদের ভাঁড়ার থেকে দুনিয়ার সঞ্চিত টাকা প্রকাশ্য দিবালোকে টেনে বা'র করো, অকৃপণ দু'হাতে চারিদিকে ছড়িয়ে দাও—ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-

কারবার, শিক্ষা-সংস্কৃতি সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বজনের মধ্যে সমান অধিকার বণ্টন করে দাও। কেউ ইহলোকের, কেউ পরলোকের কাণ্ডারী সেজে এতকাল মানুষকে যেভাবে যূপবদ্ধ পশুর মতো চালিয়েছে, তার প্রতীকার চাই। এই চেতনার ফলেই রাশিয়ায় প্রথম দেখা দিল সমাজতন্ত্রবাদ—যা প্রথমেই বিলোপ করলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির, এবং দেশের সমস্ত অর্থ, সমস্ত কাজ-কারবার নিয়ে এলো রাষ্ট্রের আয়ত্তে, তারপর তাড়ালো ধর্ম্মকে। ছোট ও বড়, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, সকলকেই থাকতে হবে রাষ্ট্রের অধীনে, খাটতে হবে রাষ্ট্রের হয়ে, তার বিনিময়ে রাষ্ট্রই দেবে প্রয়োজনানুরূপ আহার্য্য, পরিধেয়, আমোদ-প্রমোদ, আর সবই। কেউ কারুর মালিক নয়, মহাজন নয়, কারুকে কারুর আদেশ-নির্দ্দেশ, অনুরাগ-বিরাগের মুখ চেয়ে বাঁচতে হবে না —ক্রিয়া-কর্ম্ম-বিবাহ প্রভৃতি পারিবারিক ব্যাপারে প্রত্যেকেই ভোগ করবে অব্যাহত স্বাধীনতা, কোথাও গুরু-পুরোহিত বা শাস্ত্রকার তার পেছনে শাসনদণ্ড উঁচিয়ে থাকবে না। অর্থাৎ দারিদ্র্য নামক বস্তুকে তারা পৃথিবীর ইতিহাস থেকেই বিতাড়িত করতে চাইলো। সেই সঙ্গে চাইলো তারই আনুষঙ্গিক আর যা-কিছু কুব্যবস্থাকে।

কার্য্যতঃ সম্ভব হক, আর না হক, এই মত বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে একটি ভাব-বিপর্য্যয় এনেছে। সমাজতন্ত্রবাদের বিস্তার এবং সাফল্য ভিন্ন যে পৃথিবীতে কোনদিনই ভারসাম্য আসবে না, মুষ্টিমেয় বিত্তশালী যতদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখবে এবং দরিদ্রেরা তাদের দরজায় করবে দাসত্ব, ততদিন পৃথিবীতে কিছুতেই যে শান্তি আসবে না, একথা আজ সবাই বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসকে সমাজতন্ত্রবাদই অবশ্য দিয়েছে প্রথম প্রবর্ত্তনা, কিন্তু পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব, ধর্ম্ম, সমাজ, শিল্প, সংস্কৃতির মূলতত্ত্বগুলি নিয়ে বিশ্লেষণ করে,

তাদের পেছনে জড়ের কার্য্য-কারণ সম্পর্ক উদ্‌ঘাটিত করে না দেখালে এবং যন্ত্রবিজ্ঞান প্রাকৃতিক শক্তির অলঙ্ঘ্যতার উপর মানুষের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না করলে, এই বিশ্বাস কখনই দানা বাঁধতে পারতো না। এই ত্রি-মুখী ভাব-বিপ্লব একই সঙ্গে দেখা দিয়েছে, এ-যুগের এই সব চেয়ে বড় গৌরব।

এ-যুগের সাহিত্য এই বিপ্লব থেকেই প্রাণ-প্রেরণা আহরণ করেছে, তাই আজকের সাহিত্যেও সব দিকেই ভাঙনের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতকাল যে সমস্ত বাঁধা-বরাদ্দ আদর্শ অনুসরণ করে সাহিত্য-সৃষ্টি হয়েছে, আজ তা বর্জ্জন করা হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য ও বাস্তবতা' প্রবন্ধে আমি নবযুগের সেই সাহিত্যাদর্শের এক দিক নিয়ে আলোচনা করেছি, সুতরাং সে-প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করবো না। এই প্রবন্ধে তারই আনুষঙ্গিক রূপে আর একটি নতুন দিক যা এসেছে সাহিত্যে, সে-সম্বন্ধেই দু'একটি কথা বলার চেষ্টা করবো।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের সুদীর্ঘ ভূমিকা যাঁরা ধৈর্য্য ধরে পড়েছেন, তাঁদের কাছে গণসাহিত্য বলতে কি বোঝায়, তা আর সম্ভবতঃ ব্যাখ্যা করে বোঝাবার আবশ্যকতা নেই এবং এই পর্য্যায়ের সাহিত্য কি চায়, তাও তাঁরা অনেকটা উপলব্ধি করেছেন বলেই আমার বিশ্বাস। বিশ্বের সাহিত্য চিরদিন শুধু সম্পন্নের জয়গান করে এসেছে—রাজা রূপে, বীর রূপে, সন্ন্যাসী রূপে যারা সহস্র চক্ষুর সাম্নে উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে ফুটে উঠেছে, তাদের সুখ-দুঃখের, আশা-আকাঙ্ক্ষার গুণগানেই পৃথিবীর সাহিত্য ভরপুর থেকেছে। তাদের মিলন-বিরহ, তাদের সফলতা-ব্যর্থতা, তাদের ক্ষমতা-অক্ষমতাকেই কবিরা সাহিত্যিকরা নব নব রূপে চিত্রিত করেছেন। দীন দুঃখী অসহায় অশক্তেরা পর্য্যন্ত অনশনে অর্দ্ধাশনে থেকে সেই বিলাস-লালিত ব্যসন-পুষ্ট সৌভাগ্যবানদের দুঃখেই কেঁদেছে, আনন্দে উল্লসিত হয়েছে। তাদের

দুরধিগম্য উচ্চতার সাম্নে দাঁড় করিয়ে, অকৃতার্থ হতভাগ্য রূপেই নিজে-দেরকে ধিক্কার দিয়েছে এবং তাদেরকে লোকাবতার জ্ঞানে পূজা করেছে। ব্যবহারিক জীবনে তারা যেমন সকল ক্ষেত্রেই মেনেছে পুঁজিবাদীদের কর্ত্তৃত্ব, ভাব-জীবনেও তেমনি পুঁজিবাদীদের প্রাধান্যই করেছে তাদের অভিভূত—বরং চিন্তার দিক থেকে, কল্পনার দিক থেকে, আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুরাগ ও স্বপ্নের দিক থেকে পুঁজিবাদের মহিমার মোহ তাদেরকে এমনি প্রবলভাবেই আক্রমণ করেছে যে বাস্তবের পুঁজিবাদেও তারা দোষের কিছু দেখতে পায় নি। রাজা রামকে যারা জেনেছে ভগবান বলে, তাদের কাছে রাজার আসন পূজার্হ রূপেই সম্মান পেয়েছে—তা সে-রাজা যতই কেন না অত্যাচারী হক। দরিদ্র বিদুরকে পোষা কুকুর করে আঁকা হয়েছে, তাতে কোন দরিদ্রই রাগ করেনি, তার কারণ এ-হেন ভিখারী বিদুরকে রাজা ও রাজনির্ম্মাতা কৃষ্ণ অনুগ্রহ করতেন, তার ক্ষুদ এক মুঠো করে নাকি খেয়েছিলেন! বিদুরের ভাগ্য নিয়ে বরং অশ্রুপাতই করতে দেখা গেছে বরাবর।

সাহিত্যের ভেতর দিয়ে শ্রেণীস্বার্থকে এমন কৌশলেই উপস্থিত করা হয়েছে যে গরীবেরা তা ধরতে পারেনি। এমন কি নিজেদের শোচনীয় অবমাননাতেও তারা সঙ্গতিরই পরিচয় পেয়েছে। দরিদ্রকে দাস রূপে, আশ্রিত রূপে, ভাঁড় রূপে সাহিত্যের আসরে যেটুকু স্থান দেওয়া হয়েছে, সেখানেই তারা কুণ্ঠিত সঙ্কোচে নিঃশব্দে থেকেছে এবং যারা পড়েছে, তারাও তাতে অন্যায় কিছুই দেখতে পায় নি। প্রাচীন যুগে, মধ্য যুগে, এমন কি আধুনিক যুগেও একই অবস্থা চলে এসেছে। অথচ মজা এই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখকেরা নিজে ছিলেন দরিদ্র, তা সত্বেও দরিদ্রের সম্ভ্রমকে তাঁরা কোনদিনই স্বীকার করে নেন নি।

কারণটা সহজেই অনুমেয়। দারিদ্র্যকে একটা গ্লানি ও অপমানের বিষয় বলেই মনে করা হতো, ধনীদের সুখ-সমৃদ্ধি, আরাম-আয়েসের দিকে সলোভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এবং নিজের বাস্তব অবস্থাকে সর্ব্ব-দৃষ্টির অন্তরালে গোপন রাখাই ছিল সেই জন্যে একমাত্র পন্থা। অর্থাৎ ভাবটা এই ছিল যে আমরা রামা-শ্যামারা মানুষই নই, আমাদের দুঃখ-কষ্ট ব্যথা-বেদনার আবার দাম কি? মানুষ তারাই, যারা জন্মেছে রূপোর ঝিনুক মুখে নিয়ে, যারা শোয় সোনার খাটে, পা রাখে রূপোর খাটে, যাদের অঙ্গুলী নির্দ্দেশে আমাদের মতো কোটি-কোটি হতভাগা কুকুরের মতো ছুটে আসে—তারা যদি ভালবাসে, তবে সেই হল ভালবাসা, তারা যদি কাঁদে তবে সেই হল কান্না, তারা যদি কষ্ট পায়, তবে সেই হল কষ্ট···সুতরাং তাদের নিয়েই হবে সাহিত্য, শিল্প-যুগ যুগ ধরে মানুষ শুধু গাইবে তাদেরই গান। আর আমরা? আমরা কোন্ লজ্জায় পৃথিবীর সাম্নে তুলে ধরবো নিজেদের? এই ভ্রান্ত জীবন-বেদের প্রভাবেই লেখকেরা দরিদ্র হয়েও, দারিদ্র্যকে গোপন করেছেন, অপমানিত হয়েও অপমানকে গায়ে মাখেননি, ধনিকের বণিকের মহাজনের মালিকের রাজার ঋষির গুণগান করে পরোক্ষভাবে শ্রেণী-স্বার্থকেই পুষ্ট করে গেছেন এবং গণ-সাধারণের গলার ওপর দিয়ে চালিত পুঁজিবাদের রাজরথে এই ভাবে করেছেন সারথিত্ব। তা সে কি বাল্মীকি বেদব্যাস কালিদাস ভবভূতি, আর কি হোমর ভার্জ্জিল সেক্সপীয়ার মিলটন!

ফরাসী বিপ্লবে যেদিন ক্ষিপ্ত গণসাধারণ রাজা, সামন্ত ও পাত্র-মিত্রকে নির্ব্বিচারে হত্যা করে সমানাধিকার দাবী করেছিল, সেদিনই ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম টের পাওয়া গিয়েছিল, দরিদ্রের একটা নিজস্ব অস্তিত্ব আছে এবং তা উপেক্ষণীয় নয়। তারপর যে-সাহিত্য জন্মেছিল, ফ্রান্সের দোদে, জোলা, হুগো, ব্যালজাক, মোপাসাঁয় বা

ইংল্যাণ্ডের ডিকেন্স, থ্যাকারে, হার্ডি, মেরিডিথে, তাতে পুঁজিবাদীদের জায়গায় এসেছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, যারা পুঁজিবাদীদেরই এজেণ্ট, বুদ্ধি-জীবিতার দ্বারা পরোক্ষভাবে যারা শ্রেণী-স্বার্থকে করছে পালন এবং পোষণ।) মন্দের ভালো! এর পর থেকে গরীব আর সাহিত্যে যোগানদার হয়ে আসে না, আসে পাত্র-পাত্রী হয়েই এবং তার সুখ দুঃখের চেহারাটাও আমরা দেখতে পাই পূর্ণতর রূপে—যদিও সে রূপের ভেতর একটা অনুকম্পা, একটা 'আহা বাছারে' ভাব কিছুতেই গোপন থাকে না! (তারপর রুশ-বিপ্লবের পর এলো গণসাহিত্য—যা মধ্যবিত্তের মতো অনির্ভরযোগ্য সম্প্রদায়কেও উচ্ছেদ করে তার স্থানে বসালো সর্ব্বহারাদের—কুলী, মজুর, কৃষক থেকে সুরু করে, চোর, ডাকাত, খুনী, জালিয়াত, বেশ্যা, ঝি, মেথরাণী পর্য্যন্ত, এক কথায় যারা গণসাধারণ, তাদেরকে দিলে সাহিত্য-মন্দিরের দরজা খুলে। তারা হুড়মুড় করে এসে ঢুকলো এবং বলিষ্ঠ বাহুর আঘাতে বাবুভায়া উকিল মোক্তার ডাক্তার, এক কথায় তথাকথিত ভদ্রসমাজের সংরক্ষিত স্বার্থের ব্যূহ ভেঙে চুরমার করে তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করলো নিজেদেরকে। এই ভদ্র সমাজ ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাড়িয়েছিল রাজতন্ত্র ঘেঁষা লোকদের—বিংশ শতাব্দীতে গণসাধারণ আবার তাড়ালো এদের। গোর্কি, কুপ্রিন প্রভৃতি করলেন সেই মহৎ কার্য্য।)

আমরা আগেই দেখিয়েছি যে তথাকথিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়টা কি জন্যে অনির্ভরযোগ্য। এরা সুযোগ পেলে কয়েক ধাপ এগিয়ে অভিজাত হয়, আবার সুযোগ না পেলে পেছু হঠতে হঠতে গণসাধারণের মধ্যে নেমে আসে। অর্থাৎ এটা একটা মধ্যাবস্থা, যা সর্ব্বদা অনিশ্চিত। অন্য দেশের চেয়ে আমাদের দেশে এই সম্প্রদায়ের পরিমাণ বোধহয় সব চেয়ে বেশী। কোম্পানীর রাজ্যশাসন চালাবার

প্রয়োজনে গণসাধারণের মাঝখান থেকে যাদের টেনে আনা হয়েছিল তথাকথিত উচ্চশিক্ষা এবং চাকরির ফাঁদ পেতে, তাদের সন্তান-সন্ততিরাই আজ ডালে-পল্লবে ছড়িয়ে পড়ে এদেশের ভদ্র সমাজ নামে অভিহিত হয়েছে। এরা চাকুরিজীবি, এবং সেই জন্যেই ক্যাপিট্যালিষ্টদের এজেণ্ট—অথচ এরা গরীব। কিন্তু গরীব হলেও এরা গণসাধারণ থেকে অনেক তফাতে অবস্থিত। এদের দৃষ্টি নিবদ্ধ অভিজাত সমাজের দিকেই, এদের সাধনাও সেই স্তরে উন্নীত হবার জন্যেই। এরাই এদেশের সাহিত্যিক, তাই এদেশের সাহিত্যে তথাকথিত মধ্যবিত্তেরই আসন আজো কায়েমি রয়েছে।

সমাজতন্ত্রবাদ সব দেশের মতোই এ দেশের চিন্তাতেও সংক্রামিত হয়েছে, তার ফলে সাহিত্যে তার পদসঞ্চারও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা বাংলা সাহিত্যের পক্ষে সুলক্ষণ। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে কালকেতু ব্যাধ ও তার পত্নী দরিদ্র ফুল্লরার এবং ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে কালুডোমের কাহিনী স্থান পেয়েছে—ময়মনসিংহ গীতিকাতেও আছে বেদে, বাগ্দী, ডোম, চাঁড়ালের অনেক কাহিনী—কিন্তু বর্ণাশ্রমের আঁটুনি এবং শ্রেণী-স্বার্থের জুলুমবাজীই নিয়েছে সর্ব্বক্ষেত্রে সিংহভাগ। অজ্ঞাতসারে অন্ত্যজরা যেখানে এসে পড়েছে, সেখানে পদাঘাত খায়নি ঠিকই, কিন্তু তারা দেশের জন-মনে কোন স্থায়ী দাগও কাটেনি। মাণিকচাঁদ, গোপীচাঁদ, লাউ সেন, কর্পূর সেন, চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর, গোরক্ষনাথ, মীননাথ, চৌরঙ্গী নাথের জয়ধ্বনিতেই বাংলা দেশ মুখরিত হয়েছে—কালকেতু ব্যাধ, হামরু সর্দ্দার, কালু ডোম পূজা-মণ্ডপের বাইরে করজোড়েই দাঁড়িয়ে থেকেছে, তাদের সসম্মানে কেউ ভেতর বাড়ীতে ডেকে আনে নি। তারা নিজেরাও আসতে সাহস করে নি।

(প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির কোনই সম্বন্ধ ছিল না—ব্যক্তি সাধারণ ছিল আপন আপন পল্লীভবনে বহু দুঃখ-দারিদ্র্যের ভেতর নানা ভয় ও নানা আপদ বিপদকে বুকে আঁকড়ে। বাইরে মুসলীম শাসনের বহু অত্যাচার গেছে তাদের মাথার ওপর দিয়ে, ভেতরে বর্ণাশ্রমের শাসনও কম অত্যাচার করেনি—কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধভাবে গণ-জাগরণ কোনদিনই হয়নি এদেশে, এক কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ ছাড়া। তাই এদেশের প্রাচীন সাহিত্যে গণসাধারণের কোন সত্যকার রূপই পাওয়া যায় না। অবশ্য তা পাওয়া যায় না (মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাহিত্যেও, যদিও সেখানে ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কটা ছিল অনেক ঘনিষ্ঠ। সেখানে Knights, Baronsরাই আড়াল করে রয়েছে সাধারণ মানুষকে—আমাদের সাহিত্যে যে জায়গায় রয়েছে অর্দ্ধপৌরাণিক দেব-দেবীরা।)

ইংরেজী আমলে বঙ্কিম, মাইকেল এবং রবীন্দ্রনাথ—তিন জন শ্রেষ্ঠ লেখকের হাত দিয়ে বাংলার আধুনিক সাহিত্য গড়ে উঠলো। কিন্তু নীলদর্পণ রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র ছাড়া আর কেউই গণসাধারণের দিকে তাকালেন না—বঙ্কিম ও মাইকেল রইলেন আদর্শ নিয়ে মেতে এবং রবীন্দ্রনাথ রইলেন ভাবতন্ত্রে নিমগ্ন। মিল্টন, স্কট, শেলী প্রমুখ শ্রেণী-সাহিত্যিকের প্রভাব এজন্যে দায়ী, এজন্যে দায়ী হিন্দু কলেজের ভেতর দিয়ে প্রচারিত সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী জাতির শিক্ষাদান প্রণালী! তারপর এলেন শরৎচন্দ্র—যিনি তথাকথিত উচ্চ শিক্ষা পাননি, তথাকথিত অভিজাত সমাজেও জন্মান নি—জন্মেছিলেন নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরে এবং সেই পারিপার্শ্বিকেই মানুষ হয়েছিলেন, তাই প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, গণসাধারণকে তিনি চিনেছিলেন—সাপুড়ে, চাষী, জোলা, লাঠিয়াল, বাগ্দী, ডোম, ঝি, চাকর, বেশ্যা…গণসাধারণের অনেক পর্য্যায়কে বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম আমদানী করলেন। তাঁর পর শৈলজানন্দ

মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ আধুনিক সাহিত্যিকেরা আরো কিছুদূর এগিয়েছেন। কিন্তু সত্যিকার গণসাহিত্য বাংলায় আজো লেখা হয়নি।

তার একটা কারণ অবশ্য এই যে এদেশের সাহিত্যিকেরা সবাই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে—যাঁদের জীবিকা চাকুরি এবং সেই কারণেই শিক্ষা-দীক্ষা এবং চিন্তা-চেষ্টায় এঁরা গণসাধারণ থেকে তফাৎ। সাহিত্যে তাদেরকে মর্য্যাদার আসন দিতে হলে তাদের সঙ্গে যে পরিমাণ প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকা দরকার, তা এঁদের নেই। কাজেই এঁরা দূর থেকে সহানুভূতির তাগিদে কল্পনার সাহায্যে যা লেখেন, তার ভেতর প্রচ্ছন্নভাবে থেকে যায় তথাকথিত শ্রেণীস্বার্থেরই থিঁচ—যেমন অভিজাত সমাজ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা না নিয়েই যা লেখেন, তার ভেতর থেকে যায় স্বল্পবিত্ত গৃহস্থ সমাজের ছাপ! অর্থাৎ দেশের সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অটুট থাকতে সত্যিকার গণসাহিত্য হওয়াই সম্ভব নয়। তবে মধ্যবিত্ত সমাজে অবিবাহ, বেকার দশা, প্রত্যক্ষ সংস্রবহীন শিক্ষা, নানা আপদ যে-রকম ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই সঞ্চারিত হচ্ছে, তাতে রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা এরকম আর বেশীদিন থাকবে না—তথাকথিত মধ্যবিত্ত সমাজ ভেঙে গিয়ে গণসাধারণের মধ্যেই মিশে যাবে। তখন দেশে দেখা দেবে দুটো সম্প্রদায়, যাদের আছে, আর যাদের নেই—এই দুই দলে সেদিন বাধবে প্রচণ্ড সংঘর্ষ, মাঝখানকার এই স্তরটি বজায় থাকাতে, যা এখনো সম্ভবপর হচ্ছে না। এই সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ জীবনে যেদিন আসবে, সেই দিনই সত্যিকার গণসাহিত্য লেখা হবে, এবং তা লিখবে গণসাধারণই।

আজকে নকল গণসাহিত্যের নামে যে হট্টগোল হচ্ছে, তার উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু তার অনেকটুকুই জাল। জীবন থেকে উৎসারিত নয় বলেই তা জীবন্ত হতে পারছে না, যা পেরেছে রাশিয়ায়।

[৩] গণসাহিত্য ও আধুনিক লেখক

ইদানীং আমাদের দেশে গণসাহিত্য সৃষ্টি নিয়ে বেশ একটু আন্দোলন হতে আরম্ভ হয়েছে। সমানাধিকারের ভিত্তিতে ধনবণ্টন ও শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের পরিকল্পনা এই আন্দোলনের পেছনে আছে—তার একটা দিক হল, পুরানো ধনিক প্রথা ও তার আনুষঙ্গিক সমাজ-বিধানকে ভাঙা, আর একটা দিক হল, নূতন দায়িত্বশীল গণ-সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করার আবহাওয়া সৃষ্টি। অর্থাৎ একই সঙ্গে এ একটা বৈপ্লবিক ও গঠনাত্মক আন্দোলন এবং এ আন্দোলন এসেছে রাশিয়া থেকে।

বাংলা দেশের সমাজ-জীবনে এখনো চলেছে ব্যবসায়িক ও ভৌমিক প্রতিপত্তি এবং সমাজ-বিধানও চলেছে তারই দাসত্ব করে। জমিদারী ও মহাজনী প্রথার ভেতর দিয়েই হক, আর বর্ণাশ্রমিক প্রভুত্বের ভেতর দিয়েই হক, আজো শ্রেণী-স্বার্থই অক্ষুণ্ণ তেজে কায়েম রয়েছে। আর রাষ্ট্র-জীবনে রয়েছে বৈদেশিক প্রভুত্ব, যাদের রাষ্ট্র-শাসন এবং ব্যবসায়িক স্বার্থকে পোষকতা করেছেন এঁরাই। বলা বাহুল্য যে এদেশে ইংরাজাধিকারের পর থেকে শ্রমশিল্প ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে চলেছে। কিন্তু ইউরোপ প্রভৃতি দেশের মতো তাতে ভৌমিক প্রভুত্ব উচ্ছিন্ন হয়ে, তার স্থানে সর্ব্বাঙ্গীন ব্যবসায়িক প্রভুত্ব দানা বেঁধে ওঠেনি। পক্ষান্তরে চাষ-বাস ও গৃহ-শিল্প নিয়ে যে গৃহস্থরা ছিলেন একদা পল্লীগ্রামে, তাঁরা শ্রম-শিল্প বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই পৈত্রিক বাসস্থান এবং জাতীয় বৃত্তি ছেড়ে, একমাত্র চাকরি সম্বল করে সহরে এসে জড়ো হয়েছেন—আর

সহুরে মধ্যবিত্ত নামে শ্রেণী ও গণ-সাধারণের মাঝখানে যোগ-সূত্র স্থাপন করে, নূতন একটা সম্প্রদায়রূপে বেড়ে উঠেছেন।

বাংলার সব চেয়ে বড় সম্প্রদায়ই হলেন এঁরা। এঁরাই দেশের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ব্যবসা—সব কিছুকে গড়ে তুলেছেন মেধা দিয়ে। কিন্তু তার উপস্বত্ব ভোগ করছেন মালিক-মহাজন ইত্যাদি, যেমন শ্রম-শিল্পের দ্বারা টাকা উৎপাদন করেছেন শ্রমিকেরা এবং কৃষিকার্য্যের দ্বারা ফসল উৎপাদন করছেন কৃষকেরা, অথচ মালিক ও জমিদারেরা করছেন তার উপস্বত্ব ভোগ। (অর্থাৎ অর্থনৈতিক বণ্টনের দিক থেকে মধ্যবিত্তে এবং গণসাধারণে কোন তফাৎই নেই। তথাপি এই দুই সম্প্রদায়ে বাংলাদেশে আকাশ-পাতাল বিভেদ। মধ্যবিত্তরা সর্ব্বদাই চেষ্টা করছেন ধনিকদের সহযোগিতা করে শ্রেণীতে উঠতে, আর গণসাধারণ তাঁদের মেধাশক্তির সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়ে দিনের পর দিন বেশী করেই নেমে যাচ্ছেন আরো নীচুতে। এই সঙ্কট আজ চরম-বিন্দুতে পৌঁছেছে, যেহেতু মধ্যবিত্তের মধ্যে বেকার সমস্যা, অবিবাহ এবং আদর্শচ্যুতি প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে এবং সম্পূর্ণ অনিবার্য্য ভাবেই তা ভেঙে গণসাধারণের দিকে আসছে। তাই আজ কথা উঠছে, গৃহ-শিল্পের, হাতের কাজের, বৃত্তিমূলক শিক্ষার—কিন্তু কথাই উঠছে, আসলে নানা কার্য্য-কারণ বিভ্রাটে জিনিষটা রূপ নিতে পারছে না। একটা বিরাট বিপ্লব ভিন্ন তা নেওয়াও সম্ভব নয়। সেই জন্যে এদেশের গণ-আন্দোলন এখনো সীমাবদ্ধ রয়েছে মধ্যবিত্তের ভেতরই এবং যেহেতু তাঁরা শ্রেণীহীন গণসাধারণের অন্তর্ভুক্ত নন, বরং গণ-বিরোধী এবং শ্রেণী-সাধারণের স্বার্থের প্রতিভূ, সেইজন্যে তাঁদের হাত দিয়ে এই আন্দোলন উজান পথেই বয়ে চলেছে।)

এই ভূমিকার ওপর আধুনিক গণ-সাহিত্যের কাঠামো সংস্থিত—তাই তা সত্যিকার গণসাহিত্য হচ্ছে না, হচ্ছে গণসাহিত্যের ছদ্ম-আবরণে

মধ্যবিত্তেরই সাহিত্য। প্রাত্যহিক ও অভ্যস্ত আবহাওয়া ছাড়িয়ে নূতনত্বের জন্যে অনুন্নত জীবনের পটভূমি থেকে বিষয় আহরণ করা হচ্ছে, কিন্তু জীবন নীতি এবং দৃষ্টি-ভঙ্গী রয়েছে মধ্যবিত্তেরই। সমাজ-জীবন অপরিবর্ত্তিত থাকতে তা থাকবেই। বলা বাহুল্য, প্রয়াস হিসাবে এ ভালোই এবং সত্যিকার গণ-আন্দোলনের আবহাওয়া গড়ে তোলার দিক থেকে এর প্রয়োজনও কম নয়। কিন্তু এই মেকী জিনিষকেই আসলের গৌরব দিলে আপত্তি না করে পারি না।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ব্যবসায়িক ও ভৌমিক প্রভুত্ব উচ্ছেদ হচ্ছে বা তারই অনুপূরক বৈদেশিক কর্ত্তৃত্ব নিরস্ত: হচ্ছে, মধ্যবিত্তের ত্রিশঙ্কু অবস্থা ঘুচে গিয়ে তারা গণসাধারণের ভেতর অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে, ততদিন গণসাহিত্য হবে কোথা থেকে? মধ্যবিত্ত ও হীনবিত্ত একত্রীভূত হয়ে যে দিন সত্যিকার শক্তিশালী গণ-জীবন গড়ে উঠবে, সেদিন রাষ্ট্রের সমুদয় বিত্ত ও ক্ষমতা হস্তগত করা ও তাকে সমতার ভিত্তিতে বণ্টন করা সহজ হবে, গণ-জীবন সেদিন মর্য্যাদাবান হয়ে উঠবে, গণ-সাহিত্য রচনার সময়ও হবে সেদিন। এজন্যে দরকার শ্রেণী-জীবনের দ্রুত সমাপ্তি এবং মধ্য-বিত্তের গণ-জীবনে দ্রুত মিশ্রণ, তাহলে বৈপ্লবিক কর্ম্মধারার ভেতর দিয়ে আমরা কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় আসতে পারবো অতি শীঘ্রই। আজকের আবহাওয়া সেই অদূর সম্ভাবনারই সূচনা করছে মাত্র—সেদিন এখনো আসে নি।

[৪] ইতিহাসের নূতন দৃষ্টি

সমস্ত পৃথিবীতেই একদিন শাসক-সম্প্রদায়ের বিবরণকে ইতিহাস বলে মনে করা হতো—তাঁদের জয়-পরাজয়ের কাহিনী, তাঁদের শাসন-পদ্ধতির বর্ণনা এবং আনুষঙ্গিকরূপে সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বন্ধে দু একটি ইঙ্গিতই ছিল ইতিহাসের একমাত্র অবলম্বন। শাসক-সম্প্রদায়ের দপ্তর থেকে এই সমস্ত ইতিহাস প্রচারিত হতো, অথবা তাঁদেরই দলভুক্ত পণ্ডিতেরা এই সব ইতিহাস রচনা করতেন। 'সীজারের কমেণ্টারী', 'শ্রীহর্ষচরিত', 'আইন-ই-আকবরী' প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাস সমস্তই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইতিহাসের এই অনন্য পদ্ধতিই চলে আসছে একেবারে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্ব্ব পর্য্যন্ত। সমাজ-জীবনের উচ্চতম স্তরের লোক যাঁরা—রাজা, রাষ্ট্রনায়ক, ধর্ম্মগুরু, কবি, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী, তাঁদের গরিমাময় কীর্ত্তি-কাহিনীতেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভরপুর থেকেছে—সমস্ত দেশ ও জাতির মুখপাত্ররূপে তাঁরাই মাথা তুলে থেকেছেন এবং তাঁদের সেই উজ্জ্বল মহিমান্বিত রূপের আড়ালে কোটি কোটি দীনদরিদ্র মূক অসহায়ের ক্ষুদ্রজীবন ও সেই জীবনের ক্ষুদ্রতর বিবরণ সমূহ কোথায় চাপা পড়ে গিয়েছে! সাজাহানের অক্ষয় কীর্ত্তিরূপে ইতিহাসের বুকে শুধু তাজমহলই স্থান পেয়েছে, কিন্তু যাঁরা এর ইট, কাঠ ও পাথর বয়ে এনেছিলেন, দিনে দিনে, তিলে তিলে এই কীর্ত্তিস্তম্ভ যাঁদের নিবিষ্ট সাধনায় গড়ে উঠেছিল, সেই মূক শ্রমজীবীদের খবর ইতিহাস রাখে নি। যাঁদের শ্রমে, সাধনায়, অশ্রুজলে, বেদনায় এক-একটি যুগ আপনার স্বাতন্ত্র্য অর্জ্জন করেছে, সেই জনসাধারণের ইতিহাসে স্থান হয়নি।

দেশপ্রেমের মহিমায়, বীরপূজার আনন্দে, আত্মবলি দিয়েই জনসাধারণ তৃপ্ত থেকেছেন। তাঁদের এই আত্মাবলেপের মহাশ্মশানের ওপর যাঁদের কীর্ত্তির সৌধ জেগে উঠেছে, সেই ব্যক্তিরাই ইতিহাসে অমর। অজ্ঞতা, অক্ষমতা, দারিদ্র্য, নানা কারণ পরম্পরায় হতচেতন জনসাধারণ কোনদিনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন নি—তারই সুযোগে পরিশ্রমজীবী ধনিক, বণিক, রাষ্ট্রনায়ক ও তাঁদের পরিপোষকদের একাধিকার যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে কায়েম থেকেছে। এতে কোন অন্যায় বা অসঙ্গতি আছে, তা পর্য্যন্ত কারও মনে হয় নি—কারণ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনাদর্শ আপনাদের স্বার্থের অনুকূলে গঠন করে; এই সকল ক্ষমতাবান ব্যক্তিই জনসাধারণকে চিরদিন একটা ভ্রান্ত জীবন-নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য করেছেন। তাই দেশ বলতে, জাত বলতে যাঁদের বোঝায়, ইতিহাসে তাঁদের কথা নেই, তাঁদের সুখদুঃখের ওপর চিরস্থায়ী অস্বীকৃতির পর্দ্দা টেনে দিয়ে ইতিহাস শুধু তাঁদেরই গুণগান করেছে, যাঁরা তাঁদের সম্মিলিত সাহায্যে স্ফীত ও সমৃদ্ধ হয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে যেখানে প্রজাদের কথা এসেছে, সেখানে ঐতিহাসিক 'প্রজারা সুখে ছিল', অথবা 'রাজাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত', অথবা 'দলে দলে দেশের জন্য প্রাণ দিল' বলেই আপনার কর্ত্তব্য শেষ করেছেন। কিন্তু এ সুখের স্বরূপ কি ছিল, এ ভক্তির উৎস কোথায়, এই প্রাণদানের অজুহাত কি, সেই বিরক্তিকর প্রশ্নগুলি ঐতিহাসিক সতর্কতার সঙ্গেই এড়িয়ে গিয়েছেন। জনসাধারণও তাঁর কাছে সে দাবী করেন নি।

কিন্তু ইতিহাসের এই অব্যাহত ধারা আধুনিক কালে এসে সর্ব্বপ্রথম ঘা খেল ফরাসী বিপ্লবে, যখন জনগণ আপনাদেরকে মুষ্টিমেয় সমৃদ্ধ সম্প্রদায়ের স্বার্থসাধনের যন্ত্র-মাত্র মনে করতে গররাজী হল এবং আপনাদের ন্যায়সঙ্গত মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে রুখে দাঁড়ালো।

তারপর দ্বিতীয় আঘাত দিলেন মার্ক্স—যিনি বাস্তবতার কাঠামোর ওপর স্থাপন করে ইতিহাসের ধারা পর্য্যালোচনা করলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীতে এই মহাসত্য প্রচার করলেন যে যাঁরা সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের ধন উৎপাদন করে থাকেন, রাষ্ট্র তাঁদেরই—অর্থাৎ কৃষক, মজুর ও শ্রমজীবীদেরই—মুষ্টিমেয় মহাজন, সামন্ত বা তাঁহাদের স্বার্থবাহীদের নয়।

মার্ক্সের এই মতবাদের অনুপ্রেরণায় বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া জারের শাসনতন্ত্র উচ্ছিন্ন করে রাষ্ট্রশাসন শ্রমজীবীদের আয়ত্তে নিয়ে এলো, এবং পুঁজিবাদ ও তার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় গচ্ছিত স্বার্থের অবসান ঘটিয়ে সেখানে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা করলো। ফরাসী-বিপ্লব থেকে রুশ-বিপ্লব পর্য্যন্ত জন-জাগরণের এই ক্রমিক অভিব্যক্তিই ইতিহাসের বনিয়াদী ভিতে ফাটল ধরালো, ইতিহাসের দৃষ্টি-ভঙ্গী স্বভাবধর্ম্মেই পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। যে সমষ্টিগত ইতিহাসের প্রয়োজন ইদানীন্তন কালে সর্ব্বদেশে স্বীকৃত, তার জন্ম এখানেই। ঐতিহাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর এই ক্রম-পরিণতি একালের সংস্কৃতিকে নূতন পথে প্রবাহিত হবার প্রেরণা দিয়েছে। এযুগের জীবন-নীতিতে ইতিহাসের এই নয়া দৃষ্টি-ভঙ্গী সব চেয়ে বেশী প্রেরণা সঞ্চার করেছে।)

[৫] আধুনিক কাব্য

অনেকে বলেন, মানুষের সমস্ত ইতিহাস হল একটা চলমান প্রবাহের মতো। একদিন যা আধুনিক, প্রত্যক্ষ জীবনে যার প্রভাব অনুপেক্ষণীয়, যার সংস্রব অনিবার্য্য, আর একদিন তা গতিশীল জীবন-ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, এবং পুরাতত্ত্বের দপ্তরভুক্ত। তাকে তখন আমরা খুঁজে বের করি, যুক্তি-তর্ক বিচার-বিবেচনার সাহায্যে তার মূল্য নিরূপণ করি, কিন্তু জীবনের গভীরে তার সত্তার সুদৃঢ় আকর্ষণ অনুভব করি না, তাই তাকে নিয়ে আমরা বাঁচতে পারি না। এ থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে মানুষের সৃজনী-মন একটা বিশেষ ঐতিহ্যকে আঁকড়ে যুগের পর যুগ টিঁকে থাকে না, তা বদলায় এবং বদলানোই তার জীবনের লক্ষণ। আর মানুষের শিল্প ও সাহিত্যাদর্শকে অলক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত করে তার সমাজ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির প্রভাব, যা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। বাইরে থেকে কোন বিপ্লবের হাওয়া না এলেও, এ পরিবর্ত্তন মনোধর্ম্মের স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে আপনিই আসে এবং তা মানুষের দৃষ্টি ও চিন্তাকে আপনার রঙে অনুরঞ্জিত করে নেয়। এটা হয় বলেই এক যুগের সঙ্গে আর এক যুগের মননশীলতায় আকারে সাদৃশ্য কিছু থাকলেও, প্রকারে বৈলক্ষণ্যও থাকে প্রচুর। এক যুগের সাহিত্য তাই তার আঙ্গিকে, অবলম্বনে, এমন কি আবেদনেও আর এক যুগের সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র না হয়ে পারে না। এটা হয় বলেই টের পাওয়া যায় যে মানুষের মনের চেহারা বদলাচ্ছে এবং তা বদলাচ্ছে তার

পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে। এঁদের মতে তাই সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, কোন কিছুরই চিরন্তন জীবনাধিকার স্বীকার করে নেওয়া যায় না।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে মানুষের ইতিহাসে এ অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। শুধু নিঃশব্দ শ্রদ্ধায় স্বীকৃতই হয় নি, প্রাচীন ও অর্ব্বাচীনের পারস্পরিক ভাব-সঙ্ঘাতের ভেতর দিয়েই মানুষকে যুগের পর যুগ এগিয়ে আসতে হয়েছে। তার শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, এক কথায় তার সমস্ত ইতিহাসই এই সঙ্ঘর্ষের বর্গফল। উদ্ভিদ রাজ্যে বীজকে আশ্রয় করে যখন বৃক্ষ জন্ম নেয়, তখন বীজের আর থাকে না কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব—তা বৃক্ষের সমগ্রতার মধ্যেই লীন হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের সৃজনী-মন উদ্ভিজ্জ নীতির অনুগামী নয়। এক যুগের সাহিত্যেই হয়ত আর এক যুগের সাহিত্যের বীজ নিহিত থাকে, আবেষ্টনীর আনুকূল্যে যা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু তার প্রাণ-শক্তি তার আদি ভূমির সবটুকু জীবন-রস আকর্ষণ করে নিতে পারে না—তাই নূতন যুগের সৃষ্টির পাশেই পুরাতন যুগ তার দাবী-দাওয়া নিয়ে সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে থাকে। এই অক্ষয় সাহিত্য-কীর্ত্তিগুলোকেই আমরা বলি ক্ল্যাসিক। এটা কেমন করে হয় তা নিয়ে তর্ক তুললে, একমাত্র দোহাই যা নির্ভয়ে দেওয়া যেতে পারে, তা হচ্ছে হৃদয়-ধর্ম্ম, যুগে যুগে অজস্র পরিবর্ত্তনের ভেতর দিয়ে এসেও যা আপনার নিজস্বতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবন-নীতির যে সাম্প্রতিক প্রভাব থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ক্ল্যাসিকগুলি জন্মেছিল, ব্যবহারিক দিক থেকে তাদের সঙ্গে আমাদের আজ আর কোন যোগ থাকার কথা নয়। তা নেইও। তাদের আবেষ্টনী ও আনুষঙ্গিকের সঙ্গে আমাদের ষোল-আনাই তফাৎ, তবু আন্তরিক দিক থেকে তাদের সঙ্গে আজো আমরা একটা সমধর্ম্মিতা অনুভব করি। সেইজন্যেই রামায়ণ, মহাভারত বা

কালিদাস, সেক্সপীয়ার আমাদের কাছে প্রাগৈতিহাসিক গুহা-মানবের কঙ্কাল মাত্র নয়। এদিক থেকে বিচার করে অনেকে আবার তাই বলেন যে সাহিত্যে আধুনিক বলে কোন জিনিষ নেই—যুগে যুগে সাহিত্যের আকারে ও আনুষঙ্গিকে সমসাময়িক জীবন ও সংস্কৃতি আপন প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু তার প্রাণ-ধর্ম্ম সকল যুগেই থাকে এক। আদিমতম যুগ থেকে আধুনিকতম যুগ পর্য্যন্ত, সাহিত্যের ইতিহাসে এই কথাই বারবার প্রমাণিত হয়েছে।

এই পরস্পর-বিরোধী দুটি মতের ভেতর কোন সমন্বয় স্থাপন সম্ভব নয়। সাহিত্যের প্রাণ-ধর্ম্ম চিরন্তন এবং তার আঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক সাম্প্রতিক, একথা যদি স্বীকার করেই নিই, তবু একটা মৌলিক প্রশ্ন থেকে যায়—তাহলে সাহিত্যের পরিচয় কিসে? প্রাণ-ধর্ম্মে, না যে বিষয় ও বিন্যাস-রীতিকে আশ্রয় করে তার স্থিতি, সেই বাস্তব উপকরণে? বলা বাহুল্য, নির্ব্বিশেষ প্রাণের কোন চেহারা নেই, তাকে উপলব্ধি করি বাস্তবের ভেতর দিয়েই। (বাস্তবটাই হল একমাত্র সৎ, প্রাণ-ধর্ম্ম তার অন্তর্লগ্ন। সুতরাং প্রাণ-ধর্ম্ম একান্তভাবেই বাস্তবের ওপর নির্ভরশীল, আর বাস্তব সংসারে মানুষের আবিষ্কৃতি, উদ্ভাবন নিত্যই নূতন পরিবর্ত্তন ঘটাচ্ছে, নূতন নূতন অবস্থার উদ্ভব এবং তারই প্রয়োজনে নূতন নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন থেকে আসছে তার শিক্ষার, সংস্কারের, এমন কি অনুভূতির রাজ্যেও নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন। বাস্তবের এই দ্রুত পরিবর্ত্তন-শীলতার ভেতর, তথাকথিত প্রাণ-ধর্ম্ম তার অবিকৃত আত্মস্বাতন্ত্র্য নিয়ে থাকতেই পারে না।) তাই যুগে যুগে সাহিত্যের লৌকিক কাঠামোতে বা তার প্রকাশের পদ্ধতিতে যে পরিবর্ত্তন দেখা দেয়, তা নিতান্তই বহিরঙ্গিক ব্যাপার নয়, তা তার প্রাণগত পরিবর্ত্তনকেও সূচিত করে। সুগঠিত সমাজ ও সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের অধীনে যারা মানুষ, তাদের বুদ্ধি,

বুদ্ধি, সংস্কার ও মননক্রিয়া যে বর্ব্বর যুগের মানুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এ আমরা অনায়াসেই স্বীকার করি, কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে অলক্ষ্য পদসঞ্চারে যে পরিবর্ত্তন আসে, সব সময় তাকে আমরা ধরতে পারি না।

ধরা যাক আধুনিক কবিতা। ভালো-মন্দর কথা না তুলেও একথা অসঙ্কোচেই বলা যেতে পারে যে, আজকের কবিতা বিগত শতাব্দীর কবিতা থেকে পৃথক্। বিষয়-বস্তু, দৃষ্টি-ভঙ্গী, প্রকাশ-বিধি, সবদিকেই এর স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়, এবং যা সত্যিই আজকের সৃষ্টি, এই স্বাতন্ত্র্যই হল তার কৌলিক পরিচয়। যা এই কুল-লক্ষণ থেকে বিচ্যুত, তা সত্যিকার আধুনিক নয়, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি মাত্র, আর সেই জন্যেই তা সৃষ্টির গৌরব দাবী করতে পারে না। কিন্তু আধুনিক কাব্যে এই পরিবর্ত্তন এসেছে কোথা থেকে? কতকগুলি নিষ্কর্ম্মার অলস মস্তিষ্ক থেকে যে জন্মায় নি, বর্ত্তমান শতাব্দীর বাস্তব প্রবর্ত্তনা থেকেই যে এর উদ্ভব, একথা অনেকেই স্বীকার করতে চাইবেন না, তার কারণ সমসাময়িক জীবন ও সংস্কৃতির সমগ্র চেহারা সাধারণের চোখে ধরা পড়ে না—সময় পার হয়ে যাবার পর যখন ইতিহাসের যাদুঘরে তার পরিচায়ক নিদর্শনগুলো পরের পর সাজিয়ে রাখা হয়, তখনই তাঁরা সানুরাগে তাকে স্বীকার করে নেন—প্রত্যেক যুগই যে সমসাময়িকের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে, তার গোড়ায় কারণটা এই। কিন্তু কবি ও সাহিত্যিকের মননশীল দৃষ্টি অনেক দূর চলে বলেই তাঁরা সমসাময়িক জীবনের পূর্ণ পরিপ্রেক্ষণীকে আয়ত্ত করে নেন এবং নিজেদের সৃষ্টিতে তাকে রূপায়িত করেন—জনগণ তা থেকে পিছিয়ে থাকেন, তাই তাঁরা বুঝতে পারেন না। সমসাময়িক সমাজে কবির যে অনাদর হয়, সে এই জন্যেই।

(আজকে আমরা যে রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার ভেতর দিন কাটাচ্ছি, তাতে সমাজতন্ত্রবাদ, পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব (তার

আনুষঙ্গিক অপরাপর শাস্ত্র) এবং যন্ত্র-বিজ্ঞান তুমুল ওলট-পালট ঘটিয়েছে। চিরাগত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে আজ আমরা প্রশ্নহীন বশ্যতায় স্বীকার করি না—ধর্ম্ম, নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানকে আজ আমরা বিশ্লেষণ করে ব্যবচ্ছেদ করে দেখি। দুর্জ্ঞেয় বা দুরূহ বা বিস্ময়ান্বিত বিশ্বাসের রহস্যে সমাচ্ছন্ন যা, তাকে আজ যন্ত্রের আয়ত্তে এনে প্রমাণ করে দেখতে বসি। প্রকৃতি যেখানে আমাদের অবাধ স্বাধীনতার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে আমরা নিযুক্ত করি যন্ত্রকে আমাদের প্রতিনিধিরূপে। এই ব্যবহারিক ও মানসিক বিপর্য্যয়ের ভেতর দিয়ে যাঁরা মানুষ, তাঁরা প্রাক্তন সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই হক, আর প্রাক্তন শিক্ষা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যই হক, কোনটাকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন না। তাঁরা চাইবেনই নববিধানকে এবং তাতে বাধা পেলে বিদ্রোহ ঘোষণা করবেনই। আজকের কবিতায় এই অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনেরই ছায়া পড়েছে) আজকের কবি গচ্ছিত স্বার্থের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন—দেশাত্মবোধের নামে, ধর্ম্মের নামে, সমাজ-সংহতির নামে ক্ষমতাবানেরা যেভাবে নিঃস্বদের শোষণ করে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, তার বিরুদ্ধে আধুনিক কবির কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠেছে। আজ তিনি করছেন যন্ত্রের গুণগান, যে যন্ত্র অজস্র উৎপাদনের উপায়, অমিত শক্তির আধার, মানুষের উদ্ভাবনী বুদ্ধির যাতে উন্নততম প্রকাশ এবং মুষ্টি-মেয়ের কবল থেকে যন্ত্রকে মুক্ত করে, সর্ব্ব মানবের সেবায় তাকে নিয়োজিত করার জন্যেই তিনি করছেন সংগ্রাম। চাঁদের আলো, পাখীর গান ও ফুলের সৌরভ তাঁকে আজ আকৃষ্ট করে না। আজ তিনি কুশ্রীর, কদর্য্যের, যুগ যুগ ধরে ঘৃণা, উপেক্ষা ও অস্বীকৃতির মধ্যে ম্রিয়মাণ হয়ে বেঁচে-থাকা উলঙ্গ প্রত্যক্ষের মহিমাকে স্বীকার করেছেন। এরাই একমাত্র সত্য বলে নয়—অধিকাংশের জীবনই বস্তু-সংসারের নীচু কোঠায় আবদ্ধ বলে, এইদিকেই

এসেছে তাঁর সহানুভূতি। আগেই বলেছি যে এযুগের জীবন ও ঐতিহ্য থেকে স্বাভাবিক প্রেরণাতেই এসেছে কবির দৃষ্টিতে এই পরিবর্ত্তন—তাই এ যুগের কাব্যও ধরেছে এই রূপ, যা আগেকার কাব্যে হয়নি, হতে পারেও নি।

এ যুগের কাব্য-দৃষ্টিতে এই যে পরিবর্ত্তন এর মূল্যকে আমরা স্বীকার করি বা না করি, এর গতি অনিবার্য্য। প্রতিভা দেশকালের অতীত একথা সত্যি হলেও, সমসাময়িক আবহাওয়াকে অতিক্রম করে চলা মানুষের পক্ষে কঠিন—আর প্রতিভাধরেরা মানুষই। তাই যুগ-ধর্ম্মের প্রভাবকে তাঁরা না মেনে পারেন কি করে? আজকের কবি তাই যখন প্রেমের কবিতা লেখেন, তখন তাতে দেহাতীত কল্পলোকের ইঙ্গিত থাকে না, তা থাকলে আজকের দিনে সে প্রেমকে লৌকিক দিক থেকে কেউ স্বীকার করবে না। প্রকৃতির সঙ্গে অন্তর্বৃত্তির যোগকে আজকের কবি অনাদিকালের বন্ধন বলে মনে করেন না—এই যোগের অববাহিকা বেয়ে কোন লোকাতীত সুন্দরের প্রচ্ছন্ন আনাগোনাও তাঁর চোখে ধরা পড়ে না। প্রেম তাঁর কাছে রক্ত-মাংসের স্বধর্ম্ম, প্রকৃতি তাঁর কাছে জীব-প্রবাহের আদি উৎস, জীবনধারণের অনন্য অবলম্বন—রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম, সবই আজ তাঁর কাছে দুর্ব্বলের ওপর প্রভুত্ব স্থাপনের জন্যে সবলের স্বহস্তে রচা ব্যবস্থা। তাই তাঁর লেখনী আজ সুন্দরের গুণগান করে না, শক্তিমানের অপকৌশলকে মহিমার নামান্তর ভেবে তার প্রশস্তি রচনা করে না। তাতে আজ এসেছে যাবতীয় প্রাক্-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, এসেছে বিদ্রোহ, এসেছে ঘৃণা, আবার তারই সঙ্গে এসেছে ব্যক্তিমুখিতা, এসেছে বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষাবাদিতা, এসেছে প্রমাণসহ বাস্তবতা। সব শুদ্ধ জড়িয়েই হল আজকের কবিতা।

[বিগত মহাসমরের পর থেকে বর্ত্তমান মহাসমরের সূচনা পর্য্যন্ত এই যে

পঁচিশ বছর, এই হল আধুনিক কবিতার জন্মকাল। এই সময়টিতে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শিল্পে-সংস্কৃতিতে, আচারে-অনুষ্ঠানে, পৃথিবীর ইতিহাস কি বিরাট ভাঙাগড়ার ভেতর দিয়ে এসেছে, তা মনে করলেই বুঝতে পারি, আজকের সাহিত্যাদর্শে যে ওলটপালট এসেছে, তা মাটি ফুঁড়ে ওঠে নি—তার শিকড় আমাদের জীবনের মধ্যেই রয়েছে। ইউরোপে, আমেরিকায়, আমাদের দেশে, সর্ব্বত্রই কারণ এক—(যেহেতু আজকের দিনে পৃথিবীর এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের যোগটা নিতান্তই ভৌগোলিক নয়, রীতি-মতো সাংস্কৃতিকও।) এই যে ভাঙাগড়া, ওলট-পালট, এ এখনো সমগ্রভাবে দানা বাঁধেনি, তা বাঁধবার আগেই আবার বেধেছে মহাযুদ্ধ। কিন্তু এই আপাতবিশৃঙ্খল ও একান্ত অস্থির নীহারিকাপুঞ্জ যদি কোন দিন কেন্দ্রবদ্ধ হয়, তাহলে সেদিন একটা নূতন বিশ্ব-ব্যবস্থাই দেখা দেবে। আজকের এই সাহিত্যিক বিপর্য্যয়ও সেদিন একটি নূতন সার্থকতা খুঁজে পাবে, আজ যার পূর্ব্বাভাষ মাত্র পাওয়া যাচ্ছে। কোন কবির নাম ধরে আমি আলোচনা করছি না, তার কারণ তাতে পৃষ্ঠা বৃদ্ধিই হবে, কাজের কাজ হবে না। Harold Monro তাঁর আধুনিক ইংরেজী কাব্য-সঙ্কলনে যথার্থই বলেছেন, এ যুগে কোন একজন বিশেষ কবিকে অসাধারণতার মার্কা দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না—এঁরা সকলে মিলেই একটা গোষ্ঠী এবং সকলের সম্মিলিত দৃষ্টি, চিন্তা, প্রয়াস ও পরীক্ষা থেকেই একটা নূতন কাব্যাদর্শের জমি তৈরী হচ্ছে—যেমনভাবে অগণ্য প্রবাল কীট একত্র হয়ে গড়ে তোলে এক-একটি প্রবাল দ্বীপ। অবশ্য এঁদের মধ্যে শক্তির তারতম্য আছে—কেউ এলিয়ট, কেউ স্যাণ্ডবার্গ, কিন্তু নাম ধরে যাঁদের প্রচার করা যায় না, তাঁরাও কেউ উপেক্ষার নন। সব শুদ্ধ জড়িয়ে আধুনিক কবিতা অসাধারণ এবং এ একই সঙ্গে যেমন করেছে পূর্ব্বতনের সঙ্গে সুস্পষ্ট ছেদ রচনা, তেমনি করেছে সত্যকার নূতনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। আগামী কোন দিনে এরই

ওপর জন্মাবেন সেই সব দুর্লভ প্রতিভা, যাঁরা হবেন ভাবী ইতিহাসের এক-একটি স্তম্ভ।

মনরোর এই উক্তি যে এ যুগের সমালোচক মাত্রেরই উক্তি, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এইখানে একটু অপ্রিয় কথাও এসে পড়ছে, পাশ কাটিয়ে গেলে যা থেকে পরিত্রাণ নেই। (এ যুগের কাব্যে এবং চিত্রে যুগের দোহাই দিয়ে হুজুগও এসেছে প্রচুর এবং তা কোন সুনিয়ন্ত্রিত মতবাদ বা সুসম্বদ্ধ জীবন-বেদ থেকে আসে নি, এসেছে নিতান্তই খেয়াল থেকে। আমি বলছি, অবচেতনা প্রভাবান্বিত কবিতা এবং অতি-বাস্তবিক চিত্রকলার কথা। এই শ্রেণীর কবিতার ভাষায় অর্থসঙ্গতি এবং ছবির অঙ্কণে বস্তুসঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না—একে কথার সঙ্গে কথা, অন্যে বস্তুর সঙ্গে বস্তু তালগোল পাকিয়ে পদে পদে খালি উদ্ভট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। বলা হয়, শব্দের সঙ্গে শব্দের সঙ্ঘাত থেকে কবিতায় এবং রঙের সঙ্গে রঙের বা রেখার সঙ্গে রেখার সঙ্ঘাত থেকে ছবিতে আপনিই একটা ব্যঞ্জনা গড়ে ওঠে, যা আমাদের অবচেতনার আসল রূপ। অর্থ দিয়ে শব্দকে বাঁধতে গেলেই তা হয়ে পড়ে কৃত্রিম, তখন তা যে কথা বলে, মনের আদত কথাটি তা নয়। ছবিতেও তেমনি বস্তুসঙ্গতি আনতে হলে, অবচেতনায় তা যে রূপ নিয়ে জন্মেছিল, তা আর থাকে না—তখন সে হয় একটা বহিরঙ্গিক সৃষ্টি। সেই জন্যে it is not meaning that means, nor object that is of any objective importance। কাব্যে এজরাপাউণ্ড, কমিংস, গদ্যে জেমস জয়েস, ছবিতে পিকাসো, বেকম্যান, ভাস্কর্যে এপিষ্টিন প্রথম এই উদ্ভট মতের ধুয়া তোলেন। তারপর ধীরে ধীরে এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সকল দেশেই এক-একদল কবি সাহিত্যিক শিল্পী ভাস্কর দেখা দেন, যাঁদের লক্ষ্যই হল মানুষের বোধ-শক্তিকে বিভ্রান্ত করা—অবোধ্যতার আবর্তে ফেলে অসহায় মানুষের

মনোযোগ ও করতালি আদায় করা। এ জিনিষ আমাদের দেশেও এসেছে।

অবচেতনার নাম নিয়ে এই আন্দোলন নিছক উদ্ভট কিছু করার মোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। শিল্প বা সাহিত্যের আদি বীজ অবচেতনায় নিবদ্ধ সন্দেহ নেই—কিন্তু বাস্তবে তার প্রকাশের বাহন হল ভাষা (নয়ত রঙ ও রেখা, যা ছবির ভাষা)—যা মানুষের তৈরী, যাতে অর্থের বাঁধন আছে, শব্দ-বিন্যাসের নিয়ম-কানুন আছে, সেই কারণেই আছে অনেক-কিছু কৃত্রিমতা। সুতরাং আদিতে শিল্প বা সাহিত্য যে রূপ নিয়ে মনে জন্ম নেয়, ভাষায় বা তুলিতে তাকে ঠিক সেই রূপ দেওয়া হয়ত সম্ভবই নয়। কিন্তু মনকে প্রকাশ করার অন্য আর কোন বাহন ত নেই, কাজেই এই শৃঙ্খলার ভেতর দিয়েই তাকে বাইরে ফোটাতে হবে, আর তাতে তার যতটুকু খোয়া যাবে, তা ঠেকানোরও কোন উপায় নেই। সুতরাং কলমের বা তুলির মুখে পরিচিত ভাষায় অবচেতনাকে প্রকাশ করাই যায় না—সুতরাং অবচেতনাত্মক কোন আর্টও হতে পারে না। তা ছাড়া, অবচেতনার প্রতিরূপে মনোসমীক্ষকের দরকার থাকলেও সাহিত্য পাঠকের তাতে দরকার কি? মানুষের প্রত্যক্ষ জীবনে গর্ভস্থ ভ্রূণের মতো অবচেতনাও রয়েছে চেতনার আড়ালে—হয়ত চেতনাকে নিয়ন্ত্রিতই করছে, তবু মানুষের অবচেতন মন চিরদিনই মানুষের দৃষ্টি-সীমার বাইরে। সুগঠিত সমাজ-ব্যবস্থায় যাদের জন্ম, তাদের মননক্রিয়ায় সমুদয় অবচেতনিক অসংলগ্নতার ভেতর একটি প্রচ্ছন্ন চেতনার পারম্পর্য্যও থাকে—নইলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মনকে কুড়িয়ে মানুষ এক করতে পারতো না—এ কথা মনোবৈজ্ঞানিকরাও স্বীকার করেছেন। হতে পারে, এটা জন্মগত নয়, পারিবেশিক প্রভাব থেকে আহৃত, কিন্তু মানুষের সংস্কার কতটা জন্মগত আর কতটা আহৃত, দাঁড়ি ধরে কোনদিনই কি তার হিসাব হয়েছে?

বলা বাহুল্য এ আধুনিকতা নয়, আধুনিকতার নামে অর্থহীন একটি হট্টগোল এবং নিতান্তই ভেবেচিন্তে করা। এই জন্যে এই জাতের কাব্য বা চিত্র কোন দিনই নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে সমস্ত মানুষের দ্বারা আদৃত হতে পারবে না—মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রবহমান ধারাকে এগিয়ে না দিয়ে, এ তার স্রোতকে আটক করেই দাঁড়িয়ে থাকবে কিছুদিন, তারপর স্রোতের আকর্ষণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপনিই কোথায় তলিয়ে যাবে। এ যুগের কাব্যের যে কুল-লক্ষণ আমরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি, তাতে এইটুকুই বোঝাতে চেয়েছি যে, এ যুগের কাব্য জীবন-সংস্রবহীন কল্পনা-বিলাসকে স্বীকার করে না, মুষ্টিমেয়ের উপভোগ্যতার মুখ চেয়ে সমষ্টির দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ানোও তার ধর্ম্ম নয়। আদর্শের দিক থেকে তা বস্তুতান্ত্রিক, নীতির দিক থেকে তা বামপন্থী। সত্যিকার আধুনিক কবিতা যা, তাতে এই সব বুদ্ধির মারপ্যাঁচ খাটানোর তাই অবকাশ নেই, যেহেতু তার গতি অবারিত মানবতার দিকে। অবশ্য এই সঙ্গে একথাও বলতে হবে যে এরকম আধুনিক কবিতা কোন দেশেই এখনো সমগ্রতা লাভ করে নি—আমাদের দেশে ত নয়ই। আমরা এখনো অন্যদের অনুকরণ নিয়েই আছি, (নিজেদের জীবন-বেদনা থেকে যেদিন এই কাব্য-দৃষ্টি উৎসারিত হবে, সেদিনই আমরা লিখতে পারবো সত্যিকার আধুনিক কবিতা, আজ আমরা করছি যার প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন।

[৬] আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা

বাংলা কবিতার আধুনিকতম পরিণতি লক্ষ্য করলে, একটা জিনিষ অতি সাধারণ পাঠকেরও দৃষ্টি এড়ায় না—অধিকাংশ কবিতারই গতি অবোধ্যতার দিকে। মনে হয়, যেন লেখকরা পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কে কতখানি উদ্ভট ও অবোধ্য হতে পারেন, তারই পরীক্ষা করবার জন্যে কলম ধরেছেন। কবিতার সঙ্গে গদ্যের একটা স্পষ্ট তফাৎ অবশ্য চিরদিনই আছে—গদ্যে যা উন্মুক্ত, কাব্যে তা প্রচ্ছন্ন, অনেক সময় ইঙ্গিতে সীমাবদ্ধ, কিন্তু সে হচ্ছে অনুভূতি বা ব্যঞ্জনার কথা। প্রাণ-বস্তুর গভীরতা ভাষার বহিরঙ্গিক আবরণে বাঁধতে গেলে যে অস্বচ্ছতা স্বভাবতই আসতে পারে, কবিতার প্রসঙ্গে সেই দুর্বোধ্যতাই এতদিন স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু অতি-আধুনিক কবিতার যে অবোধ্যতা, তা হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতের। তাতে ভাষা নিয়েই হয়েছে বিপদ।

এঁরা যে ভাষায় লেখেন, তা দেখতে বাংলার মতোই, কিন্তু আসলে তা বাংলাও নয়, ইংরেজীও নয়, কোন দেশ বিশেষের ভাষাও নয়—তাতে দুরূহ সংস্কৃত শব্দের সঙ্গেই দুষ্পাচ্য গ্রীক-ল্যাটিন-ইংরেজী-ফরাসী শব্দের ছড়াছড়ি আছে, আর আছে বক্তব্যকে অযথা ধোঁয়াটে করে তোলার প্রয়োজনে আমদানি হরেক রকম বস্তুর একত্র সমাবেশ। কিন্তু একটি জিনিষ নেই, তা হচ্ছে শব্দের সঙ্গে শব্দ-যোজনার দ্বারা অর্থ বা ভাবোপলব্ধির কোন বিধি-সম্মত ব্যবস্থা। ব্যাকরণের যে সাধারণ আইন না মানলে একের বাক-বিন্যাস অন্যের বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয়, ভাষার যে শৃঙ্খলা স্বীকার না করলে বক্তব্য বিষয় কখনই পরিস্ফুট হতে পারে

না, সর্ব্বাগ্রে তা অস্বীকার করে এই যে একশ্রেণীর সন্ধা ভাষা সৃষ্টি করা হয়েছে, এর পেছনে সাপ আছে না ব্যাঙ আছে, তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই দুস্তর অবোধ্যতার সমুদ্রে যে উৎকট দুরুচ্চার্য্য কথাগুলো দ্বীপের মতো চোখের ওপর ভেসে ওঠে, অনুসন্ধানে জানা যায়, তার কোনটা বৈদিক, কোনটা গ্রীক, কোনটা চৈনিক, কোনটা সেমিটিক। কিন্তু এই ভাসমান পদার্থগুলির সঙ্গে বহমান ভাষা-স্রোতের সম্বন্ধ কি, সে প্রশ্ন করে কোন সদুত্তর প্রাজ্ঞতম বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকেও আদায় করতে পারি নি।

একটা কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়—এখনকার যাঁরা কবি, আগেকার কবিদের চেয়ে তাঁরা অনেক বেশী পড়াশুনা করেছেন—তাঁদের অধীত বিদ্যার প্রচুরায়ত প্রভাব তাঁদের ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গীকে স্বভাবধর্ম্মেই দুরধিগম্য করে তুলেছে, প্রাকৃত জন পাণ্ডিত্যের অভাববশতই যার নাগাল পায় না এবং সেই কারণেই সাধারণ পাঠকের কাছে এই সব কবিতা অবোধ্য ঠেকে, কিন্তু আসলে এরা অবোধ্য নয়—এই সমস্ত কবির অনুরূপ বিদ্যা-বুদ্ধি যাঁদের আছে, তাঁরা এই অব্যাকরণসম্মত, সংলগ্নতারহিত এবং সার্ব্বজগতিক allusion-কণ্টকিত বাক্‌-বৈদগ্ধ্যের ব্যূহ ভেদ করে ঠিক জায়গাতেই পৌঁছে থাকেন—যেখানে এই সব অবোধ্য কবিতার প্রাণময় কোষ অবস্থিত—সেটা রস-লোক, কি প্রজ্ঞা-লোক, গো-লোক, কি ব্রহ্ম-লোক তাও তাঁরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করেন। বলা বাহুল্য প্রাকৃত জন এই শ্রেণীর সদম্ভ ঘোষণায় ভয় পাবেনই এবং বাধ্য হয়েই বলবেন, হবেও বা। হয়ত ভীরুপ্রাণ কলেজের ছেলে-মেয়ে কবিযশোপ্রার্থী হয়ে প্রাণের দায়ে এই মহাজন প্রদর্শিত পথের অনুসরণও করবে। কিন্তু প্রশ্নটার সন্তোষজনক কোন সমাধান তাতে হবে না।

আধুনিকতার এই আতিশয্য এক শ্রেণীর অধ্যাপক সমাজে মৌলিকতার নামে করতালি পেয়েছে। এর প্রাণ-ধর্ম (creed ' বোঝাবার নাম করে তাঁরা প্রবন্ধে এবং বক্তৃতায় বারবার এই পর্য্যায়ভুক্ত কবিদের উদ্দেশে জয়ধ্বনি এবং এঁদের বহির্ভূত কবিদের নামে দুয়োও দিয়েছেন। এই হট্টগোল প্রজ্ঞাজীবীদের হাত দিয়ে এলেও, এদের উদ্দেশ্য কিন্তু জলের মতো পরিষ্কার, সেইজন্যেই এই সশব্দ ঘোষণা সত্ত্বেও আমরা ভীত হই নি। বুঝেছি, নূতন কাব্যধারা প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্য করে তাঁরা ছোটখাটো গোছের একটি 'কোটারী' বাঁধতে উদ্যত হয়েছেন। তাঁরা ঠিক করেছেন, অনেক বড় জিনিষ প্রাকৃত জনে বোঝেন না, সুতরাং প্রাকৃত জনে যা বোঝেন না, তাই বড় জিনিষ—অতএব যত বেশী অবোধ্য হতে পারবেন, তাঁদের আভিজাত্যও বাড়বে তত বেশী এবং দলের সঙ্ঘশক্তিও ততই দানা বাঁধবে। আর দেশের নাবালক ছাত্র-ছাত্রী এবং নির্ব্বিচার জনসাধারণ ততই ভয়ে-বিস্ময়ে না বুঝেই তাঁদের তারিফ করতে সুরু করে দেবে। এই ভাবে দেশের সাহিত্য রাজ্যে তাঁরা কায়েমি স্বার্থ এবং আত্মকেন্দ্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। প্রজ্ঞাজীবীদের সম্পর্কে আমি উদ্দেশ্য আরোপ করছি—যে যুক্তিপরম্পরার ওপর তাঁদের এই আন্দোলনের স্থিতি, তা খণ্ডনের দ্বারাই আমি আমার অভিযোগ সপ্রমাণ করবো। কিন্তু তার আগে আর একটা কথা বলে রাখা দরকার।

(বিগত মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ইউরোপ-আমেরিকার জীবন ও সংস্কৃতিতে যে বিপর্য্যয় এনেছিল, তাতে তারা উদ্‌ভ্রান্ত না হয়ে পারে নি। যন্ত্র-বিজ্ঞানের অপরিসীম উন্নতি ও মনোবিজ্ঞানের নবীনতম পরিণতি তাদের পূর্ব্বতন বিশ্বাস এবং আস্তিক্যবুদ্ধির ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছিল—সমাজতন্ত্রবাদের ব্যাপক প্রসারে তাদের রাষ্ট্র এবং গোষ্ঠী-জীবনেও ভাঙনের বন্যা এসেছিল। বোঝা যাচ্ছিল ওদের জীবনাদর্শ ও সংস্কৃতিধারা একটা পরি-

বর্ত্তনের সম্মুখীন হতে চলেছে—এই ওলট-পালটের ভেতর ওদের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, নৈতিক, শিল্পীক, সর্ব্ববিধ ঐতিহ্যেরই ভাঙা-চোরা সুরু হয়ে যায়—নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নানা সঙ্গত-অসঙ্গত আন্দোলন-আলোড়নে মানুষ ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই ভাঙনের মুখে যে সাহিত্য ও শিল্প দেখা দেয়, তা কোন সুনিয়ন্ত্রিত জীবন-বেদকে রূপ দিতে পারে নি, কোন সুনিশ্চিত এবং সর্ব্বজনগ্রাহ্য রসাদর্শের নির্দ্দেশও সঙ্গে নিয়ে আসে নি। প্রত্যক্ষ জীবনের ভিত্তি যেখানে শ্লথ এবং পরিবর্ত্তনসঙ্কুল, সেখানে তা হওয়াও সম্ভবপর ছিল না। তবু এই বিপর্য্যয়ের ভেতর সত্যিকার প্রতিভার স্ফুরণও হয়েছে যথেষ্ট এবং তাঁরা অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানকে সংযুক্ত করে ভবিষ্যতের পথকে ক্রমিক ধারাতেই এগিয়েও নিয়ে চলেছেন।) কিন্তু তাঁদের আশে-পাশেই আর এক দল কৌশলী বুদ্ধিজীবী এই সুযোগে মাথা খাড়া করে উঠেছেন, যাঁরা সমাজতন্ত্রবাদ, অবচেতনবাদ, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাবাদ…নানা মতের নামে নানা শ্রেণীর উদ্ভট সৃষ্টি করে বিপর্য্যস্ত ও বিভ্রান্ত জন-সাধারণকে ধোঁকা দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকটি মাত্র নাম উল্লেখ করবো—কাব্যে এজরা পাউণ্ড, কাম্মিংস, গদ্যে জেমস জয়েস, ভাস্কর্য্যে জেকব এপিষ্টিন এবং চিত্রে পিকাসো, বেকম্যান এই ধোঁকাবাজী-সমাজের মুখপাত্রস্বরূপ। এঁদের সৃষ্টি কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি—কিন্তু যেহেতু এঁরা প্রজ্ঞাবাদী এবং নানা বিদ্যায় পারদর্শী, সেই জন্যে এঁদের ক্রিয়া-কলাপের সারবত্তা নিয়ে স্ফুটকণ্ঠে প্রতিবাদও করতে সাহস পাননি। সেই দুর্ব্বলতার সুযোগে এঁরা স্ব স্ব প্রভাব বিস্তার করে আপন আপন দল গড়ে তুলেছেন এবং দলীয় প্রচার-প্রপ্যাগাণ্ডায় দুনিয়া মাৎ করে ফেলেছেন। এই সব প্রভাবশালী ব্যক্তির মতলব-প্রসূত ধাপ্পাকে কোন বৃহত্তর এবং দুর্নিরীক্ষ্য প্রজ্ঞাদৃষ্টির ফলস্বরূপ ভেবে সরলবুদ্ধি সাধারণ ঘাড় হেঁট করেই এঁদের মেনে নিয়েছেন, আর বিরুদ্ধ-

সমাজ যথেষ্ট পরিমাণ আধুনিক এবং প্রজ্ঞাশীল বলে বিবেচিত না হবার ভয়ে আত্ম-প্রতারণার বাঁকা পথে এঁদের গুণগান করেছেন। আমাদের দেশের পণ্ডিত-সমাজ ইউরো-এমেরিকার পণ্ডিত মহলের প্রতিধ্বনি করেই এঁদের গুণগান করছেন। তাঁদের সেই অতি-আধুনিক বিদ্যা-বৈদগ্ধ্যের আবর্ত্তে পড়ে বাঙালী কবিরাও বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং তার ফলেই বাংলা কবিতার এই অতি-আধুনিক দশান্তর প্রাপ্তি ঘটেছে। বস্তুতঃ 'হিং টিং ছটে'র ব্যাখ্যার মতো অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, পারম্পর্য্যহীন, প্রলাপোক্তির প্যাঁচে হাবুডুবু খেতে খেতে সবাই চলেছেন এগিয়ে। লেখকরাও বুঝছেন, স্রেফ ফাঁকিকে তাঁরা বাজারে চালু করেছেন—পাঠকরাও বুঝছেন, স্রেফ ফাঁকিকে তাঁরা তারিফ করছেন। কিন্তু মনকে চোখ ঠেরে তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে ঠকিয়ে চলেছেন, হ্যান্স্ এণ্ডারসনের রূপকথার সেই রাজ-পোষাক ও তার নির্ম্মাতাদের মতো !

এমন দিনে এই অপপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কিছু বললে, অল্প-বুদ্ধি কলেজের ছাত্রেরা প্রতিক্রিয়াশীল বা ফিউডাল মনোভাবাপন্ন বা বুর্জ্জোয়া বলে দন্তরুচিকৌমুদী বিকাশ করবে ভেবে নিঃশব্দ থাকা সঙ্গত নয়—এই মারাত্মক দুর্ব্বুদ্ধি সাহিত্যে সর্ব্বনাশের সূচনা করেছে। এখনি এর গতি রোধ না করলে, অচিরে প্রকৃতিস্থতা এবং বিচারবুদ্ধিই বাংলা দেশে অসঙ্গত বলে বিবেচিত হতে থাকবে। বাঙালী তোতা পাখীর জাত—তাকে যে বুলি ধরিয়ে দেওয়া যায়, সে তাই বলে, শুধু বলেই না, আসলে তোতা পাখী নয় বলে মনে মনে তাতে বিশ্বাসও করে। এ যে দল-বেঁধে মৎলব করে তৈরী করা একটা আন্দোলন এবং এর আসল লক্ষ্য যে জনসাধারণের অজ্ঞতাকে exploit করে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর প্রাধান্য বিস্তার করা, সে কথা স্পষ্ট করে খুলে বলার সময় এসেছে। নইলে

দিনের পর দিন এই সংক্রামক ব্যাধি ব্যাপকই হয়ে চলবে এবং এজন্যে প্রচুর পরিমাণ অকাণ্ডজ্ঞান এবং অসংলগ্নতা ছাড়া কিছুই দরকার হয় না বলে, অপরিণতবুদ্ধি ছেলে-মেয়ের জনতা এই পথে বেড়েই চলবে। তারপর বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে জনসাধারণের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে তা 'কোটারী' ভুক্ত একটা কপট বাক্-বিলাসে দাঁড়াবে।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। অতি-আধুনিক কবিতার বেশীর ভাগই লেখা হয় গদ্যে, কিন্তু গদ্যেই হক, আর পদ্যেই হক, বোধ্যতা কোথাও সুলভ নয়। কিন্তু কেন এই অবোধ্যতা? এঁরা, মানে এঁদের ইউরো-আমেরিকান গুরুরা বলেন, কথার যে একটা অর্থ থাকতেই হবে, তার কি যুক্তি আছে? পরের পর হ্রস্ব-দীর্ঘ, মিঠে-কড়া, স্বদেশী-বিদেশী শব্দ সাজিয়ে গেলে শব্দের পারস্পরিক সঙ্ঘাত থেকে আপনিই একটা সঙ্গীত জন্মায়—সেই সঙ্গীত মনের তারে ঘা দিলে যে অস্ফুট বা অপ্রবুদ্ধ অনুভূতি জাগে, তাই হচ্ছে খাঁটি জাতের কবিতার কাজ। এই অনুভূতি পাঠকের ব্যক্তিগত মনের উপাদান অনুযায়ী এক-একটা রূপ নেয় এবং এইখানেই হল এই সব কবিতার সার্ব্বভৌম আবেদন। বেশ কথা, কিন্তু ভাষা কি জন্যে? একটা কোন বক্তব্য বা অনুভূতি বা চিন্তা একের মন থেকে অন্যের মনে সঞ্চারিত করার জন্যেই ভাষা এবং ভাষার সঙ্গে বস্তু-বোধ যেহেতু অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, সেইজন্যে ভাষার মধ্যে বস্তুকেন্দ্রিক সঙ্গতি না থাকলে, পরস্পরের ভেতর ভাবিক যোগাযোগ রক্ষাও অসম্ভব। অর্থাৎ ভাষার শৃঙ্খলা এবং পারম্পর্য্য হরণ করলে, ভাবিত বস্তুও নিরুপাধিক হয়ে পড়ে এবং তা কোন লক্ষ্যেই পৌছুতে পারে না—ভাষার সার্থকতাই তাতে যায় লুপ্ত হয়ে।

এঁরা এই যুক্তি এড়াবার জন্যেই অবচেতন মনের দোহাই দেন। এবং বলেন, মনের গহনে পরস্পর-বিরোধী অগণ্য, অসংলগ্ন বস্তুপিণ্ড

জটলা করে আছে, তথাকথিত যুক্তিসিদ্ধ ভাষায় যখন আমরা কোন কিছু প্রকাশ করি, তখন আসল মনটা নকল ভাষার আড়ালে চাপা পড়ে যায়—তাতে আসে অর্থ, আসে সঙ্গতি, আসে চাতুর্য্য, মাধুর্য্য, অনেক কিছু বাইরের জিনিষ, কিন্তু ভেতরকার জিনিষটা আগাগোড়াই যায় বাদ পড়ে। সুতরাং ছন্দ ত চলতে পারেই না, এমন কি, অর্থটাও মনকে প্রকাশ করার পক্ষে একটা প্রচণ্ড বাধা। তাই অর্থহীন গদ্যকেই এঁরা কবিতার প্রকৃষ্টতম বাহন বলে স্বীকার করে নিয়েছেন—ঠিক এই মতই কাম্মিংস প্রমুখ কবি এবং স্যুর-রিয়ালিষ্ট চিত্রকরদের মুখেও আমরা একাধিকবার শুনেছি।

স্যুর-রিয়ালিষ্ট শিল্পীরা এই মতের পোষকতা করেই ছবিকে দুর্ব্বোধ্য করে তুলছেন এবং বলছেন যে, সর্ব্বাঙ্গীন প্রতিকৃতিতে মানুষের যে বহিরঙ্গিক আদলটা পাওয়া যায়, তা আদৌ সঠিক নয়। দর্শনীয় বস্তু এক-একজন দর্শকের মনোদৃষ্টিতে এক-এক রকম। সুতরাং শিল্পী তাঁর মনে যেটা যেভাবে দেখেন, তাকে আর্টের অভ্যস্ত প্রসিদ্ধি দিয়ে বাইরে রূপায়িত করতেই পারেন না, সেই জন্যে প্রসিদ্ধিকে সংহার করে, আবয়বিক সঙ্গতির সোজা রাস্তা ছেড়ে, তাঁরা এই 'মানস-অঙ্কনে'র পথে পা দিয়েছেন। এতে সাধারণ দৃষ্টিতে যা বিকট, কিম্ভূত বা অর্থহীন বলে ঠেকছে, আসলে তা হচ্ছে নাকি অবচেতন মনের রূপ! কাব্যেই হক, আর চিত্রেই হক, অবচেতনার এই দোহাই সাধারণকে যথেষ্ট ঘাবড়ে দিয়েছে। তাঁরা বিজ্ঞানের সূত্র ধরে সাহিত্য বা শিল্পকে বোঝেন না, সাহিত্য বা শিল্পের ভেতর থেকেই বিজ্ঞানকে বুঝতে চেষ্টা করেন—সুতরাং তাঁদের পক্ষে মনোবিজ্ঞানের এত বড় একটা দোহাই শুধু সম্ভ্রমেরই নয়, রীতিমতো ভয়েরও বিষয়।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানের নামে এই যে আন্দোলন চলছে, এর

ভেতরেও ফাঁকি রয়েছে। সত্যি সত্যিই কি অবচেতন মনে কোন চিন্তা-শৃঙ্খলা নেই? পরস্পর-বিরোধী বস্তুপুঞ্জের স্থান অবশ্যই মনে আছে, কিন্তু তারা একে অন্যের সঙ্গে তাল-গোল পাকিয়ে নেই। সভ্য মানুষের সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব, তার মননক্রিয়াকে কখনই অসংলগ্ন হতে দেয় না—এক মাত্র ব্যাধি, নিদ্রা, বা কোন রিপুতাড়িত মুহূর্ত্ত ছাড়া। এই জন্যেই Stream of Consciousness বা 'চেতনা-প্রবাহ' বলে যে কথাটি মানব-মন সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়ে থাকে, তা নিরর্থক নয়। অবচেতন মনের দোহাই দিয়ে বক্তব্যকে ধোঁয়াটে করে তোলা অযৌক্তিক ত বটেই, অবৈজ্ঞানিকও। অবচেতন মনে যাই থাক, তাকে চেতনের পর্দ্দায় যখন আনি, তখন তা কোন মতেই বিশৃঙ্খল থাকতে পারে না, যদি না সম্বিৎ আগে থেকেই কেন্দ্রচ্যুত হয়ে থাকে।)) কিন্তু বিপদ হয়েছে এই যে, বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার খাতিরেই বাংলা কবিতায় এই অবোধ্যতা আমদানী হয় নি—হয়েছে মুষ্টিমেয় ইউরোপ-আমেরিকার লেখকের অন্ধ অনুকরণে, তারপর সেই নির্জ্জলা ফাঁকিকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে সমর্থন করবার চেষ্টা হয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার জীবনে যে বিপর্য্যয় যুগধর্ম্মে দেখা দিয়েছে, সাহিত্যের কতকাংশও তার প্রভাবে বিপর্যাস্ত না হয়ে পারে নি। আমাদের দেশে হাট নেই, কিন্তু হট্টগোল আছে এবং অত্যুক্তির উঁচু দামে তাকেই বিকাবার উদ্যোগ চলছে। এরই নাম দেওয়া হয়েছে কাব্যে আধুনিকতা!

[৭] বিশ্বসাহিত্য ও নোবেল প্রাইজ

১৯৩৯ সালে সাহিত্যের জন্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ফ্রান্স এমিল সিলানপা। ইনি ফিনল্যাণ্ডের লোক এবং ঔপন্যাসিক। যে সময় ফিনল্যাণ্ড সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত, তার ভৌগোলিক অস্তিত্ব যখন আস্তে আস্তে ঐতিহাসিক হয়ে উঠছে, ঠিক সেই সময় তার একজন সাহিত্যব্রতী নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সম্মানিত হলেন। আমরা ফিনল্যাণ্ডের জন্যে সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়েই ছিলাম, সেই সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়েই সম্প্রতি তাঁর দু'খানা বই পড়লাম—Meek Heritage আর Fallen Asleep While Young। বলা বাহুল্য বই দু'খানি ভালোই লাগলো—নাগরিক সভ্যতাদৃপ্ত ইউরোপের সাহিত্যে পল্লীবাসী কৃষক ও দরিদ্র গৃহস্থের রূপ বড় একটা দেখা যায় না। অন্যতম নোবেল লরিয়েট রেমণ্ট এবং সিলানপাই বোধ করি এদিক থেকে এ যুগে কিছু নূতনত্বের সন্ধান দিয়েছেন। কিন্তু রেমণ্টের সঙ্গে সিলানপার তুলনা হয় না। রেমণ্ট অনেক উঁচুদরের লিখিয়ে। তাঁর সাহিত্যে সেই সুগভীর জীবন-বাণীর নির্দেশ আছে, যা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পক্ষে অপরিহার্য্য। সিলানপার লেখা বেশ ঝরঝরে, বেশ মিষ্টি—কিন্তু সেই বুদ্ধির দীপ্তি ও দৃষ্টির সূক্ষ্মতা তাতে নেই, যা ঘটনা বা চরিত্রের বাস্তব আবেদনকে অতিক্রম করে পাঠককে গভীরের অভিমুখে আকর্ষণ করে।

তাই বার বার মনে হতে লাগলো যে, বিপন্ন ফিনল্যাণ্ডকে আন্তর্জাতিক ভাবে সমবেদনা জানাবার জন্যেই বোধ হয় তার একজন

জনপ্রিয় সাহিত্যিককে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। আমি আগেই বলেছি যে সিলানপা ভালো লেখক—কিন্তু ভালো লেখক আর বড় লেখকে তফাৎ আছে। সিলানপা বড় লেখক নন, তাঁর সমান লেখক সব দেশেই, সব সাহিত্যেই আছেন রাশি রাশি—লোকে তাঁদের রচনা আগ্রহ করে পড়ে, পড়ে আনন্দও পায়, কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের আসরে তাঁদের কোন স্থান নির্দ্দেশ করতে যায় না। অবশ্য একথাও বলে রাখা দরকার যে নোবেল পুরস্কার যাঁকেই দেওয়া হয়েছে, তিনিই বড় সাহিত্যিক নন। বরং অনেক বড়কে বাদ দিয়ে অনেক ছোটকেও এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সে হিসাবে সিলানপার পুরস্কার-প্রাপ্তিতে অসঙ্গত কিছুই নেই অবশ্য। অনেক বারের মতো আর একবার অবাক হয়েছি, এই মাত্র।

১৯০১ সাল থেকে নোবেল প্রাইজ দিয়ে আসা হচ্ছে—মধ্যে দু' একবার শুধু ফাঁক গিয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময়ের ভেতর ইউরোপ আমেরিকার অনেক সাহিত্যিকই এই পুরস্কার পেয়েছেন, ভারতবর্ষকেও একবার দিয়ে বুড়ী ছুঁয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু এই দীর্ঘ তালিকায় এমন ক'টি নাম পাই, বিশ্ব-সংস্কৃতিতে যাঁদের দান অতুলনীয় বলে গণ্য হবার যোগ্য? এক নিঃশ্বাসে বলে যেতে পারি, ~~রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর~~, আনাতোল ফ্রাঁস, রোমাঁ রলাঁ, আঁরি বার্গসঁ, আর বড় জোর থিওডোর মমসেন, জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'। তাও এদের মধ্যে বার্গসঁ দার্শনিক এবং মমসেন ঐতিহাসিক—সাহিত্য বলতে সাধারণ ভাবে আমরা যা বুঝি, এঁরা তা রচনা করেন নি। এঁদের পরে ফেলতে পারি, মরিস মেটারলিঙ্ক, জেসিন্তো বেনাভাঁতে, ফ্রেডরিক মিস্ত্রাল এবং হেনরিয়েক সিনকোয়েভিচকে—যাঁরা আসলে দ্বিতীয় শ্রেণীর। কিন্তু তারপর? রাডিয়ার্ড কিপলিং, ন্যুট হামসুন, কার্ল স্পিটেলার, কার্ল জেলারূপ,

বিয়ার্ণষ্টার্ণ বিয়র্ণসেন, গ্রাৎসিয়া ডেলেড্ডা, সিগ্রিদ উন্দসেৎ···যাঁরা কেউই বড় লেখক বলে নোবেল প্রাইজ পাননি, নোবেল প্রাইজ পেয়েই বড় লেখক হয়েছেন !

রবীন্দ্রনাথ, রলাঁ বা আনাতোল ফ্রাঁস যে শ্রেণীর সাহিত্যিক, সে শ্রেণীতে স্থান পাবার মতো সাহিত্যিক অবশ্য কোন দেশেই দলে দলে জন্মাতে পারেন না। কিন্তু যে ব্যাপারে অনেককে এক পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়, সেখানে পরস্পরের ভেতর কোথাও-না-কোথাও এক ধরণের সমধর্ম্মিতা আছে বলেই আমাদের মনে করতে হবে। কিন্তু রলাঁর পাশে হামস্থন, রবীন্দ্রনাথের পাশে স্পিটেলার, আনাতোল ফ্রাঁসের পাশে কিপলিংকে বসানোর সত্যিই কি কোন সমর্থন আছে? ওঁরা কি এক পংক্তিতে স্থান পাবার যোগ্য? একথা অবশ্য ঠিক যে, মিস্ত্রালের চাষী-জীবনের কবিতাগুলি বেশ মধুর এবং মর্ম্মান্তস্পর্শী, বিয়র্ণসনের নাটকগুলি বেশ ধারালো এবং জোরালো, হামসুনের উপন্যাসগুলি বাস্তবতার স্পর্শে বেশ সজীব, কিপলিং-এর গল্প বা কবিতাগুলি বেশ কৌতুকপ্রদ এবং সুখপাঠ্য—কিন্তু John Christopher, কিংবা Crime of Sylvester Bonnard, কিংবা গীতাঞ্জলি হল সাহিত্যের যুগ-স্তম্ভ স্বরূপ। সাধারণ ভাবে এঁরা সকলেই সুলেখক, কিন্তু অসাধারণ কেউই নন,আর সেই জন্যেই এঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যা, তা সাম্প্রতিক জনপ্রিয়তার মাশুল নিয়েই শেষ হয়ে যাবে, পরে আর কিছুই থাকবে না। গলসওয়ার্দ্দি, ইয়েটস, শ,' সেলমা লেগারলফ বা টমাস ম্যান এঁদের হিসাবে অনেক বড়—তাঁদের মননশীলতা, জীবন ও জগত সম্বন্ধে দৃষ্টি ও অনুভূতির গভীরতা কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্তদের কাছাকাছি যায়।

কথা উঠবে হয়ত যে পুরস্কারটা প্রতি বৎসর দিতে হয়, কিন্তু প্রতি বৎসরই ত আর এক একটা দিকপাল সাহিত্যিক পাওয়া যায় না, সুতরাং

ওরই মধ্যে বাছাই করে দিতে হয় এবং দেশসম্বন্ধে অপক্ষপাত হতে হয় বলে, এক দেশের বড় লেখককে ছেড়েই আর এক দেশের ছোট লেখককেও কৌলীন্য দিতে হয়। নোবেল কমিটির সেক্রেটারী লিওনার্ড ভালই একবার সে কথা বলেছিলেন। কিন্তু এটা কথার কথা মাত্র—অপক্ষপাত বিতরণ যে হয় না তার প্রমাণ, এই পুরস্কারকে গত চল্লিশ বৎসর কাল শুধু ইউরোপ আর আমেরিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে—এশিয়ায় একমাত্র রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তিনি স্বয়ং ইংরেজীতে রচনার অনুবাদ করে ইংলণ্ড থেকে প্রকাশ করেছিলেন এবং সমসাময়িক ইউরোপীয় সাহিত্যিক-সমাজ তাঁকে বিধিমতো ভাবে প্রচার করেছিলেন, নইলে তাঁর লেখা যদি বাংলাতেই আবদ্ধ থাকতো, তাহলে এত বড় মনীষী হয়েও তিনি এ পুরস্কার পেতেন না। যেমন পাননি আরব কবি খলিল জিব্রান, বাঙালী ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র, উর্দ্দু সাহিত্যিক ইকবাল··· এঁদের মধ্যে জিব্রান লিখেছেন ইংরেজীতেই, শরৎচন্দ্রের অন্ততঃ তিনখানা বইয়ের অনুবাদ হয়েছে, শুধু ইংরেজীতে নয়, ফরাসী ও ইটালীয়ান ভাষায় এবং রলাঁ তাঁর প্রশংসাও করেছেন, ইকবালের কবিতা এবং দার্শনিক রচনাও বেশীর ভাগই ইংরেজীতে সুলভ। যতদূর জানি, এঁদের রচনা নোবেল কমিটির নিয়মানুযায়ী অনুমোদিত হয়ে পরীক্ষার্থ গিয়েও ছিল, কিন্তু ফল হয়নি। যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের ভেতর এঁরা অনায়াসেই স্থান পেতে পারতেন, বরং অনেকের ওপরই পেতেন, এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন—অথচ কেন এঁরা পেলেন না?

এছাড়া চীন আছে, জাপান আছে, মিশর আছে, তুরস্ক আছে। সে সব দেশেও বড় বড় কবি-সাহিত্যিক আছেন প্রচুর। জাপানের সাহিত্য ত ইউরোপ-আমেরিকায় বিশেষ সমাদরই পেয়েছে। নোগুচি

এবং কোমাই-এর কবিতা, কিনকুচির নাটক, সাকোয়ের উপন্যাস ইংরেজীতেই পড়েছি এবং যদিও আমার বিশ্বাস তা এমন কিছুই নয়, তবু অপক্ষপাত বিতরণের কথা উঠলে, অপরাপর লরিয়েটের তুলনায় আন্তর্জাতিক সম্মানে এঁদেরও দাবী এসে পড়ে বৈকি !

সুতরাং সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্য মন্থন করে, সব দেশের প্রতি সমদর্শিতা রক্ষা করে যে প্রাইজ বিতরণ হয় না, ওটা যে শ্বেতজাতির মধ্যেই যথাসম্ভব আটক রাখবার চেষ্টা হয়ে থাকে, একথা স্বীকার করতেই হবে। বলা অনাবশ্যক যে, এ নিয়ে আমাদের নালিশ নিষ্ফল। কৃষ্ণ ও পীত জাতির সম্বন্ধে শ্বেতজাতির সর্ব্বক্ষেত্রেই অবিবেচনা, এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম না হওয়াই বোধহয় ভালো।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ইউরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধেও এই প্রাইজ বিতরণে যথেষ্ট বিচারবুদ্ধি ও সমদর্শিতা অবলম্বিত হয় না। নোবেল প্রাইজের জন্মকালে ইংলণ্ডের সাহিত্যে ছিলেন হার্ডি, মেরিডিথ, সুইনবার্ণ, লরেন্স—তাঁদের ভেতর যোগ্যতম মনে করা হল কিপলিংকে, যিনি Barrackroom Ballads এবং Jungle Book লিখে প্রসিদ্ধ। যিনি 'টেস' বা 'ইমিগ্রাণ্ট' লিখেছেন, যিনি 'ইগোয়িষ্ট' লিখেছেন, যিনি লিখেছেন 'এটল্যাণ্টা ইন ক্যালিডন' এবং সেক্সপিয়ার ও ভিক্টর হুগোর ওপর জগৎবিখ্যাত সমালোচনা, যিনি লিখেছেন 'লেডী চ্যাটার্লীজ ল্যাভার' এবং 'প্যানসি'র প্রসিদ্ধ কবিতামালা, তাঁরা হলেন উপেক্ষিত, আর সাপ্তাহিক পত্রিকার পপ্যুলার লেখক কিপলিং হলেন বিশ্বসাহিত্যের আসরে সমাদৃত! ফ্রান্সেও ভার্লেন, ভেয়ারহারেন, মালার্মে ছিলেন, বোধ করি বদলেয়ারও ছিলেন—অতি-আধুনিক বাস্তবতাবাদের জন্মদাতা যাঁরা, তাঁদের ভেতর থেকে বেছে নেওয়া হল তত্ত্বকথার কবি স্যুলি প্রুধোঁকে এবং চাষী-

জীবনের (বার্ণসের অনুগামী?) কবি মিস্ত্রালকে। নরওয়েতে ছিলেন ইবসেন এবং এখনো আছেন জোহান বোয়ের—তাঁদের দাবী অগ্রাহ্য হল। যে ইবসেন পৃথিবীর নাট্য সাহিত্যে বিপর্যয় এনেছেন, ষ্ট্রিণ্ডবার্গ হন, বেনাভাঁতে হন, পিরেন্দেল্লো হন, শ' হন, সিঞ্জ হন, সকলেই যাঁর শিষ্যশ্রেণীর অন্তর্গত, তাঁকে বাদ দিয়ে বিয়র্ণসনকে যোগ্যতর বিবেচনা করা হল। (অথচ বিয়র্ণসনের লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই জানেন যে ইবসেন থেকেই তিনিও বস্তুতান্ত্রিক নাটকের উদ্দীপনা পেয়েছিলেন।) 'হাঙ্গার' লেখক হামসুন, 'গ্রেট হাঙ্গার' লেখককে টপ্‌কে গেলেন বিনা কারণেই। ইটালীতে কার্দ্দুচিকে প্রাইজ দেওয়া হল, দোনানজিও বাদ পড়লেন, জার্ম্মানিতে পল হেস্যে পেলেন, জেরাট হাউংম্যান পেলেন, কিন্তু হারম্যান জুভারম্যানের কথা উঠলো না! আমেরিকায় সিনক্লেয়ার লিউইস পুরস্কৃত হলেন, কিন্তু আপ্টন সিনক্লেয়ার, যিনি 'ব্যাবিট' রচয়িতার চেয়ে অনেক বড় লেখক, তাঁর কথা বিবেচিত হল না—ইলিয়ট এবং কার্ল স্যাণ্ডবার্গ, এ যুগের কাব্য সাহিত্যে যাঁদের প্রভাব সার্ব্বভৌম হতে চলেছে, তাঁদের নামও শোনা গেল না। সাধারণ নাট্যকার ইউজেন ওনেলকেই করা হল সম্মানিত।

তবু রাশিয়ার কথা তুলিই নি। শুনেছি, রাশিয়া নাকি নিজে থেকেই এই প্রাইজ নিতে অস্বীকৃত। তাই বোধ হয় নিরপেক্ষতার ভাণটা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে আধুনিক রাশিয়ার সাহিত্যিকদের তুলনায় দুর্ব্বলতম লেখক আইভান বুনিনকে একবার এই পুরস্কার দিয়ে দেওয়া হল। টলষ্টয় থেকে সুরু করে মাইকেল সোলোখব পর্য্যন্ত রুশ-সাহিত্যে যে সমস্ত প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছে, যার মধ্যে আছেন চেকভ, আন্দ্রিভ, কুপরিণ, গোর্কী, তার ভেতর **Gentleman From Sanfrancisco** বা **Well of Days** লেখকের স্থান কোথায়?

সোভিয়েট রাশিয়ার বহির্ভূত এবং ধনতান্ত্রিক ইউরোপে অবস্থিত বলেই বুনিনকে যোগ্যতার মার্কা দেওয়া হয়েছে, প্রতিভার জন্যে নয়—ডষ্টয়ভেস্কী, টুর্গেনিভ, গোগোলের দেশে তাঁকে প্রতিভা বলবার লোক উনবিংশ শতাব্দীতেও কেউ ছিল কিনা সন্দেহ!

এ পর্য্যন্ত যাঁরা নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দু' জন দার্শনিক—ইউকেন আর বার্গসঁ, আর একজন ঐতিহাসিক—মমসেন। বাকী সকলেই কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, নয়ত ছোটগল্প লেখক। তাঁদের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীতেই ভীড় সব চেয়ে বেশী—কিপলিং, সিলানপা, হিডেনষ্ট্যাম, এগজেল, পন্টোপিডান, জেলারূপ, ডেলেড্ডা, উন্দসেৎ—এঁরা সবাই ঐ শ্রেণীর। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এঁদের সমকক্ষ লেখক যে প্রচুর আছেন, নিতান্ত বাংলা বলেই আমরা তা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হই। দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাঁদের স্থান, তাঁদের ভেতর সিনকোয়েভিচ, ইচেগ্যারে, রেমণ্ট, বেনাভাঁতে, মেটারলিঙ্ক সবাই পড়েছেন, এঁদের একাধিক রচনা অসাধারণ না হয়েও ক্ল্যাসিকের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এঁদের পাশে কার্দ্দুচি, স্পিটেলার বা দুগারকে আমার ত নিতান্তই ম্লান মনে হয়। কার্দ্দুচির 'প্রাইমোভেরা' কাব্য, স্পিটেলারের 'অলিম্পিয়ান স্প্রিং' কাব্য এবং দুগারের 'থিবো' উপন্যাস হালে অনুবাদ হয়েছে—পড়ে হতাশ হয়েছি বলেই একথা বলছি। সত্যিকার বড় দৃষ্টি, মহৎ অনুভূতি বা বিরাট পরিপ্রেক্ষণী—যা টলষ্টয়ে, রবীন্দ্রনাথে, আনাতোল ফ্রাঁসে, রঁলায়, এমন কি গ্যালসওয়ার্দ্দিতেও পাই, এঁরা তার ধার দিয়েও যান নি। যে মনীষা, যুক্তি, বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের ক্ষুরধার ঔজ্জ্বল্য শ', ইবসেন, লরেন্স ইত্যাদিতে পাই—তাও এঁদের লেখায় নেই। এঁরা সাধারণ রোমাণ্টিক লেখক।

পরাধীন এবং অনগ্রসর দেশ আমাদের। ইউরোপের নামেই আমরা ভক্তিতে আর্দ্র হয়ে উঠি, তাই তার কাক-বক সকলকেই আমরা মনে

করি নমস্ক। নোবেল প্রাইজের ছাপ দিয়ে যে সমস্ত সাহিত্যিককে দুনিয়ার হাটে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, তাঁদের সকলকেই তাই আমরা পীর-পয়গম্বর মনে করে বসেছি। বস্তুতঃ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ত বটেই, খাস ইউরোপেই অ-নোবেলীকৃত সাহিত্যরথী অনেক ছিলেন, আছেন, এ কথা আমরা যেন না ভুলি। বার্গসঁ এবং ইউকেন সম্মানিত হয়েছেন বলে দার্শনিক রূপে ক্রোচে, বোসাঙ্কে, হোয়াইট হেড বা রাসেল তাঁদের চেয়ে ছোট নন—মমসেন নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন বলে ঐতিহাসিক রূপে জারিঞ্জভ, ট্রটস্কি, ল্যেম্যান, লুডভিগের আসন এক চুল নীচে নয়—টমাস ম্যান বা সিনক্লেয়ায় লিউইস নোবেল প্রাইজে ভূষিত হয়েছেন বলেই উপন্যাসে অলডাস হাক্সলি, ফষ্টার, প্রিষ্টল্যে বা আপ্টন সিনক্লেয়ারের হাত কিছু কম নয়—একথা মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, একটা দেশের একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠান তার সদস্যদের খেয়ালখুসী মতো বেছে বেছে যে সম্মান বিতরণ করে, তা নিরপেক্ষ নয়, সার্ব্বভৌম নয়, সর্ব্বক্ষেত্রে যোগ্য পাত্রে ন্যস্তও হয় না। অর্থাৎ নোবেল প্রাইজের অর্থ-মূল্য যথেষ্ট হলেও, সাংস্কৃতিক মূল্য অবিচার ও অপবিচারের দোষে গোড়া থেকেই নষ্ট হয়ে গেছে।

আমাদের দেশে ইদানীং বিশ্ব-সাহিত্য কথাটির একটু বেশী মাত্রায় ব্যবহার হয়ে থাকে—যে কোন রকমের বইকেই বিশ্ব-সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত বলে মত প্রকাশ করতে কারুর বাধে না। এ জন্যে অবশ্য কারুকে দোষ দিতে পারিনে—নির্ব্বিচারে নোবেল প্রাইজ বিতরণ করে অনেক অতি সাধারণ শ্রেণীর লেখককে বিশ্ব-সাহিত্যিকের স্তরে উন্নীত করে, ইউরোপই প্রথম বিশ্বসাহিত্যের Standard নামিয়ে এনেছে। ইউরোপের গুণগরিমায় হৃতদৃষ্টি আমরা আজ ঐ নিরিখেই বিচার করি, তাই আমাদের কাছেও বিশ্ব কথাটা কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে! কিন্তু বিশ্ব কথাটা

ছোট হলেও, জিনিষটা ছোট নয়—তার সাহিত্যও নেহাৎ অল্প নয়। কত সভ্যতার উত্থান হয়েছে, কত নূতন নূতন দৃষ্টি, চিন্তা, অনুভূতি যুগে যুগে মানুষকে দেশে দেশে করেছে সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ—প্রাচীন যুগে, মধ্যযুগে, আধুনিক যুগে কত প্রতিভার উদ্ভব হয়েছে, কত মহা রচনার অবিনশ্বর আলোকে মানুষের ইতিহাস উজ্জ্বলীকৃত হয়েছে। এই সুবৃহৎ ও সুপ্রাচীন বনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে মানুষের সংস্কৃতি—এরই নাম বিশ্ব-সাহিত্য। তার কতটুকুর খবর রাখি আমরা, আর তথাকথিত নোবেল কমিটির কর্তারা ?

চতুর্থ স্তবক : সাহিত্যবস্তু

[১] দীনবন্ধুর নাটক

বাংলার নাট্য-সাহিত্য এখনো শৈশবাবস্থা অতিক্রম করেনি। প্রাচীন পাঁচালী ও কথকতা থেকে যখন যাত্রার উদ্ভব হয়, তখন একজাতীয় নৃত্য-গীত ও বক্তৃতাবহুল নাটক লেখা হতো—সেগুলো সাহিত্যপদবাচ্য নয় নানা কারণে, কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্যের অগ্রদূত হিসাবে সেই সব 'কমলে কামিনী', 'উষাহরণ' জাতীয় গ্রন্থের কিছু মূল্য অবশ্যই আছে!

প্রকৃতপক্ষে রঙ্গালয়ের উন্নতির সঙ্গেই সত্যিকার নাটক লেখার সূচনা হয়। বাংলা ভাষার প্রথম নাটক হচ্ছে তারাচাঁদ সিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন'। তার এক বৎসর আন্দাজ পরে রামনারায়ণ তর্করত্ন 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' লেখেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম চলনসই নাটক হিসাবে এই বইটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। তদানীন্তন রুচি অনুসারে বইটি আদৃত হয়েছিল মনে করা যেতে পারে; কিন্তু শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের মতো বিশেষ কিছুই এতে ছিল না—তাই এ আজ গবেষণার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তবে তর্করত্নের রচনাশক্তি একেবারে ছিল না এমন নয়, 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্বে' বা 'নব নাটকে' স্থানে স্থানে প্রচুর কৌতুকের বস্তু আছে, যা দীনবন্ধুকে মনে করিয়ে দেয়। 'নববাবুবিলাস', 'আলালের ঘরের দুলাল', বা 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র যেমন বাংলা কথা-সাহিত্যের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে স্বীকৃতির মর্য্যাদা আছে, তেমনি তর্করত্নের বইগুলিকেও প্রথম নাটকীয় প্রচেষ্টা হিসাবে একটি ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যই দিতে হবে।

তখনকার 'জলধরপটলী' আবহাওয়ায় চলতি ভাষায় ঘরোয়া জীবনের ব্যাপার-বৃত্তান্ত নিয়ে আখ্যায়িকা বা নাটক লেখার সূত্রপাত হয়েছিল, এঁরাই তারি উদ্যোক্তা। কিন্তু এঁদের অবলম্বিত ধারা দেশে উপেক্ষিত হয়েছিল, বঙ্কিম-সাহিত্যই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কিন্তু এই ধারা মাইকেল ও দীনবন্ধুর ভেতর দিয়ে কতকাংশে চলতে থাকে। তখনকার অবস্থায় বহির্ঘটনার সঙ্ঘাতে অন্তর্বৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি ও তার অনুযায়ী চরিত্রের উত্থান-পতন ফোটানো, কোন বৃহৎ ভাবাদর্শ বা দর্শনবাদ প্রচার প্রভৃতি সাহিত্যের দৃষ্টিসীমার বহির্ভূত ছিল। এমন কি সাহিত্যকে একটা serious জিনিষই মনে করা হতো না—এই seriousness সৃষ্টি করেন মাইকেল ও বঙ্কিম। তাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তী আমলে সাহিত্যকে উপদেশ বিতরণ বা কদাচার বিদূষণের উপাদান বলে ভাবা হতো। বিদ্যাসাগর-চক্রের সমুদয় গ্রন্থ প্রথম উদ্দেশ্যে এবং পূর্ব্বোল্লিখ পর্য্যায়ের সমুদয় গ্রন্থ দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে লেখা। এই দুই ধারা পাশাপাশি বহুদিন চলেছিল—মাইকেল এবং বঙ্কিম তাদের মেলাবার চেষ্টা করেন, সেই চেষ্টায় দীনবন্ধুর দানও উপেক্ষণীয় নয়। বঙ্কিম এবং দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য বলে পরিচিত। কিন্তু বঙ্কিমের ওপর ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব স্পষ্টতঃ প্রায় দেখাই যায় না। দীনবন্ধু রুচির দিক থেকে কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের খাঁটি শিষ্য ছিলেন—যদিও গুরু ছিলেন কবি এবং শিষ্যের খ্যাতি প্রধানতঃ নাটক লেখায়।

বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য নাটক লেখেন প্রথম মাইকেল। 'কৃষ্ণকুমারী' নামক ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত নাটক লিখে, তিনিই প্রাচীন যাত্রাগন্ধী নাটকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন এবং নবতন ধারার নাটকের জাতকর্ম্ম সম্পাদন করেন। সুপণ্ডিত মাইকেল পড়েছিলেন দেশ-বিদেশের নাট্য-সাহিত্য, ইংরাজী এলিজাবেথীয় এবং রেষ্টোরেশন যুগের নাটক

—ফরাসী-জার্ম্মাণী নাটক—গ্রীক এবং সংস্কৃত নাটক—কিন্তু দেশে কোন পূর্ব্বতন ঐতিহ্যের আশ্রয় না পাওয়ায় serious নাটক তিনি মোটেই জমাতে পারেন নি। তাঁর নাটকগুলো আড়ষ্ট, বক্তৃতা-সর্ব্বস্ব। একটানা পড়াই যায় না। তার চেয়ে অনেক সুপাঠ্য মাইকেলের প্রহসন দুটি—'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা'। বলা বাহুল্য রুচির প্রশ্ন আমরা এখানে তুলছি না, যা এক সময়ে তুলেছিলেন রামগতি ন্যায়রত্ন।

এই দ্বিতীয় বইখানি দীনবন্ধুর প্রসিদ্ধ 'সধবার একাদশী'র একমেটে রূপ। শুনতে পাই, এই নাটকের নায়ক নিমচাঁদকে দীনবন্ধু মাইকেলের প্রতিরূপ করে এঁকেছিলেন। বস্তুতঃ মাইকেলের ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব নিমচাঁদে কতটা আছে সে কথা যোগীন বসু বলতে পারতেন, তবে তাঁর বইয়ের চরিত্র 'নববাবু' যে নিমচাঁদের অতি সন্নিকট পূর্ব্বপুরুষ তাতে আমার সন্দেহ নেই। তখনকার সাহিত্যে ছিল প্রচলিত দুটি ধারা—ইংরাজীনবিশ তরুণদের উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, আর প্রাচীনপন্থী গোঁড়াদের ভণ্ডামি বা কুসংস্কার নিয়ে রস-রসিকতা। 'নববাবু বিলাস', 'আলাল', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'অলীকপ্রকাশ' প্রথম উদ্দেশ্যে এবং 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রভৃতি দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে লেখা, 'হুতোমে' দুই ধারারই জয়জয়কার। বস্তুতঃ লক্ষ্য মাত্র এইটুকু ছিল বলেই এই বইগুলো স্যাটায়ার বা প্রহসনের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে নি। দীনবন্ধু কিন্তু শুধু স্যাটায়ার লিখে হাসাতে চাননি। তিনি নানা উদ্ভট চরিত্রের সমাবেশের ভেতর দিয়ে একটা বৃহৎ ব্যঞ্জনাতেই পৌঁছুতে চেয়েছেন—অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টির ভেতর ছিল শিল্পীক সমগ্রতা, যার ফলে 'সধবার একাদশী' প্রহসন হয় নি, হয়েছে রীতিমতো নাটকই।

'নীলদর্পণ' লিখে দীনবন্ধু প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন।

সেকালের সাহিত্য নীলদর্পণই একমাত্র বই যার লক্ষ্য ছিল প্রত্যক্ষ ভাবে সমাজহিত এবং সে লক্ষ্য আশাতীত রূপে সাফল্যও লাভ করেছিল। এমন কি এর ইংরেজী তর্জ্জমা বিলাত পর্য্যন্ত গিয়েছিল শোনা যায়। নীলকর সাহেবদের হাতে বঙ্গীয় কৃষককুলের লাঞ্ছনা নিয়ে এই নাটকের সূচনা। বোধহয় কৃষককে মর্য্যাদা দিয়ে সাহিত্য রচনা দীনবন্ধুর আগে বাংলাতে আর কেউ করেন নি। সেদিক থেকে 'নীলদর্পণ' একখানা land-mark—যদিও যে সাময়িক বিক্ষোভের বনিয়াদের ওপর এর স্থিতি, তা আজ নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়েছে এবং নীলদর্পণে চিত্রিত অত্যাচার-সমূহ আজ কোন সুদূর ঐতিহাসিক অত্যাচারের মতোই কৌতূহলো-দ্দীপক মনে হয়! জাতীয় চিন্তাধারার বিকাশ বা বিস্তারের সোপান হিসাবেই এর মূল্য।

বলাবাহুল্য সেটা বঙ্কিম যুগ। তখন রাজা-রাজড়া বা জমিদার নিয়েই সাহিত্যের [illegible]তী চলে, দরিদ্র সেখানে আসে ধনীর আমোদ-প্রমোদে যোগান দিতে, আসে কৌতুক সৃষ্টির সহায়তা করতে। তাদের দুঃখ, দৈন্য, ব্যথা, লাঞ্ছনা বা মান-অপমান তখন সাহিত্যিকের মনোযোগের বস্তু ছিল না। এর একটা কারণ বোধ হয় সে যুগের অধিকাংশ লেখকই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন বলে। কিন্তু ধন্যবাদ দীনবন্ধুকে, তিনি সরকারী বড় চাকুরে হয়ে এবং বঙ্কিমের চির-সুহৃদ হয়েও কৃষকের দুর্দ্দশা নিয়ে নাটক লিখেছিলেন!

অবশ্য নাটক হিসাবে নীলদর্পণ আজ অচল। হয়ত সেদিনও খুব সচল ছিল না। প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে আত্মহত্যা, সামনাসামনি নারীর ওপর বলাৎকার, সুদীর্ঘ প্রেমপত্র পাঠ প্রভৃতি নাটকীয় সংস্থানজ্ঞানের অভাব-সূচক বহু জিনিষ এতে আছে বলেই নয়—দীনবন্ধুর লক্ষ্য ছিল অত্যাচারের পরিমাণটা বোঝানো—তার তীব্রতা তাঁর মনে ছিল এত বেশী

স্পষ্ট হয়ে, যে একটা নিরবচ্ছিন্ন গল্পের ভেতর দিয়ে কথোপকথন, চরিত্র-চিত্রণ ও আখ্যান-বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবই হয় নি। তিনি কতকগুলো আপাত-নিঃসম্পর্ক ঘটনাংশ এক সঙ্গে গেঁথে দিয়েছেন—এতে কোন শ্রেণীর ঐক্যেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না—চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনা-বিন্যাস বা রস-সৃষ্টি, কোন দিকেই না। সুতরাং সামাজিক কল্যাণের দিক থেকে যত বড় দামই এর থাকুক, সাহিত্য হিসাবে এর দাম আজ ঐতিহাসিক ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

কথা উঠতে পারে, কোন সাময়িক সমস্যার ওপর উপন্যাস বা নাটক গড়লে, এক দিন সে দেশাচার বা পদ্ধতি বা ব্যবস্থা যখন গত হবে, তখন সেই সাহিত্যের মর্য্যাদাও লুপ্ত হবে কিনা। প্রসঙ্গক্রমে অনেকে শরৎ-চন্দ্রের গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করেন—পল্লীসমাজ, দেবদাস, বামুনের মেয়ে, চন্দ্রনাথ প্রভৃতির কথা ওঠে। অনেকে ইবসেনেরও নাম করেন। এঁরা বলেন, বৃহৎ সাহিত্য যা হবে, তার অন্তর্প্রেরণাও হবে সর্ব্বদেশ, সর্ব্বকাল, সর্ব্বজাতির পক্ষে চিরন্তন যে সব তত্ত্ব, তাই। অর্থাৎ দেশপ্রেম, পারমার্থিকতা, প্রণয় ইত্যাদি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিশ্বসাহিত্যের ক্ল্যাসিকগুলোর উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

এ কথা পুরোপুরি সত্য না হলেও, একেবারে অসত্যও অবশ্য নয়। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে সৃজনী-শক্তি নিয়ে। ইবসেনকে বা শ'কে কোন ভবিষ্যৎবাণীর দ্বারা একান্তভাবে আজকের গণ্ডীভুক্ত করা ঠিক কি না সন্দেহ। Mrs Warren s Profession বা Pillars of the Society কি একান্ত ভাবেই সাময়িক? খবরের কাগজে প্রত্যহ যে আহেলা খবরগুলি বের হয়, তাদের সঙ্গে ওদের কি কোথাও তফাৎ নেই? মানুষের রক্তাক্ত বাস্তবতার ঘাত-প্রতিঘাতে এদের বিষয়গুলি কি সার্ব্বজনীন নয়? কিছুটা রূপক বা নির্ব্বিশেষ মতবাদ হয়ত কোথাও কোথাও

থাকতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিক হানি তাতে বিশেষ কিছু হয়নি। বিশেষ করে শ' সম্বন্ধে ত একথাই ওঠে না। বলাবাহুল্য, দীনবন্ধুর বিচার করতে বসে আমরা ইবসেন বা শ'র তাঁর সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা করছি নে।

আমরা বলছি উদ্দেশ্যমূলক বা সাময়িকতামূলক নাটক যে একান্ত ভাবে সেদিনেরই হবে, তার কোন মানে নেই। সমাজব্যবস্থা থেকে তার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর আবেদন লুপ্ত হলেও, সাহিত্যিক ঐতিহ্য হয়ে তা লোককে চিরদিন আনন্দ দিতে পারে। যে ক্ল্যাসিকের কথা প্রতিপক্ষ বলেন, তাতেও বহু জিনিষ আছে, যা চিরন্তন নয়, একান্ত ভাবে তৎকালীন—কিন্তু তাদের একটা সাহিত্যিক স্বীকৃতি আমরা মেনে নিই। নীলদর্পণ সম্বন্ধে তা পারি না, 'বামুনের মেয়ে' সম্বন্ধে পারি, 'সধবার একাদশী' সম্বন্ধে পারি—তাহলে তফাৎ কোথায়? তফাৎ শিল্প-শক্তির তারতম্যে।

বঙ্কিম নীলদর্পণকে 'উৎকৃষ্ট কাব্য' বলেছেন এবং Uncle Tom's Cabinএর সঙ্গে তুলনা করেছেন, এ-নিয়ে আমাদের ঝগড়া নেই। Uncle Tom's Cabin-কেও সাহিত্য হিসাবে আমরা এমন কিছু মনে করি না, যদিও সমাজ ব্যবস্থায় তার উপযোগিতা নীলদর্পণের চেয়েও বেশী কাজ করেছে জানি। তাহলে প্রশ্ন আসে, সাহিত্য কি সমাজ-নিরপেক্ষ? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গে নিরর্থক। তবে Utilityর মাপকাঠিতে সাহিত্যের নিরিখ কষার আমরা পক্ষপাতী নই এবং গণ-সাহিত্য, শ্রেণী-সাহিত্য ইত্যাকার শ্রেণী-বিভাগও ন্যায়সঙ্গত মনে করি না। সুতরাং এ-দিক থেকে সাহিত্যের মূল্য স্বীকার করতেও প্রস্তুত নই। নীলদর্পণ উৎকৃষ্ট নাটক একথা আমাদের মতে অত্যুক্তি—যদিও বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ধারা-বিবর্ত্তনে এত বেশী সহায়তা আর কোন বইই করেছে কিনা সন্দেহ।

যদি 'সধবার একাদশী'র কথাই ধরি, আমরা দেখতে পাই নীলদর্পণের সঙ্গে তার পার্থক্য শুধু প্লটে নয়, পদ্ধতিতে। নীলদর্পণের অবলম্বিত প্রসঙ্গ আজ অচল হয়েছে, নিমচাঁদ, কাঞ্চন বা ঘটিরামও আজ সমাজ-জীবনের সামনের দিকে নেই। কিন্তু সাহিত্যে নিমচাঁদ, কাঞ্চন ও ঘটিরাম অপরিবর্তনীয় রয়েছে। এর কারণ এদেরকে লেখক শুধু বাইরে থেকে রং ফলিয়ে আঁকেননি—এদের ভেতরকার রূপটি তিনি বাইরের পরিবেশে স্পষ্ট করে এঁকেছেন। অর্থাৎ আর্টের দিক থেকে এরা সত্য হয়ে উঠেছে। এই সত্য হয়ে ওঠা যে কি করে হয়, তা ব্যাখ্যা করে বোঝানো কঠিন। মাইকেলের প্রহসনের নববাবু, তার বন্ধু অটল এবং পয়োধরী নাম্নী গণিকার সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত তিনটি চরিত্রের তুলনা করুন, অনায়াসেই মনে হবে, মাইকেল কাগজের ফুল গড়েছেন, কিন্তু দীনবন্ধু আসল বনের ফুল ফুটিয়েছেন, সে ঘেঁটু ফুল হতে পারে, কিন্তু তা সাঁচ্চা জিনিষ।

যাঁরা সাহিত্যকে কেবলমাত্র উদ্দেশ্যের দিক থেকে গ্রহণে অভ্যস্ত, তাঁরা শিল্পাংশকে ছোট করে দেখেন—শিল্প তাঁদের মতে লাউয়ের বোঁটার মতো, ধরে আনার সুবিধার জন্যে তার প্রয়োজন। কিন্তু আমরা মনে করি, ম্যাক্সিম গোর্কির উপন্যাস বা শ'এর নাটক শিল্পাংশেই প্রধান, মতবাদ তাদের অন্তর্লগ্ন জিনিষ—সেটা বিশ্লেষণের জিনিষ, উপভোগের ক্ষেত্রে তার কদর নেই। সুন্দরীর রূপের একটা মৌলিক অর্থ আছে, আর একটা আছে তার যৌগিক অর্থ। যৌগিক অর্থ যার ষোল-আনা চিত্তবৃত্তিকে দখল করে আছে, সে ত সন্ন্যাসী—কারণ সে জানে রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জার সমাবেশ ছাড়া এতে আর কিছুই নেই। মতবাদ ঠিক এই রকমের জিনিষ—সাহিত্যের ক্ষেত্রে ওটা থাকে শিল্প-বস্তুর অভ্যন্তরে। ওটাই যদি প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকট হয়ে ওঠে, তবে তা আর সৃষ্টি হয় না।

প্লেটোর 'কথোপকথন' বা ল্যাণ্ডরের 'কাল্পনিক আলাপ-আলোচনা' আর ইবসেনের Pillars of the Society বা শ'এর Mrs. Warren's Profession তাই এক জিনিষ নয়। অথচ আমরা হামেশাই নাটক বা কথা-সাহিত্যের বিচারে তার অবলম্বিত মতবাদকেই প্রধান করে তুলি—শিল্পের কথা চাপাই পড়ে যায়।

যাঁরা দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র অনুরাগী, তাঁরা এতে ইংরাজী-নবীশদের চাককানো হয়েছে বলেই খুসী। ঘটিরাম ডেপুটির বোকামি, কাঞ্চনের শিকার ধরার কৌশল বা আনুষঙ্গিক উপকরণগুলোই তাঁদের চোখে বড়, যেমন বড় 'নীলদর্পণে'র রোগ সাহেবের অত্যাচার ও ক্ষেত্রমণির দুর্দ্দশা। তাঁরা সাহিত্যের মূল্য কষেন এই দিক থেকে। দুঃখের বিষয় এ-দিক থেকে সাহিত্য-বিচার উনবিংশ শতাব্দীর রীতি। হাস্যরসের দোহাই দিলেও অব্যাহতি নেই এ যুগে। আমার ভালো লাগে দীনবন্ধুকে এই জন্যে যে, যে সহানুভূতি ও দৃষ্টিপ্রসারতায় এই নিমচাঁদ প্রভৃতিকে তিনি এঁকেছিলেন, তার ভেতর ছিল না রুচিবাগীশের বিদ্বেষ-কলুষিত অসূয়াবোধ—অথবা (বঙ্কিমসুলভ ধর্ম্মের নামাবলী ঢাকা দিয়ে অন্যায়পণার সমর্থন।) 'এই হয়' বা 'এই হয়েছে' দেখানোই দীনবন্ধুর বইয়ের বড় কথা, 'এই হওয়া উচিত' বলে তিনি হাহাকার করেন নি। এটা সম্ভব হয়েছে যেহেতু দীনবন্ধু এ-সব চরিত্রকে বাস্তব থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এবং তাদের সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ভাবে তাঁর অনুরক্তিই ছিল। মানুষকে তিনি মতের চেয়ে অনেক বড় করে দেখতেন। প্রাচীনপন্থী হক, আর নবীনপন্থী হক, তাতে তাঁর বড় বেশী যেতো আসতো না। হয়ত গোড়ায় দীনবন্ধু চেয়েছিলেন 'একেই কি বলে সভ্যতার'ই একটা দ্বিতীয় পর্য্যায় লিখতে—কিন্তু খানিক দূর গিয়েই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠেছে এবং তাঁর আক্রমণবৃত্তিকে প্রতিরোধ করে, তারা

দোষে-গুণে সত্যকার মানুষ হয়ে উঠেছে—বাংলা ভাষার আর কোন নাটকেই যা হয়নি তাঁর আগে। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা সাদৃশ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'য় গোড়ার দিকটায় একটা তরল কমিক সুর আছে—মনে হয় কবি যেন বিদ্রূপ করছেন, কিন্তু কিছুদূর গিয়েই অমিত এবং লাবণ্য রীতিমতো serious হয়ে দাঁড়ালো ঠিক এই ভাবে। ইউরোপীয় নাট্য-সাহিত্যের এই আধুনিক দৃষ্টিটুকু দৈবক্রমে দীনবন্ধু আপনা থেকেই পেয়েছিলেন। অবশ্য আধুনিক বলতে আমি ইবসেন, স্ট্রিণ্ডবার্গ বা শ', গ্যালসোয়ার্দির কথা বলছিনে—বলছি মলেয়ার, শেরিডন প্রভৃতির কথা। হয়ত দীনবন্ধু কিছু পড়েও ছিলেন, কিন্তু মাইকেলও পড়েছিলেন!

ব্যাপার এই যে নাটক হচ্ছে একান্ত ভাবে objective সৃষ্টি—ঘটনা বা বহিরঙ্গিক সঙ্ঘাত তার চরিত্রগুলোকে যে দিকে নিয়ে যাবে, লেখক তাদের সেই দিকে যাবার সুবিধা দেবেন মাত্র। নিজের মতানুযায়ী পথে হাঁটাতে গেলেই তাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হবে, তারা মতের বাহন হবে, মানুষ হবে না। এই সূক্ষ্ম নাটকীয় বোধ বাংলা সাহিত্যে বিরল। গিরিশ ঘোষ বা দ্বিজেন্দ্রলাল এ-দেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন, গিরিশ ঘোষের পৌরাণিক ও দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের কথা ছেড়ে দিই—ওগুলোর আর দিন নেই। দু'জনের দু'খানি প্রসিদ্ধ সামাজিক বই ধরি—'প্রফুল্ল' আর 'পরপারে'। এদের সঙ্গে সধবার একাদশীর তুলনা করলেই দেখা যাবে, দীনবন্ধু অনেক বড় শিল্পী। গিরিশ ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রলাল দু'জনেরই মাথায় ছিল আদর্শ—টাইপ আঁকার মোহে তাঁরা সম্ভাব্যতার সঙ্গে শিল্পেরও গলা টিপে মেরেছেন। দীনবন্ধু কোন মোহের অধীন হননি, অথবা মোহকে অতিক্রম করার দুর্লভ শক্তি তাঁর ছিল। 'সধবার একাদশী' সেইজন্যেই এত উৎরেছে।

গিরিশ ঘোষ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল দু'জনেরই প্রধান দোষ হয়েছে টেকনিক নির্ব্বাচনে। শেক্সপিয়ারকে আদর্শ করে নাট্যরচনায় হস্তক্ষেপ করায় তাঁদের দৃষ্টি Romantic নাটকের গণ্ডীর বাইরে আসেনি—কিন্তু সামাজিক নাটকে ও টেকনিক চলতে পারে না। ফাঁকা কবিত্বের উচ্ছ্বাস ও বর্ণনাত্মক দীর্ঘ বক্তৃতা প্রভৃতি সামাজিক নাটকের পক্ষে প্রাণহানিকর যাবতীয় জিনিষে উভয়েরই ছিল মারাত্মক রকম আগ্রহ। গিরিশ ঘোষের নাটকে আছে 'নাটুকেপণা'র বাহুল্য, দ্বিজেন্দ্রলাল পক্ষান্তরে Epigram ও কবিত্বের আতিশয্যে অভ্যস্ত! বস্তুতঃ এঁদের দু'জনের কারুর বইয়েই সত্যকার মানুষের সাক্ষাৎ মেলে না—মেলে নাট্যকারদেরই সাক্ষাৎ। প্রত্যেক চরিত্রের ভেতর দিয়ে তাই রচয়িতাদের স্বকীয় ব্যক্তিত্ব বা মতবাদই প্রকাশ পেয়ে যায়। নাট্যকারের স্বকীয়তা জিনিষটা থাকে প্রচ্ছন্ন—অবলম্বিত নাটকের পাত্র-পাত্রীর কথা ও কাজের ভেতর দিয়েই নাটকের ঘটনা, পরিবেশ ও দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠবার কথা। এলিজাবেথীয় রঙ্গমঞ্চের দৈন্য বশতঃ তখনকার নাট্যকাররা পাত্র-পাত্রীর কথাবার্ত্তার ভেতর দিয়েই দর্শককে স্থান, সময় ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত করতেন। এঁরা সেইটাকে একটা mannerism করে তুলেছিলেন—তাছাড়া স্বাভাবিকতা জিনিষ এঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সধবার একাদশীতে এই মাত্রাজ্ঞানের ও উপস্থাপিত চরিত্রগুলির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

অবশ্য আজকের দিনে দীনবন্ধুর রুচি আমাদের বিরক্তি উদ্রেক না করে পারে না—মনে হয় আতিশয্য ও অশ্লীলতা বিষয়ে তাঁর ওজন-জ্ঞান একটু কম ছিল, এবং এজন্যে ঈশ্বর গুপ্তকেই দোষী করতে হয়—গুড়গুড়ে ভটচার্য্যিকেও ছাড়তে পারা যায় না। তাঁরাই ছিলেন এ-বিষয়ে পথ-প্রদর্শক স্বরূপ। কথা অবশ্য ঠিক যে সাধারণ বাঙালী চরিত্র এর

খুব উর্দ্ধে এখনো ওঠেনি। এখনকার সাপ্তাহিক পত্রিকার সমালোচনাতেই তার পরিচয় মেলে। দীনবন্ধুর অপরাপর বইগুলোর মধ্যে 'জামাই বারিক' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' অতি জঘন্য রকম অশ্লীল ও নোংরা—'লীলাবতী' এবং 'নবীন তপস্বিনী'ও রীতিমতো যাত্রামার্কা। সুতরাং দীনবন্ধুকে পরবর্ত্তীকাল যদি মনে রাখে ত রাখবে 'সধবার একাদশী'র জন্যেই।

[২] বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস

রোহিণীর প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে। রোহিণীর চরিত্রকে উপলক্ষ করে বঙ্কিম যে সমস্যার অবতারণা করেছিলেন, সমাজ-ব্যবস্থায় আজও তা অব্যাহত রয়েছে—কিন্তু বঙ্কিম যে ভাবে এর সমাধান করেছিলেন, তা ইতিমধ্যেই প্রায় ঐতিহাসিক হয়ে গেছে। কিন্তু কেন ?

রোহিণীকে যে ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, তাতে তার ওপর আমরা আদৌ রুষ্ট হতে পারি না—বরং তার সম্পর্কে বঙ্কিমের অন্যায়াচরণই আমাদেরকে সমধিক পীড়া দেয়। রোহিণী বাল-বিধবা—নারী-জীবনের যে মুহূর্ত্তটিকে বলা হয়ে থাকে বিশেষ মুহূর্ত্ত, সেই বয়সে আমাদের সমাজ জোর করে তার ওপর বসিয়ে দিয়েছিল পবিত্রতার লেবেল। কিন্তু রোহিণীর চিত্তে এর বিরুদ্ধে ছিল একটি প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ—অসৎ চরিত্র হরলাল তাহাকে বিবাহ করার প্রলোভন দেখিয়ে, এই বীজাকার বিদ্রোহকে অংশতঃ অঙ্কুরিত করে তুলেছিল—এরই ফলে রোহিণীর উইল-চুরি। উইলের জন্যেই রোহিণী উইল চুরি করে নি—রোহিণীকে লেখক ততটা খেলো করে আঁকেন নি—সে করেছিল হরলালের জন্যে। তার পর ধরাপড়া ও প্রকাশ্যভাবে অপমান। এই অপমান রোহিণীর জীবনের তত বড় ট্র্যাজেডি নয়, যত বড় ট্র্যাজেডি হরলালের প্রত্যাখ্যান।

তারপর রোহিণীর অবস্থা স্বাভাবিক মানুষের মতো নয়—বন্ধন-মুক্ত বুভুক্ষা তাকে উন্মাদ করলো। এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে তার চোখে পড়লো গোবিন্দলাল—তাকে রোহিণী চাইলো আত্মসাৎ করে নিতে। কিন্তু

গোবিন্দলাল ছিল ভ্রমরের আত্মহীন একনিষ্ঠ ভালোবাসায় কেন্দ্রবদ্ধ—কাজেই রোহিণীর সামনে একমাত্র পথ আত্মহত্যার। সেই বাঁকাপথে রোহিণীর সঙ্গে গোবিন্দলালের মুখোমুখি দেখা—তার পরিণাম গোবিন্দলালের মানসিক কেন্দ্রচ্যুতি।

ভ্রমর ছিল আবেগ-সর্ব্বস্ব। রূপ তার ছিল না—যেটা ছিল, তা গোবিন্দলালের চাক্ষুষ মোহ। রোহিণীর অনিন্দ্য রূপ তাই গোবিন্দলালের রক্তে চাঞ্চল্য আনলো—গোবিন্দলালের জীবনেও জাগলো বিদ্রোহ। ভ্রমর এই বিক্ষোভের মুখে অপটু কাণ্ডারীর মতো হাল ছেড়ে দিলে—অভিমান করে সে গেলো বাপের বাড়ী চলে—গোবিন্দলাল গেলো রোহিণীর আয়ত্তে।

রোহিণীর জীবনের ট্র্যাজেডি ন্যায্যতঃ এখানেই শেষ হবার কথা। যে নিষ্ফল দুরাশা রোহিণীকে তার সুপরিচিত আবেষ্টনীর ভেতর থেকে নিয়ে এলো দুর্গমের দিকে, তাই যখন অপ্রত্যাশিতভাবে হল সার্থক, তখন রোহিণীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া সুরু হল না—কাজেই ভ্রমর বা গোবিন্দলালের জীবনে যে অনিবার্য্য পরিণতি দেখা দেবার কথা, তাও হয়ে রইলো সুদূরপরাহত। রোহিণী প্রসাদপুরের কুঠীতে বিলাসিনী হয়ে রইলো, ভ্রমর বাপের বাড়ীর নিভৃত কক্ষে আশাহতা প্রোষিতভর্ত্তৃকা হয়ে রইলো। আর গোবিন্দলাল হয়ে দাঁড়ালো উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী।

কিন্তু এই মহা সঙ্কটের চড়াই উৎরানোর পথে যে বিরাট অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হবার কথা, বঙ্কিম তাকে অতি সহজেই মীমাংসা করে ফেললেন। রোহিণীর চোখে সহসা এনে ফেললেন নিশাকরকে···ফলে গোবিন্দলাল তাকে গুলি করলো। তার পর অনুতপ্ত পলাতক অধঃপতিত গোবিন্দলালকে এনে ফেললেন জ্যোৎস্নালোকিত অতি-নাটকীয় সমারোহমণ্ডিত ভ্রমরের মৃত্যুশয্যার পাশে। এর পর তার সন্ন্যাস।

অর্থাৎ রোহিণী যদি এই আখ্যানের কেন্দ্র-শক্তি হয়, ত তাকে আশ্রয় করে ভ্রমর ও গোবিন্দলালের জীবন যে দুর্য্যোগময় আবর্ত্তনের ভেতর দিয়ে অখণ্ড পরিণতিতে পৌছুবার কথা, লেখক হয় তা আন্দাজ করতে পারেন নি, নয় তা ইচ্ছা করেই প্রতিরোধ করেছেন। ফলতঃ একদিকে রূপ ও আর একদিকে হৃদয়াবেগ···এই দুইয়ের বিপুল আকর্ষণের ভেতর গোবিন্দলালের নির্ভরশীল মন যে পরিমাণ বিক্ষুব্ধ হবার কথা, তা না হওয়ায় তার চরিত্রে সম্ভাব্যতা স্ফূর্ত্ত হয় নি। সে যেন গল্পের প্রয়োজনে যোগান দিয়ে চলেছে—তার প্রয়োজনে গল্প এগুচ্ছে না।

ভ্রমরকে অবশ্য লেখক অনেকটা কাগজের ফুল করেই এঁকেছেন, কাজেই তার জীবনে দ্বন্দ্বের অভাবকে আমরা হিসাবের মধ্যেই ধরি না। স্বামীর অপরিমিত ভালবাসা যেদিন তার কাছে সন্দেহের বিষে নীল হয়ে উঠলো, সেদিন সে কাঁদলো···সে অভিমান করলো···সে বিদ্রোহের অভিনয় করলো, কিন্তু সত্যিকার বিদ্রোহ করতে পারলো না···কারণ তার আত্মায় ছিল না বিদ্রোহের পুঁজি···বস্তুতঃ কোন পুঁজিই ছিল না তার। গতানুগতিক ধারায় গোবিন্দলাল তাকে অবলম্বন করেছিল—এই অবলম্বন সাগ্রহ আশ্রয়-গ্রহণ নয়···কারণ গোবিন্দলালের রুচি পরস্পর-বিরোধী আকর্ষণের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ছিল না···যেই সেই পরীক্ষা এলো, গোবিন্দলাল যেন ইচ্ছা করেই ঝাঁপিয়ে পড়লো···ভ্রমর তাকে রুখতে পারলো না, চেষ্টা করলো না, বরং পরোক্ষ ভাবে সমর্থনই করলো। কারণ ভ্রমর প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে নিজেকে নিষ্প্রভ বুঝলো, সুতরাং অক্ষমের অস্ত্র অভিমান, সে তারি শরণাপন্ন হল। অতএব শেষকালে ভ্রমরের সতীত্ব-মাহাত্ম্য ফোটানোর জন্যে বঙ্কিমকে অত বেশী প্রয়াস করতে হল···আর গোবিন্দলালকে গৈরিক পরানো ছাড়া উপায়ান্তর রইলো না! অর্থাৎ ভ্রমর বা গোবিন্দলাল কারুর মধ্যেই বঙ্কিম সত্যিকার মানবত্ব আরোপ

করতে পারলেন না! গোবিন্দলালের সামনে দুটো রাস্তা ছিল—হয় গ্রহণ নয় বর্জ্জন, ভ্রমরেরও তাই—হয় পোষণ নয় বিদ্রোহ! কিন্তু এরা ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে রইলো এবং একে মরে ও অপরে ফেরার হয়ে অব্যাহতি পেলো!

কিন্তু রোহিণী? তার দিক থেকে প্রতিক্রিয়া সুরু হওয়া স্বাভাবিক ছিল গোবিন্দলালের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধিতে—নিজের আদর্শের বিলুপ্তি ও বাস্তবের ব্যর্থতায় তার ট্র্যাজেডি। কিন্তু বঙ্কিম সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রেখেছেন, রোহিণীর প্রতি যাতে কারুর সহানুভূতি না জাগে, কারণ সে ভ্রষ্টা! অতএব হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে ব এই প্রাচীন প্রবচনানুযায়ী সে উত্তরোত্তর ইন্দ্রিয়ানুগামী হল এবং অপমৃত্যুতেই তার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হল! বঙ্কিমের মতে এই হল poetic justice এবং এই উপন্যাসে বঙ্কিম যে মোটা কথাটা বলতে চাইলেন, তা হল এই যে ইন্দ্রিয়াসক্তি অত্যন্ত মন্দ জিনিষ··· বিধবার পদ-স্খলন অতি ভয়াবহ···অতএব সাবধান।

বলাবাহুল্য তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা আমাদের অভিপ্রায় নয়, শুধু আর্ট হিসাবে তাঁর এই সর্ব্বাপেক্ষা পরিণত বইখানাও যে অসার্থক, এইটুকু দেখানোর জন্যেই এই বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

এর থেকে মোটের ওপর আমি যা প্রতিপন্ন করতে চাইছি তা হচ্ছে এই যে বঙ্কিমের মধ্যে শিল্পী অপেক্ষা সংস্কারকেরই প্রাবল্য ছিল বেশী। তাঁর শিল্পী-মন যে সমস্ত চরিত্রকে তাঁর আখ্যানের অঙ্গরূপে কল্পনা করতো, তাঁর সংস্কারক মন তাদের নিজের পথে হাঁটতে না দিয়ে আপন আদর্শের পথে হাঁটাতো—তাই তাদের মধ্যে আসে নি ব্যক্তিত্ব, এসেছে লৌকিকতার অন্ধ অনুবৃত্তি। মানুষ তাই বঙ্কিমের হাতে যন্ত্রবদ্ধ···তার

স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি তাই নৈর্ব্যক্তিক আচারের দ্বারা প্রতিহত, শিক্ষক বঙ্কিম তাই শিল্পী বঙ্কিমকে প্রতি মুহূর্ত্তে পরাভূত করে চলেছেন।

আমরা দেখেছি, প্রতাপ-শৈবলিনীর একনিষ্ঠ ভালোবাসার মধ্যেও বঙ্কিম একই অবাঞ্ছিত উপায়ে চন্দ্রশেখরকে এনে ফেলেছেন, একদিকে সহস্র প্রলোভনময় মুহূর্ত্তেও প্রতাপকে অবিচলিত রেখে, তাকে 'দধীচির গৌরব' দিতে উদ্যত হয়েছেন, অন্যদিকে সাময়িক চিত্তবিক্ষোভ শৈবলিনীকে আশ্রয় করায়, তাকে নরক দর্শন না করিয়ে বঙ্কিমের Nemesis-প্রীতি নিরস্ত হয়নি। এসবের মূলেও ঐ একই রকম আদর্শবাদ—মানুষকে মানুষরূপে না দেখে, তাকে কতকগুলি আদর্শের বাহন করে দেখা। বস্তুতঃ দেশাচারের অকুণ্ঠ অনুবর্ত্তনের খাতিরে শিল্পকে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করার ইচ্ছা বঙ্কিমের কেন হয়েছিল, কোথায় তার মূল, সে কথা বিশেষভাবেই আলোচনার যোগ্য।

যে যুগে বঙ্কিমের আবির্ভাব, সেটা জাতীয় জীবনের পক্ষে একটা ওলট-পালটের যুগ। ইংরেজাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীয় আদর্শ দেশে এসেছিল, দেশীয় আদর্শ তখন বহু বিক্ষোভে বিপর্য্যস্ত, ঘূর্ণ্যমান নীহারিকাপুঞ্জের সেই নিরবলম্ব শূন্যতাকে পরিহার করে দেশ তখন ঝাঁপিয়ে পড়ছিল বিদেশীয় আদর্শের কঠিন মৃত্তিকার দিকে। ফল যা হবার তাই হয়েছিল—নকল সাহেবিয়ানা সাময়িকভাবে দেশকে আচ্ছন্ন করেছিল—আচারে-ব্যবহারে, কথায়-কাজে, চিন্তায়-চেষ্টায় বাঙালী তখন উঠে-পড়ে লেগেছিল সাহেব হতে! অর্থাৎ অতীতের ধ্বংসাবশেষকে ধূলিসাৎ করে ভবিষ্যতের সৌধকে গড়ে তুলতে। কিন্তু সেটা যে শূন্যে সৌধ-নির্ম্মাণ তা বঙ্কিমই স্পষ্ট করে উপলব্ধি করেন এবং তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণাও প্রধানতঃ এইখানে। তিনি বুঝলেন, একান্তভাবে বিদেশীয় অনুকরণে

জাতীয় স্বাতন্ত্র্য মারা যাবে, তার শিক্ষা সংস্কৃতির স্বকীয়তা লুপ্ত হবে। সুতরাং কিসে জাতিকে বড় করে তোলা যায় এই হল তাঁর লক্ষ্য।

এই লক্ষ্যে বদ্ধদৃষ্টি হয়েই তিনি জাতীয় ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে লাগলেন—আদর্শকে মহান করে, স্পষ্ট করে, তীব্র করে ফোটাতে লাগলেন—ক্ষুদ্র দুঃখ-দৈন্য ব্যথা-বেদনাকে অগ্রাহ্য করে, বৃহৎ কল্যাণের দিকে চোখ রেখে সাহিত্যের ভেতর দিয়ে প্রচারের কাজে লাগলেন। কিন্তু বর্ণহীন নীরস প্রচার-কার্য্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না, এটা বোঝার মতো দূরদর্শিতা তাঁর ছিল, তাই তিনি উপন্যাসের আশ্রয় নিলেন। বাংলায় তখন উপন্যাস ছিল না—সীতার বনবাস, কাদম্বরী, টেলিমেকস্‌ জাতীয় উপকথা ছিল, আর ছিল নব বাবুবিলাস, আলালের ঘরের দুলাল, জাতীয় খেলো স্যাটায়ার। তাই তিনি দেশে কোন ঐতিহ্যের আশ্রয় পেলেন না, তাঁকে ধার করতে হল বিদেশের কাছেই। আদর্শস্বরূপ তিনি বেছে নিলেন স্যার ওয়াল্টার স্কটকে, যদিও ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ্জ এলিয়ট তিনি পড়েছিলেন তার প্রমাণ আছে। নানাদিক থেকেই স্কট তাঁর ওপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করলেন…তাঁরই আদর্শে বঙ্কিম ঐতিহাসিক উপন্যাস দিয়ে সূচনা করলেন। শৌর্য্য, মহত্ত্ব, ত্যাগ, তিতিক্ষা প্রভৃতি মহৎগুণের দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি যাদের গড়ে তুললেন, তারা আসলে রাংতামোড়া মাটির পুতুল হলেও সেকালে তাদের উপযোগিতা কম ছিল না। দেশাত্মবোধ নামক পদার্থকে প্রাত্যহিক চিন্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার কাজে তারা প্রচুর সহায়তা করলো, আর করলো পূর্ব্বকথিত উপকথা ও স্যাটায়ার…এ দুয়ের মাঝখানে সংযোগ স্থাপন। অর্থাৎ উপন্যাস সাহিত্যের কাঠামোটা গড়ার কাজ বঙ্কিম একাই প্রায় শেষ করে গেলেন।

বঙ্কিমের দেশাত্মবোধ বাঙালী সংস্কৃতির পক্ষে অতি বৃহৎ দান সন্দেহ

নেই, যদিও তা ত্রুটি-হীন নয়। যে সন্তানদল হরে মুরারে বলতে বলতে নিরীহ কোম্পানীর সিপাই মারে, আবার বন্দেমাতরম্ বলতে বলতে কাঁদে, তাদের আমরা কোনদিন প্রত্যক্ষ জগতে দেখবো আশা করি না। যে দেবীরাণী সহস্র সহস্র ডাকাতের ওপর সর্দ্দারি করে জলে-স্থলে তুমুল হট্টগোল করে বেড়ায়, তাকে পুকুর ঘাটে বাসন মাজতে দেখলে নিশ্চয় আঁৎকে উঠবো। অবশ্য এই 'নিষ্কাম' কর্ম্মবাদের জন্যে বঙ্কিম স্কটের কাছে ঋণী নন—দেশীয় কৃষ্টিও এ বিষয়ে তাঁকে বড় বেশী সাহায্য করে নি। এর পেছুনে ছিল হিন্দু কলেজের শিক্ষা—রিচার্ডসন, ডিরোজিওর প্রভাব! মিল-বেন্থাম, রুসো-ভলটেয়ার, কোঁৎ—উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির এই ত্রি-ধারার প্রভাবে দেশে যে একটা যৌগিক ভাবাদর্শ গড়ে উঠেছিল, সেই রসায়নের সঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে গীতা মিশিয়ে তিনি দেশীয় ইতিহাসকে বাঁচিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্ম্মতত্ত্ব' এই চেষ্টার প্রকট রূপ, আর আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এর প্রচ্ছন্ন রূপ। বস্তুতঃ ও দুইই এক জিনিষ—লক্ষ্য দুয়েরই জাতিকে মানুষ করে তোলা, রস-পরিবেষণ করা নয়। প্রয়োগের দিক থেকে এ ব্যবস্থা যে বেশ সময়োপযোগী হয়েছিল, তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই।

সীতারাম শ্রেণীর Despotদের রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করে, বঙ্কিম এই কথা বলতে চেয়েছিলেন যে জাতীয়তার সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অপরিহার্য্য। সেই স্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টান্ত হিসাবেই ইতিহাস-গন্ধী এই সব চরিত্র বা এদের বিপরীত-পন্থী নিষ্কামধর্ম্মী সন্ন্যাসীরা বঙ্কিমের কল্পনায় প্রাধান্য লাভ করেছিল। এ দুয়ের সমবায়ে তিনি চেয়েছিলেন জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপন করতে। বস্তুতঃ সত্যিকার দেশ-প্রেমিক বা সত্যিকার সন্ন্যাসী প্রত্যক্ষ জীবনেই পাওয়া যায়, কিন্তু বঙ্কিম তাদের সংগ্রহ করেছিলেন কল্পনা থেকে, তাই তারা শুধু আদর্শ হয়েছে, মানুষ হয় নি। বলা বাহুল্য

বঙ্কিম সাহিত্য মূলতঃ উদ্দেশ্যমূলক বলেই এ সব কথা বলছিনে—এখন নিঃসংশয়িতরূপেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে এলিজাবেথীয় নাট্যসাহিত্যও ছিল মোটের উপর উদ্দেশ্য-মূলক—হিউগো থেকে আরম্ভ করে গোর্কি, হামস্থন, আপটন সিনক্লেয়ার পর্য্যন্ত সেরা ঔপন্যাসিকও সবাই উদ্দেশ্যকে সাহিত্যে রীতিমতো প্রবেশাধিকার দিয়েছেন। আমাদের বক্তব্য এই যে উদ্দেশ্য বা সমস্যা সাহিত্যে থাকে জীবদেহে কঙ্কালের মতো, বিশ্লেষণের সাহায্যে তাদের খুঁজে বের করতে হয়—কিন্তু যে সব জায়গায় এই কঙ্কালগুলো তাদের বিকট প্রত্যক্ষতা নিয়েই উপস্থিত থাকে, সে সব সৃষ্টি যে ব্যর্থ, তা না বলে উপায় কি? অর্থাৎ সোজা করে বললে এই বলতে হয় যে সন্ন্যাসই হক, দেশাত্মবোধই হক, কোনটাতেই বঙ্কিমের আত্মার যোগ ছিল না—তাই এরা কেউ তাঁর সাহিত্যের অঙ্গীকৃত হয়ে যায় নি!

আর সত্যিকার আদর্শের দিক থেকে দেখলেও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ দেশাত্মবোধ বা প্রবৃত্তি-নিরপেক্ষ সন্ন্যাসকে অবাস্তব বলেই মনে করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি যে বঙ্কিম সাহিত্যের উৎস হচ্ছে Ethics, Aesthetics নয়। কাজেই তিনি অবিমিশ্রতাকে অস্বীকার করতে পারেন নি—তাই তাঁর সাহিত্যে দারিদ্র্যের বিন্দুমাত্র আভাস নেই, বরং সে সম্বন্ধে বক্রোক্তির আতিশয্য আছে, প্রবৃত্তির সঙ্ঘাতে মানুষের রক্তাক্ত বাস্তবতা নেই, আছে অলৌকিক উৎকর্ষের মাহাত্ম্য! এ জন্যে যুগ-ধর্ম্ম কিছুটা দায়ী সন্দেহ নেই, কিন্তু লেখকের চিত্ত-ধর্ম্ম কি আদৌ দায়ী নয়? বস্তুতঃ ডিকেন্স বা থ্যাকারে তাঁর মনে অণুমাত্র দাগ কাটতে পারেন নি কেন? সাহিত্যের ভোজে তিনি আসল মানুষকে অনাচরণীয় বলে মনে করতেন বলেই কি এমনটি হয় নি? কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসে খানিকটা কাহিনী-সৃষ্টির অবকাশ হয়ত আছে। সামাজিক উপন্যাসে এ টেকনিক একেবারেই অচল। রাষ্ট্রের ব্যাপক ক্ষেত্র

থেকে গৃহের সংক্ষিপ্ত গণ্ডীতে এসেও বঙ্কিম তাঁর দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন নি—তাই তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলিতে আমরা দেখি তাঁর হৃদয় যে দিকে যেতে চাইছে, তাঁর সংস্কার তার উল্টো দিকে যেতে চাইছে। তাই মনোরমা-পশুপতি সমস্যা ও গোবিন্দলাল-রোহিণী সমস্যার মধ্যে মূলতঃ আমরা কোন বিরোধ দেখি না।

বলা বাহুল্য আমরা বিংশ শতাব্দীর বস্তুতন্ত্র বা প্রজ্ঞাবাদকে বঙ্কিম সাহিত্যের ভেতর থেকে খুঁজে বের করতে উদ্যত হই নি। তাহলে ডিকেন্স, থ্যাকারেরই বা নাম করবো কেন? আমরা বলছিলাম, সাহিত্যের সার্থকতা জীবনের দিক থেকেই—সে জীবন নিরন্ন দরিদ্রেরই হক, আর বিলাস-লালিত অভিজাত-বর্গেরই হক, তাই নিয়েই উপন্যাস। মতবাদ তার ভিতর অজস্র থাকতে পারে, বর্ণনা-বিশ্লেষণের প্রচুর অবকাশ থাকতে পারে, তবু তার ভেতর সত্যিকার জীবন থাকা চাই—যে জীবন ঘটনার আবর্তে চঞ্চল, বিরোধের আঘাতে ক্রিয়াশীল, সম্ভাব্যতার স্পর্শে জীবন্ত। টেকনিক নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে যত লড়াইই থাক, উপন্যাসের প্রাণ-বস্তু সম্বন্ধে এটুকু কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই মাপকাঠি নিয়ে বঙ্কিম-সাহিত্য বিশ্লেষণ করলেই আমরা বঙ্কিমের দৃষ্টির ভেতর সমগ্রতার অভাব দেখতে পাই, যার ফলে জীবনকে তিনি সত্যের দিক থেকে দেখতে পারেন নি, সত্যকে দেখেছিলেন জীবনের দিক থেকে। তাই জীবন তাঁর সাহিত্যে হয়েছে গৌণ গোছের, সত্যই হয়েছে মুখ্য। এর ফলে তাঁর সাহিত্য অনেক স্থানেই শিল্প হতে পারে নি।

কিন্তু এখানে বলা দরকার যে এই প্রবন্ধে আমরা বঙ্কিমের অগৌরব ঘোষণা করতে উদ্যত হই নি। রসের দিক থেকে বিচার করলে, এক যুগের সাহিত্য আর এক যুগের প্রসন্নদৃষ্টি থেকে অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েই থাকে। কিন্তু তাই বলে জীবনের ওপর তার প্রভাব কে অস্বীকার

করবে? (জাতীয় সংস্কৃতিকে গড়ে তুলে, মানুষের দৃষ্টি ও চিত্তবৃত্তিকে বৃহত্তর সম্ভাবনার নির্দ্দেশ দিয়ে, সে যুগের সাহিত্য তার কাজ শেষ করে গেছে। আজকের সাহিত্য যে সুযোগ ও অনুকূল আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট হতে পেরেছে, সে যুগের সাহিত্য তা পারে নি—কিন্তু সেই বনিয়াদের ওপরই যে এযুগের সাহিত্যের ইমারত সংস্থিত, এ কথা মেনে না নিয়ে উপায় কি?) বিশেষ করে আমাদের মনে রাখতে হবে, বিগত শতাব্দী বলতে আমাদের দেশে বুঝায় একা বঙ্কিমকেই—যিনি বনিয়াদই স্থাপন করেন নি, একটা চলনসই গৃহও গড়ে তুলেছিলেন। তাই আর্টের দিক থেকে বঙ্কিমের উপন্যাস সম্বন্ধে আমরা যে অভিমতই আজ পোষণ করি না কেন, কৃষ্টির দিক থেকে আমরা বঙ্কিমকে সর্ব্বান্তঃকরণেই স্বীকার করতে বাধ্য।

[৩] বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস—দ্বিতীয় কিস্তি

১৩৪৩ শ্রাবণ সংখ্যার 'পরিচয়ে' আমি 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' নামে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখি। পরিচয় ত্রৈমাসিক থেকে মাসিকে রূপান্তরিত হওয়ায়, আয়তনের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাকে প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত করতে হয়। কাজেই আমার সমুদয় বক্তব্য বিস্তারিত করে উক্ত প্রবন্ধে বলতে পারি নি, কতকগুলো কথা সূত্রাকারেই রেখে যেতে বাধ্য হই—ইচ্ছা ছিল, পরে আর একটি প্রবন্ধে সেগুলোর বিশদ আলোচনা করবো। ইতিমধ্যে আশ্বিন সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদে ঐ নামেই একটি প্রবন্ধ পরিচয়ে লিখে, আমাকে পুনরায় বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনার সুযোগ দিলেন, এ জন্যে তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ!

কিন্তু শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ পড়ে আমি আদৌ খুসী হতে পারলাম না—তিনি আমার প্রতিবাদ করেছেন বলে নয়, আমাকে স্কুলের পড়ুয়া জ্ঞানে নানাবিধ মোহধ্বান্তনাশন উপদেশ দিয়েছেন বলে নয়—লেখক যে প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেছেন, সে প্রবন্ধই আগাগোড়া হৃদয়ঙ্গম করেন নি বলে। বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি শুনবার মতো সহিষ্ণুতা অবশ্য সকলেরই থাকবার কথা, এবং প্রতিপক্ষ মাত্রকেই অরসিক বলে ঘোষণা করার মতো বর্ব্বরতাও কারুরই না থাকা সমীচীন, কিন্তু যে প্রতিবাদ কেবলমাত্র প্রতিবাদের জন্যেই, যার পেছুনে নেই কোন গঠন-মূলক উদ্দেশ্য, নেই কোন বিচারবুদ্ধিসম্মত সিদ্ধান্ত—যা গতানুগতিক বিশ্বাসের দ্বারা পুষ্ট এবং ততোধিক গতানুগতিক ভাষায় উচ্ছ্বাসে-ভাবাবেশে সঞ্জীবিত, তাকে প্রতিবাদ বলে মনে করি কি করে?

লেখক তাঁর প্রতিবাদের একেবারে গোড়ার দিকেই 'যুক্তি পরম্পরা' নিয়ে একটু গর্ব্ব প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তাঁর সমগ্র প্রবন্ধের ভেতর যুক্তি-শৃঙ্খলার অভাবই যে সব চেয়ে বেশী পীড়াদায়ক হয়েছে, এ কথা অপ্রিয় হলেও না বলে উপায় নেই। তিনি ধরে নিয়েছেন আমার প্রবন্ধে বঙ্কিমের বিরুদ্ধতা করা হয়েছে—অতএব বঙ্কিম-সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গদেশের সনাতন মনোভাব যা, তারই অনুসরণে তিনি মাত্রাবোধ লঙ্ঘন করে, মূল প্রবন্ধের বক্তব্যকে বিকৃত করে, নানা স্থানে অর্দ্ধ-উক্তি উদ্ধৃত করে, উক্ত প্রতিবাদ খাড়া করেছেন। গোয়ালে বাঘ ঢুকতে দেখে 'হিন্দু ধর্ম্ম গোল্লায় গেলো' বলে কাঁদার মতো, বঙ্কিম-সাহিত্যের ওপর সমালোচকের অস্ত্রাঘাত মাত্রেই আঁৎকে ওঠার লোক দেশে অনেক আছেন—তাঁরা সম্মিলিত ভাবে দল পাকালে মদ্বিধ সমালোচকের পার্থিব অস্তিত্বই বিলুপ্ত হতে পারে, কিন্তু তাতে ত কোন সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয় না, কোন বিরুদ্ধ যুক্তিরও খণ্ডন হয় না। এই ধর্ম্মধ্বজিতার উর্দ্ধে উঠে বঙ্কিম, মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতি তদানীন্তন সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে আজকের লেখক যদি বিরুদ্ধ সমালোচনাতেই প্রবৃত্ত হন ত তাতে হাহাকার করবার কি আছে, অনেক ভেবেও তা স্থির করতে পারি নি। সাহিত্য ত নির্গুণ ব্রহ্ম নয়, যে তার পক্ষে পরিবর্ত্তনটা অপ্রাসঙ্গিক হবে! আর তা হলেও উত্তেজনা বশে প্রতিপক্ষকে বিদ্রূপ না করে, তাঁর সঙ্গে শিষ্ট রীতিতে তর্কে প্রবৃত্ত হবার সে জন্য কি প্রত্যেকেরই থাকা উচিত নয়?

অবশ্য সুবোধবাবুর সঙ্গে বিবাদ চালানোই আমার উদ্দেশ্য নয়। বঙ্কিম-সাহিত্য তাঁর হয়ত অত্যন্ত প্রীতির বস্তু, হয়ত তিনি বঙ্কিমের রচনায় এমন কিছু পেয়ে থাকবেন যা তাঁকে চিরদিনের মতো সম্মোহিত করে রেখেছে, যার ফলে তাঁর বিশ্লেষণী-শক্তি বঙ্কিমসম্পর্কে চিরনিরস্ত

হয়ে গিয়েছে! কাজেই তাঁর উষ্মায় আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইনি। আমি এইটুকুই বলতে চাই যে আমার মূল বক্তব্য কি সেটা প্রণিধান করার চেষ্টা না করে, আমার বক্তব্যের শাখা-প্রশাখাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে নিয়ে, এ ধরণের অসংলগ্ন প্রতিবাদ তিনি উপস্থিত না করলেও পারতেন!

(আমার বক্তব্য ছিল এই যে বঙ্কিমের মধ্যে শিল্পী অপেক্ষা সংস্কারকের প্রাবল্য ছিল—তাঁর সাহিত্য প্রধানতঃ উদ্দেশ্যমূলক এবং সে উদ্দেশ্য সর্ব্বত্রই এত সুস্পষ্ট যে রস-বোধকে ক্ষুণ্ণ করে, সম্ভাবনীয়তাকে লঙ্ঘন করে, বাস্তবতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে, তা সর্ব্বত্রই আদর্শের প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়ে থাকে। আমি বলতে চেয়েছিলাম, উপন্যাসের পক্ষে এ ত্রুটি অতি মারাত্মক)—কারণ অবাস্তবতার চোরাবালিতেই প্রধানতঃ এই ধরণের আখ্যায়িকার তরী অতর্কিতে বানচাল হয়ে থাকে এবং তাই হয়েছে কৃষ্ণকান্তের উইলে, দেবীচৌধুরাণীতে, আনন্দমঠে। সব বই নিয়ে বিশদ আলোচনা আমি করিনি—তার উপযুক্ত অবকাশও ছিল না আমার। শুধু কৃষ্ণকান্তের উইল নিয়েই আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং তাতে মোটা কথা যা বলতে চেয়েছি, তা হচ্ছে এই যে ভ্রমর, রোহিণী ও গোবিন্দলাল, এই তিন জনকে উপলক্ষ করে যে ত্রি-মুখী দ্বন্দ্বের ওপর এই উপন্যাসের স্থিতি, তার মধ্যে দুষ্টক্ষত রূপে প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে বঙ্কিমের তথাকথিত নৈতিক শুচিতা-প্রীতি—অর্থাৎ বিধবা রোহিণীর পদস্খলনের যতই সমর্থন থাক, তাকে ছাড়া হবে না, গোবিন্দলাল যে পথেই হাঁটুক, শেষটা তাকে অনুতপ্ত হয়ে সন্ন্যাস নিতেই হবে, ভ্রমরের প্রাত্যহিক জীবন যতই বিশেষত্বহীন হক্, তার ভেতর দিয়ে অসাধারণ সতী-মাহাত্ম্য ফোটাতেই হবে! এই যন্ত্রবদ্ধ আদর্শবাদের ফলে সমস্ত চরিত্রই চলেছে অস্বাভাবিক পথে, তাদের প্রারম্ভ ও পরিণতির মধ্যে নেই সামঞ্জস্য, নেই অনিবার্য্যতা! (মনে হয়েছিল, শিল্প-সৃষ্টির দিক থেকে

এর চেয়ে অসার্থকতা আর কিছুই হতে পারে না। কারণ শিল্পী সমাজ-সংস্কারক নন, তা হবার দরকারও নেই তাঁর।

লেখক মহাশয় এতেই রুষ্ট হয়েছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি ত কৈ প্রতিপন্ন করতে পারেন নি যে বঙ্কিম সত্যিই ওস্তাদ শিল্পী। বরং পরোক্ষ ভাবে তিনি যে সমস্ত অংশ বঙ্কিম থেকে উদ্ধৃত করেছেন শিল্প-সৃষ্টির নিদর্শন হিসাবে, তাতে বঙ্কিমকে ত তিনি আমার চেয়ে ঢের বেশী খেলোই করে ফেলেছেন! বস্তুতঃ ফাঁকা ভাবোচ্ছ্বাস বা তথাকথিত কবিত্বই যদি তাঁর মতে 'রস' হয় ত আমি নারাজ। কিন্তু আমার ত এই বিশ্বাস যে সংসাহিত্যের পক্ষে এর চেয়ে ক্ষতি-কারক আর কিছুই নেই!

আসল কথা, কাব্যের রস ও উপন্যাসের রস ঠিক এক জাতীয় হবার কথা নয়, হয়ও না। উপন্যাসের সঙ্গে বাস্তবতার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ, সুতরাং প্রত্যক্ষ সংসারের পটভূমিতেই তার প্রাণবস্তু নিবদ্ধ। এই প্রত্যক্ষতাকে সজীব, সুন্দর, মনোজ্ঞ করে ফোটানোই হচ্ছে উপন্যাসের আর্ট। সে আর্টে বঙ্কিমের উৎকর্ষ কদাচিৎ দেখা গেছে। বঙ্কিম মানুষকে তাঁর নীতিজ্ঞান ও আদর্শের বাহন করে এঁকেছেন, কাজেই তারা নামে মানুষ, আসলে তারা অবাস্তব চিত্র। এই অবাস্তবতাকে কি বারুণী পুষ্করিণীর বর্ণনা দিয়ে, বা ভ্রমরের যৌবনপুষ্ট নিটোল লাবণ্যের বর্ণনা দিয়ে ঢাকা যায়? বা তথাকথিত রসিকতার জোরে তাকে রক্ষা করা যায়? এ যে তাঁর উপন্যাসের প্রাণ-গত দৌর্ব্বল্য! বরং এই নীতিবোধ-পরিচালিত আবহাওয়ায় কবিত্বের আবাদই যেন আরো বিসদৃশ বলে মনে হতে থাকে।

বঙ্কিম-সাহিত্যের এই মৌলিক ত্রুটির উৎস কোথায়, তাও আমি প্রথম প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করেছিলাম। অবশ্য তাতে বঙ্কিম-সাহিত্য রক্ষা পায়

না, কিন্তু বঙ্কিমের সমর্থন হয়ে যায়। কিন্তু এখানেই প্রতিবাদ-কর্ত্তার সঙ্গে আমার সত্যিকারের বিরোধ। সংস্কারক বঙ্কিমকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং মনে করি বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে তাঁর স্থান অনেকের উর্দ্ধে—সাহিত্যের সাহায্যে জাতি-গঠনের কাজে তিনি যে সাফল্য লাভ করেছেন, তা হয়ত শিলার প্রমুখ জার্ম্মান লেখকদেরই অনুরূপ। অবশ্য তাঁদের সমপর্য্যায়ভুক্ত শিল্পী তিনি নন—কারণ শিল্প-সৃষ্টির পথে তাঁর প্রধান অন্তরায় ছিল চিত্ত-ধর্ম্ম।

বঙ্কিম ইংরাজ রাজত্বের প্রথম গ্রাজুয়েট এবং তৎকালীন তরুণ-সমাজের মুখপাত্র হলেও, তাঁর চিত্তে ছিল কাঁটালপাড়ার কুলীন সমাজের তথাকথিত গোঁড়ামি। তাই বঙ্কিম মদ্যপান করলেও এবং পাশ্চাত্য আদর্শে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান না বলে, আদর্শ মানব বললেও, বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তনের অজুহাতে কিন্তু বিষবৃক্ষে স্পষ্ট করেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মূর্খ বলেছিলেন। আর শশধর পণ্ডিত মহাশয়ের সহযোগে হিন্দুত্বের পুনরভ্যুত্থানের সেই সব রোমাঞ্চকর প্রপ্যাগাণ্ডা চালিয়েছিলেন! এই শিক্ষা ও সংস্কারের দ্বন্দ্বেই বঙ্কিম-চিত্ত ভরপূর ছিল···তিনি সমগ্র জীবনেও এর সুস্পষ্ট সমন্বয় করতে পারেন নি। ফরাসী আদর্শে যিনি 'সাম্য' লিখেছিলেন এবং গোস্বামী আদর্শে 'প্রচার' চালিয়েছিলেন, তাঁর আদর্শ-বিপর্য্যয় ত সহজেই ধরা যায়। এইখানেই তাঁর উপন্যাস-সাহিত্যের বীজ নিহিত। তিনি উপন্যাস গড়তেন বিলিতি ধাঁচায়, কিন্তু তা ধারণ করতো দেশী চেহারা। দেবীরাণীই হক, আর সন্তান দলই হক, তাঁর কল্পনায় এসেছিল সাগরপার থেকে—কিন্তু কাঁটালপাড়ার বঙ্কিম তাঁদের এক জনকে পুকুরে বাসন মাজিয়ে, অপরদের 'হরে মুরারে' বলে কাঁদিয়ে তবে ক্ষান্ত হয়েছেন। এরই নাম অবাস্তবতা।

এই বৈসাদৃশ্যের সমাধান-কল্পে প্রতিবাদ-কর্ত্তা কি বলতে চান?

তিনি সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চেষ্টা না করে, শিল্পে ও সংস্কারে জগাখিচুড়ী পাকিয়ে বঙ্কিম যে অদ্ভুত পরমান্ন প্রস্তুত করেছিলেন, তা বিশ্লেষণ করে আমাদের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করে দিলেই পারতেন।

বঙ্কিমের এই অন্তর-হিন্দু বহির্সাহেবী মনোভাবের উদাহরণ হিসাবে আর একটা কথা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে। সেটা আমার প্রতিবাদের অঙ্গ না হলেও, আমার প্রতিপাদ্যের অনুপূরক হবে আশা করি। বঙ্কিম-সাহিত্যে যেখানেই স্ত্রী-পুরুষের প্রণয় সম্বন্ধ সমাজ-নির্দ্দিষ্ট ধারার বিরুদ্ধে যায়, সেখানেই তিনি প্রধানতঃ দুটি কৌশলের আশ্রয় নেন—হয় শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হয়ে যায় যে নায়িকাগুলি নায়কগুলির পূর্ব্ব-বিবাহিত স্ত্রী—যেমন মতিবিবির ব্যাপার, ইন্দিরার ব্যাপার, দেবীরাণীর ব্যাপার, শান্তির ব্যাপার···আর নয়ত ভ্রষ্টা অপবাদ দিয়ে নায়িকাকে নরকে নিক্ষেপ করে, অথবা হত্যা করে (এবং নায়ককে সন্ন্যাসী করে) বঙ্কিম গোলমালের নিষ্পত্তি করে ফেলেন—যেমন শৈবলিনীর বা রোহিণীর ব্যাপার! কিন্তু এই বিশেষ কৌশল দুটি বঙ্কিমকে এমন করে পেয়ে বসেছিল কেন? তিনি বিদেশীয় উপন্যাসের আদর্শে প্রণয়-বৃত্তান্ত নিয়ে উপন্যাস ফাঁদতেন, কিন্তু তাঁর সনাতনী মন শিউরে উঠতো সমাজের কথা ভেবে। অম্নি তিনি গঙ্গাজলে নিষিদ্ধ মাংসকে শোধন করে নেওয়ার মতো বিবাহের বা সন্ন্যাসের নামাবলী মুড়িয়ে তাকে ঢাকা দিতেন—যদিও সত্যিকার সুনীতি এতে রক্ষা পায়নি—যেখানে তারও উপায় থাকতো না, সেখানেই তিনি দণ্ড ধারণ করতেন। কিন্তু এই দণ্ড নায়ক-নায়িকাদের ওপর না পড়ে, তাঁর শিল্প-সৃষ্টির ওপর পড়ে তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলতো! জগতে পরস্পরের অজ্ঞাত পূর্ব্ববিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর প্রণয় এমন পায়কারি রেটে আমদানি করার মতো উদ্ভট ব্যাপার আর কি হতে পারে? তা ছাড়া, যে কোন

সমাজ-বিরুদ্ধ প্রেমের পরিণামই লোমহর্ষণ হয়, এ কথাই বা কে বলতে পারেন ?

এই জিনিষকেও বলা যেতে পারে বঙ্কিমের আদর্শ নিষ্ঠা এবং তাঁর উপন্যাসের অবাস্তবতা। বাস্তবতা কথাটায় প্রতিবাদ-কর্ত্তার দেখলাম ঘোরতর আপত্তি। তিনি কি বলবেন, এখনও এ কথাটা তাঁর কাছে খুব ধোঁয়াটে ঠেকছে ? সমাজহিতে বা বিশ্বহিতে কি ব্যবস্থা প্রযোজ্য, সে চিন্তা উপস্থিত ক্ষেত্রে দূরে সরিয়ে রেখে, শুধু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখা যাক, জগতে প্রতিনিয়ত কি ঘটে বা ঘটেছে ! এই ঘটা-না-ঘটার ওপরই উপন্যাস ! কাজেই কুলটা হলেই অগ্নি ডুকরে ওঠাও যেমন ভুল, সন্ন্যাসী হলেও ধেই ধেই করে নৃত্য করা তেম্নিই ভুল ! স্বাভাবিক উপায়ে সাহিত্যে কুলটা আসে আসুক, সন্ন্যাসী আসে আসুক—কিন্তু জগতের উদ্ধার সংসাধনের জন্যে বা পাপের সঙ্গে পুণ্যের তফাৎটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্যে দুয়ের যে কোনটার আমদানিই রস-সাহিত্যের পক্ষে অর্থহীন। কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে বঙ্কিমের লক্ষ্য মূলতঃ সংস্কারকের লক্ষ্য, Aesthetics অপেক্ষা তাই Ethics-এ তিনি সমধিক শ্রদ্ধাবান ! কাজেই জাগতিক ব্যাপারের যাথার্থ্য বা স্বাভাবিকতা অপেক্ষা ঔচিত্যই তাঁর বিবেচনায় বড়। এই বিবেচনা থেকেই তাঁর দেশ-প্রেমেরও উদ্ভব, তাই তার ভেতরও জাতি-বিদ্বেষের অশোভন আধিক্য থেকে গেছে, থেকে গেছে নৈর্ব্যক্তিক আচার-নিষ্ঠার কষ্টকর আড়ষ্টতা। আমি বলতে চেয়েছি, এই সমস্ত জিনিষ তাঁর রস-সৃষ্টির পথে বিশেষ অন্তরায় স্বরূপ হয়েছে।

দেশ-প্রেমের প্রসঙ্গে আর একটা কথা—বঙ্কিমের দেশ-প্রীতির সমগ্র পরিকল্পনা কি ? সীতারাম, রাজসিংহ, আনন্দমঠ কি একটা সাধারণ জাতীয় চেতনার স্ফুরণ ছাড়া অন্য কোন বৃহত্তর মহত্তর আদর্শকে

ফোটাতে পেরেছে? জাতি-দ্বন্দ্বের ধূমায়িত আবর্ত্তে আত্ম-প্রশংসার লজ্জাজনক আতিশয্য এবং ভাবান্ধ প্রাদেশিক মনোভাবের সগর্ব্ব অভিব্যক্তিকে দেশপ্রেম বলে ভুল করতে পারিনে। সন্ন্যাসবিড়ম্বিত ত্যাগ-তিতিক্ষার জ্বলন্ত বর্ণনাও কোন মতেই বড় দরের চিন্তার মর্য্যাদা দাবী করতে পারে না। কাজেই ও নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কিছু নেই। তবে দেশীয় চিন্তায় আত্মমর্য্যাদা-বোধকে জাগিয়ে তোলার যে প্রপ্যাগাণ্ডা সংস্কারকেরা করে থাকেন, বঙ্কিম তাতে আশাতীত শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন এবং বাঙালী জাতির মধ্যে এবিষয়ে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এবং সেই কারণেই নমস্য। সে জন্যে অরবিন্দপন্থীরা বা কংগ্রেসীরা তাঁকে ঋষি বলে থাকেন, আমাদের তা নিয়ে বিবাদ নেই। কিন্তু এতে করে বঙ্কিমের শিল্পী হিসাবে দাবী কিছু বাড়ে কি? অন্ততঃ টুর্গেনিভ বা গোর্কির মতো—যদিও তাঁরাও প্রপ্যাগাণ্ডার পটভূমিতেই শিল্প গড়েছিলেন?

কিন্তু এবার আমার বক্তব্য শেষ করে আনার দরকার। সুবোধ বাবুর প্রতিবাদে ধারাবাহিকতার এতই অভাব যে একটার পর একটা করে তাঁর উক্তিকে খণ্ডন করা পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি দু'চারটি কথাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এতবার এত রকমে বলেছেন যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর বক্তব্যের চরম লক্ষ্য কি তা বোঝা প্রায় দুঃসাধ্য! তবু যথাসম্ভব আমি তাঁর জবাব দেবার চেষ্টা করেছি, যদিও জানি এতে সুবোধবাবু অবহিত হবেন না, বরং তাঁর ক্রোধই উদ্রিক্ত হবে এবং এর পরও যদি তিনি লেখনী ধরেন ত তাঁর ভাষা অনেক দূর নেমেও যাবে। কিন্তু তা যাক, সে জন্যে দুঃখ করার মতো অখণ্ড অবসর আমাদের কোথায়?

শুধু শেষকালে সুবোধবাবুর একটা ছোট টিপ্পনীর আমি জবাব দিয়েই এবারের মতো বিদায় নেব। তিনি রোহিণীর প্রসঙ্গে বর্ত্তমান লেখকের দরদ দেখে বড়ই খুসী হয়েছেন এবং প্রকারান্তরে যে ইঙ্গিত করেছেন, তা

কি জাতীয় রুচির পরিচায়ক সে-কথা আর নাই বললাম! কিন্তু এই রোহিণীরা বাংলার ঘরে ঘরে—সেই ভাগ্যবিড়ম্বিতা অভাগিনীদের কুলটা আখ্যা দেওয়া তাঁর মতো মরালিষ্টের পক্ষে শোভন হলেও এবং তাদের গুলি করে মারা বিষয়ে তাঁর ষোল-আনা সমর্থন থাকলেও, আমাদের মতো 'অসার' ব্যক্তি অতটা তুরীয় মার্গে উন্নীত হতে সাহস করবে না! কিন্তু তাই বলে এই রোহিণীদের নিয়েই আমাদের যা-কিছু সাহিত্যিক বেসাতী মনে করে যাঁরা ভ্রূকুঞ্চিত করে থাকেন, তাঁদেরকেও আমরা একেবারে চিনতে পারিনে এমন নয়। মানুষের দোষ-ত্রুটি দুর্ব্বলতার প্রতি উদাসীন হবার মতো যোগধর্ম্মী হতে পারবো না বলেই যদি নিন্দার ভাজন হই ত তাতে আমাদের দুঃখ কি? কিন্তু কুলবধূ সম্বন্ধে আমাদের সহানুভূতির অভাবটা কি লেখকের মৌলিক আবিষ্কার নয়? যেমন 'বঙ্কিমের পড়াশুনাও খুব উঁচুদরের ছিল না' কথাটাও তার মৌলিক আবিষ্কার! কুকুরকে দুর্নাম দিয়ে ফাঁসি লটকানোর কথা আছে বটে, কিন্তু সে কি সুবোধবাবুর মতো সুধী ব্যক্তির জন্যে?

কিন্তু এই পর্য্যন্তই থাক। বিগত শতাব্দীর সাহিত্য-সম্রাট্ নামে খ্যাত বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হতে থাক, এই আমার ইচ্ছা! ভাবাবেগের কুয়াসা ঢাকা দিয়ে, তাঁকে দিনের পর দিন প্রচার করে যাওয়ার চেয়ে, তাঁর সাহিত্যের বিতর্কমূলক আলোচনা হয়ে, তাঁর সত্যকার মূল্য নিরূপিত হয়, এই উদ্দেশ্যেই উক্ত প্রবন্ধ লেখা। সেই সুযোগ দেওয়ার জন্যে আমি পরিচয়ের কাছে কৃতজ্ঞ—যদিও সুবোধ বাবুর মত যে এরকম 'অসার'কে সে-সুযোগ দেওয়া ঠিক হয় নি!

[৪] মাইকেলের কাব্য

আজকে মাইকেলের স্মৃতি-দিবসে তাঁর শেষ জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে আমি শোক প্রকাশ করবো না। এই দুঃখ-দারিদ্র্যের জন্যে তিনি নিজে কতখানি দায়ী, কতখানি দায়ী হিন্দু কলেজের শিক্ষা বা সমসাময়িক সমাজের ঔদাসীন্য—তা নিয়েও আমি কোন মন্তব্য করবো না। আমরা পৃথিবীতে আসবার বহুদিন আগে তিনি গত হয়েছেন, সঙ্গে নিয়ে গেছেন তাঁর দুঃখ-দারিদ্র্য—তাঁর অসংযম, উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্ভাগ্যের শোচনীয় ইতিহাস, পেছনে রেখে গেছেন তাঁর অমর রচনাবলী, জ্ঞান-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যা করেছে আমাদের চিত্তকে অধিকার। মাইকেল আমাদের কাছে একটা আইডিয়া—সনাতন উদ্ভিজ্জ প্রকৃতির ভালো মানুষদের দেশে বিদ্রোহ ও পুরুষকারের প্রদীপ্ত ভাববিগ্রহ রূপে মাইকেল করেছেন আমাদের শ্রদ্ধাকর্ষণ। তাঁর সমস্ত জীবনকে ও সমস্ত রচনাকে আমরা দেখেছি এক এবং অভিন্নরূপে এবং সে রূপ হল বিদ্রোহের।

সমসাময়িক সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে আপোষ করে চললে, হিন্দু কলেজের পড়া শেষ করে, যথাসময়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটি নিলে এবং কুলশীলসম্পন্ন সর্ব্বসুলক্ষণা একটি পত্নী গ্রহণ করলে, হয়ত তিনি সুখী হতেন। এমন কি টাকা পয়সা ও ঘরবাড়ী করে, দেশের ও দশের একজন হয়ে অনেকের ঈর্ষাকর্ষণও করতে পারতেন। কিন্তু তাহলে তিনি কি মাইকেল হতেন? তিনি হতেন বাংলার সনাতন মধুবাবুদেরই অন্যতম, হয়ত কবিতা লিখে হেমচন্দ্রের স্তরের একজন কবিও হতেন। তাতে তাঁর

দিক থেকে লাভের সম্ভাবনা থাকলেও, বাংলা ভাষা, বাঙালী জাত চিরদিন থাকতো দরিদ্র হয়ে।

যে পোষ-না-মানা বিদ্রোহী কৈশোরেই তাঁর বুকে ঝড় তুলেছিল—তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল ধনী পিতামাতার স্নেহ থেকে আকর্ষণ করে নিরবলম্ব আত্মস্বাতন্ত্র্যের দিকে, নিজের জাতি-ধর্ম্ম, আত্মীয়-বন্ধু, সকলকে পরিহার করে একক আভিজাত্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে উৎসাহিত করেছিল—সে একটা সাময়িক উচ্ছ্বাস নয়, হিন্দু কলেজের শিক্ষায় বা নূতনত্বের মোহে স্থলভ আধুনিকতা দেখানোর আড়ম্বরও সে নয়। এর বীজ ছিল তাঁর চরিত্রে। (তাঁর অন্তর স্বভাবধর্ম্মেই তাঁকে টেনেছিল দুর্গমের দিকে, দুষ্করের অভিমুখে, দুশ্চর পরীক্ষার সঙ্কট-পথে। ব্যক্তিগত জীবনে এ তাঁর পক্ষে দুঃখের কারণ হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু জীবনে এ-ই তাঁকে করেছে এত বড়। বাংলার সনাতন পয়ার-ত্রিপদী প্লাবিত, উপধর্ম্ম-উপক্রত কাব্য সাহিত্যে তিনি যে এনেছিলেন দুর্ব্বার গতিশীল, মেঘ-ঝঙ্কৃত অমিত্রাক্ষরের ছন্দস্পন্দন, শৈলশিখরমুক্ত প্রাণদায়ী গোমুখী ধারার মতো যা নেমেছে বাংলার সমতল শস্যসমৃদ্ধ প্রান্তরের বুকে —তারও মূল তাঁর এই বিদ্রোহিতায়।)

যে যুগে ভারতচন্দ্রই আদর্শ কবি, ছন্দের রিনিঝিনি দিয়ে বা আদি রসের সস্তা ফাঁদ পেতে পাঠক ধরাই যেদিন ছিল সাহিত্যিক কৌলীন্য, সেদিনের সাহিত্যে মাইকেলের উদাত্ত গম্ভীর ছন্দ-নির্ঘোষ এলো কোথা থেকে? এর পেছনে ছিল সেই বিদ্রোহী কবির অন্তঃপ্রেরণা, যিনি জীবনে করেন নি সমাজ ও ধর্ম্মের সঙ্গে আপোষ, সংস্কৃতিতে করেন নি কোন প্রচলিত পদ্ধতি বা প্রসিদ্ধির আনুগত্য। বাংলা দেশে এই চরিত্র দুর্লভ। তাই বুদ্ধিমান বাঙালী চিরদিন মাইকেলকে করেছে দোষারোপ, তাঁর জীবনের উল্লেখ করে, কারণে অপ্রসিদ্ধ হয়ে করেছে

তাঁর অসামান্য সৃজনী-প্রতিভাকে অপমান। কিন্তু প্রতিভা যিনি হবেন, তাঁর সম্বন্ধে কোন বাঁধা ছক, কোন বিধি-বরাদ্দ হিসাব চলতে পারে না কোনদিন। বায়রণ হয়ে জন্মাবেন যিনি, অতুল ঐশ্বর্য্য ও অগাধ আধিপত্যের মমতা ছিন্ন করে তাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে দুর্ভাগ্যের দিকে, অবমাননার অভিমুখে। শেলী হয়ে জন্মাবেন যিনি, তাঁকে পেতেই হবে সকলের সম্মিলিত প্রতিরোধ এবং যাঁদের হিতে যাঁদের কল্যাণে নিঃশেষিত করে যাবেন জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত, তাঁদের কাছ থেকে পেতেই হবে সবচেয়ে বড় আঘাত। প্রতিভার ধর্ম্মই এই—তা মানে না কোন অনুশাসন, শোনেনা কোন অনুরোধ, রাখে না কোন ভয়। বলা বাহুল্য সেই জন্যেই প্রতিভার সঙ্গে দুর্ভাগ্যের যোগ, অস্তিত্বের সঙ্গে নিঃশ্বাসের মতোই অপরিহার্য্য। তাই মাইকেল যে দারিদ্র্য ভোগ করেছেন, অনাহারে, অচিকিৎসায় দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণ দিয়েছেন—এ নিয়ে আমার মনে কোন অনুযোগ নেই। এই যদি তাঁর পরিণতি না হতো, তাহলে অত বড় সৃজনী প্রতিভার উত্তরাধিকার তিনি দিয়ে যেতে পারতেন না দেশকে। তাই নিতান্ত স্বার্থপরের মতোই আমি বলবো, (বাংলা সাহিত্যের কল্যাণে প্রয়োজন ছিল তাঁর এই দুর্ভাগ্যের, এই আপোষ-না-করা, হিসাব-না-রাখা বেপরোয়া বিদ্রোহের।)

মাইকেলের সাহিত্য নিয়ে বিশদ আলোচনা আমি করবোনা। তার উপলক্ষ্য এ নয়, তার উপযোগিতাও আছে কিনা সন্দেহ। আমি শুধু একটি কথা বলবো—(তাঁর সাহিত্যকে যেন আমরা তাঁর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে না দেখি। জীবনে তিনি অস্ত্র ধরেছিলেন সমস্ত সংস্কারের, সমস্ত প্রাক্-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে—সে তাঁর ব্যবহারিক প্রকাশ। তারই গভীরতর দিক হল তাঁর সাহিত্য) (রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-মেঘনাদকে তিনি গৌরবান্বিত করে চিত্রিত করেছেন বলে মেঘনাদবধের সমালোচকরা

তাঁর নিন্দা করেছেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সেই সমালোচকদের দলভুক্ত। কিন্তু কেন তিনি অশিববুদ্ধি রাবণ ও তাঁর পুত্র মেঘনাদকে দিলেন এই গৌরবের জয়মাল্য? সে কি তিনি খৃষ্টান এবং সেই কারণেই রামের ভগবত্তায় বিশ্বাসহীন বলে? অথবা হিন্দু কলেজের শিক্ষায় বিলাতী পেট্রিয়টিজমে দীক্ষিত বলে? সমালোচকরা তাই বলেছেন বটে, কিন্তু তাঁর জীবন যাঁরা গভীর করে উপলব্ধি করেছেন, তাঁরাই জানেন এর কারণ—রাবণ ও মেঘনাদ উদ্যত পৌরুষের প্রতীক বলে। (যে রাবণ মানেনি দৈবশক্তিকে, ছলে ছিনিয়ে এনেছে যে সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীকে, জন্মভূমির শত্রু দশরথপুত্রদের বিরুদ্ধে যে চালিয়েছে দুর্ব্বার সংগ্রাম, বিদ্রোহী মধুসূদন তার মধ্যে দেখেছেন নিজের প্রতিরূপ। তাকে তিনি জয়মাল্য দিয়েছেন—ভাগ্যের সঙ্গে সে আপোষ করেনি—সে ধ্বংস হয়েছে, নির্ম্মূল হয়েছে, তবু করেনি নতি স্বীকার—এই কি মধুসূদনের নিজেরও রূপ নয়? মক্কেল পরিবেষ্টিত হয়ে নিশ্চিন্ত আনন্দে পসার জমিয়ে তোলার সুযোগ তাঁর জীবনে এসেছিল, বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য পরহিতব্রতীদের প্রদত্ত সাহায্যকে Starting money হিসাবে গ্রহণ করে, শিষ্ট, সংযত ও মিতব্যয়ী গৃহস্থ জীবন যাপনের সুযোগ তাঁর এসেছিল, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তিকে কেন্দ্র করে আত্মস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের সুযোগ তাঁর এসেছিল—কিন্তু তিনি সবলে করেছেন সব কিছুকে প্রত্যাখ্যান, উচ্ছৃঙ্খলতায়, অমিতব্যয়িতায়, অনিয়ন্ত্রিত অবিবেচনায় তিনি ক্ষয় করেছেন নিজেকে। এ রূপ রাবণের)

(এই মূল জীবন-নীতি থেকে উৎসারিত বলেই তাঁর সাহিত্যে নেই তথাকথিত হিন্দুয়ানী বা ভদ্রতার মুখোসপরা ভালোমানুষী। খোদ ভগবানের অনুজ হয়েও তাই লক্ষ্মণ তাঁর মেঘনাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে, তাই মেঘনাদপত্নী প্রমীলার বীরগর্ব্ব পূর্ণব্রহ্ম রামের অন্তরে আতঙ্ক সঞ্চার করেছে,

তাই সরমার স্নিগ্ধ সৌকুমার্য্যে বন্দিনী সীতার মহিমা ম্লান হয়ে গেছে। যারা বিদ্রোহী, যারা সংগ্রামশীল, যারা ভোগ ও ভাগ্যকে ক্রীড়নকের মতো দুই হাতে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে এবং সেই ভয়ঙ্কর খেলায় হয়ত শেষ পর্য্যন্ত প্রাণ দিয়েই খেসারত জুগিয়েছে, মধুসূদন ছিলেন তাদের পক্ষে—কারণ নীতির দিক থেকে তিনি ছিলেন তাদেরই অনুগামী! মাইকেলের কাব্যবিচারে যখন আমরা প্রচলিত দৃষ্টি, বুদ্ধি ও সংস্কারের সমর্থন পাই না এবং না পেয়ে তাঁর অসামান্য কবি-প্রতিভার সমালোচনায় তৎপর হয়ে উঠি, তখন আমরা ভাবতে ভুলে যাই যে মাইকেলের মতো প্রতিভা বহু-শতাব্দীতে এক-একটা জন্মান। তাঁরা আসেন নূতনের বার্ত্তা নিয়ে—যা আমাদের সংস্কৃতির প্রাণ-শক্তিকে পরিপুষ্ট করে, সমৃদ্ধ করে, অথচ যার অনুপেক্ষণীয় ঔজ্জ্বল্য সাম্প্রতিকের চোখ এমন ভাবেই ঝলসিয়ে দেয় যে তার সমগ্র চেহারাই আমরা বুঝতে পারি না। মাইকেল সেই দুর্লভজন্মা মহাকবিদের অন্যতম। তাঁর জীবন ও কর্ম্মের, ভাগ্য ও ভবিতব্যের বিচার করবে কে?

আজকের পাঠক আমরা মাইকেলকে পেয়েছি দূর থেকে—একপারে তিনি, অন্যপারে আমরা, মাঝখানে অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী রবীন্দ্রসাহিত্যের একাধিপত্যের যুগ। তাই থেকে থেকে আজ কথা ওঠে, মাইকেল বিগত-দিনের কবি, তিনি লিখেছেন উপাখ্যান কাব্য, তাঁর সাহিত্যে নেই প্রাণ-ধর্ম্মের সূক্ষ্ম আবেদন। স্বীকার করবো এ অভিযোগ সত্য—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা যে কুসুমিত পথে প্রবল প্রাণবেগে প্রবাহিত হয়ে গেছে, সেই পথকে একক ভাবে গড়ে তুলেছেন কে? মধুসূদন এবং মধুসূদন ছাড়া আর কেউই নন! বাংলা কবিতার সরীসৃপ শরীরে ছিল না মেরুদণ্ড, ভূলুণ্ঠিতা লতার মতো তা শুধু কেঁদেই আসর মাৎ করেছে—তাকে সগর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়াবার, সতেজে উপলবন্ধুর পথে অবাধগতিতে ধাবিত হবার

শক্তি মধুসূদনই দিয়েছেন। (রবীন্দ্রযুগের বাংলা কবিতা কারুণ্যে স্নিগ্ধ—কিন্তু সে কারুণ্য প্রাচীন বাংলা কবিতার নাকে-কাঁদা নয়—সেই স্নিগ্ধতা নবোদিত সূর্য্যের লালিমার মতো, যার পেছনে আছে দীপ্ত মধ্যাহ্ন সূর্য্যের দাহিকা। বাংলার কবিতার দেহে ও মনে সেই প্রখর ভাস্কর-দীপ্তি সঞ্চার করেছিলেন মধুসূদন—তাই রবীন্দ্রনাথ সেই মহনীয় দীপ্তিকে সংহত ও সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করতে পেরেছিলেন এত অনায়াসে) আধুনিক পাঠক আমরা একথা ভাবতে ভুলে যাই, তাই অমর কবি মধুসূদনের প্রতিভা আজ আমাদের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক বিচারের বিষয়।

মহাকবির স্মৃতিদিনে আজ তাঁর উদ্দেশে সমস্ত দেশবাসীর সঙ্গে আর একবার আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, সেই সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ, এই কবি-পূজায় আমাকে সাদরে আহ্বান করার জন্যে।

পঞ্চম স্তবক : রবীন্দ্র সাহিত্য

[১] কালান্তর

১৩২১ থেকে ১৩৪৩-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি সম্বন্ধীয় যে প্রবন্ধগুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়, আলোচ্য বইয়ে সেগুলি সংগৃহীত হয়েছে। এর প্রথম প্রবন্ধ 'কালান্তর'—তারি নাম অনুসারে সমগ্র বইয়ের নামকরণ করা হয়েছে। (কালান্তরে কবি প্রাক্-মহাসমর ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সমরোত্তর কালে তার যে বিরোধ ঘটেছে, তা নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ইউরোপীয় সংস্কৃতির ভেতর থেকে আজ সত্যিকার মনুষ্যত্ব অন্তর্হিত হয়েছে এবং তার স্থান অধিকার করেছে দুর্নিবার পশুবল। মানুষের অধ্যাত্ম-সম্পদ, তার নিরুদ্বেগ প্রশান্ত জীবন-ধারা, তার কল্যাণপ্রদ সুস্থ প্রয়াস, আজ কালধর্মে পরজাতিদ্বেষ ও বস্তু-সর্ব্বস্ব আত্মবিস্তার চেষ্টায় পর্য্যবসিত হয়েছে। বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে, আজ সগর্ব্বে সেই বর্ব্বরতা ঘোষণা করাই হয়ে দাঁড়িয়েছে ইউরোপীয় সভ্যতার মূলকথা—খৃষ্টীয় নীতিশাস্ত্র আজ উঠেছে কুলুঙ্গীতে, তার স্থানে দেখা দিয়েছে নিরাবরণ পাশবিকতা, যা শুধু চায় গ্রাস করতে এবং তাই করে যা ঘোষণা করে কালচারের মহিমা! এই হল সত্যিকার কালান্তর, যার অক্ষুন্ন দাপটে সমাজ, রাষ্ট্র, শিল্প, ধর্ম্ম—মানুষের বহু যুগের বহু তপস্যায় যাদের উৎপত্তি, তা উল্টে-পাল্টে ভেঙে-চুরে একাকার হয়ে গেছে। সুতরাং নবযুগের বহু আড়ম্বরময় এই আধুনিকতা একান্তই স্থুল—এ শুধু কেঁপে উঠেছে

বস্তুর আশ্রয়ে, এর ভেতর কিন্তু থেকে গেছে বিরাট একটি ফাঁকা, যা দিয়ে ঝলকে ঝলকে জল ঢুকে ইউরোপীয় সভ্যতার সৌধ-প্রাচীরে ফাটল ধরাচ্ছে—অতএব একদিন সমগ্র প্রাসাদের আকস্মিক ভূ-পতন ঘটবেই, ঘটা অনিবার্য্য। কালান্তর সেদিন কালান্তক হয়ে দাঁড়ানো আশ্চর্য্য নয়।

কবির এ বিশ্লেষণ যে অত্যন্ত নিপুণ তাতে সন্দেহ নেই। ইউরোপেও আজ থেকে থেকে গেলো গেলো শব্দ হচ্ছে—এই গেলো গেলো ভাবটা অনেক দিন থেকে চলেছে বলেই এটা সত্যি না, এমন নয়। ফাউষ্ট যে সয়তানের সহায়তায় অমিত শক্তিধর হয়েছিল, দক্ষিণা-স্বরূপ সেই সয়তানের হাতে আত্মবলি দিয়েই তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল—মাঝপথে তার থামার উপায় ছিল না। ইউরোপের বস্তু-মুখী রাষ্ট্রবুদ্ধি তাকে যে অসীম প্রতাপ দিয়েছে, তার পেছনে সাধনা ছিল অশিব শক্তির, তার মূল্যও হয়ত তাকে দিতে হবে। কারণ সর্ব্ববিধ সদ্বুদ্ধিকে ছাপিয়েই ত আজ একথা বারবার ধ্বনিত হচ্ছে যে আবার যুদ্ধ চাই, তাতে ভালো মন্দ যা হয় হক! সুতরাং একথা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভেতর কোথাও এমন একটা দুষ্টক্ষত রয়ে গেছে, যা দুশ্চিকিৎস্য॥ বলা বাহুল্য প্রাক্-মহাসমর ইউরোপে এ জিনিষ কল্পনাতীত ছিল, তখন পরস্পর পরস্পরকে ডোবাবার জন্যে এমন সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে গলা কামড়া-কামড়ি করে নি। ফরাসী বিপ্লবও সে হিসাবে বার দুই একটু সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিতে নাড়া দিয়ে গেছলো মাত্র, তার বেশী কিছুই করেনি। কাজেই এ যে কালান্তর তাতে আর সন্দেহ নেই—এই দুই কালকে বিভক্ত করে মাঝখানে অবস্থিত মহাযুদ্ধ।

অবশ্য এই কালান্তরের ছায়াতেই নিঃশব্দে এ যুগের প্রজ্ঞাদৃষ্টিও

এগিয়ে এসেছে, ব্যাপক ভাবে না হলেও, জগতে তারও ঐতিহ্যের স্বীকৃতি থাকতে বাধ্য। মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, বস্তু-দর্শন, সেই ঐতিহ্যের ঔরসে নব নব আদর্শের ও চিন্তারও জন্ম দিয়েছে—শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি তারই নূতন আলোকে নব নব আকারও ধরেছে। তার ভেতর সূক্ষ্ম রসাত্মকতা বা লোকোত্তর প্রশান্তি হয়ত নেই, কিন্তু একটি সহজ স্বচ্ছ প্রত্যক্ষতার দ্যুতি আছে। অবশ্য রাষ্ট্রিক বিক্ষোভের আতিশয্যে এই প্রজ্ঞামূলক সংস্কৃতির ধারাটা বিশেষ ভাবে আত্ম-প্রকাশ করতে পারছে না—তার গতিপথ অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে বার বার এবং স্রোতহীন হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাতে আবর্জ্জনাও জমে উঠেছে বিস্তর, তখন হট্টগোল ও হুড়োহুড়ি এত বিশ্রী ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে তার গঠনের দিকটা প্রায় নজরই এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আসলে কাজও কিছু হচ্ছে—আধুনিক ইউরোপের এই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন দুটি দিকেই কালান্তর—এর একটাকে কবি নিয়েছেন, আর একটাকে অস্বীকার করেছেন। বলা বাহুল্য কবির প্রবন্ধ রাষ্ট্র প্রসঙ্গেই—এবং একথাও ঠিক যে রাষ্ট্রসংস্রবচ্যুত হয়ে মানুষের কোন প্রচেষ্টাই সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে জয়যুক্ত হতে পারে না। তা পারছেও না। অন্ততঃ তার ভেতর থেকে যাচ্ছে একটা বিদ্রোহের সুর, একটা ক্লান্তিকর আক্রোশের ঝাঁজ—যা সর্ব্ববিধ কল্যাণকর সৃষ্টির প্রতিকূল। তবু একে এক কথায় নস্যাৎ করা চলে না।

[কিন্তু বিগত বিশ বৎসরের ভেতর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে কালান্তরটা যত প্রত্যক্ষ, আমাদের দেশে তত নয়। আমাদের মাথার ওপর দিয়েও ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের বিপুল ঢেউ বয়ে গেছে বটে—কিন্তু তা আমাদের তটভূমিকে গভীর ভাবে স্পর্শ করেনি—আমাদের সীমান্ত দেশ পার হয়ে আরো অনেক ঊর্দ্ধে রুশিয়ার উষর মাটিতে এই ঢেউ

পড়ে ভেঙেছে এবং তাদের ভূমিকে উর্ব্বর করেছে। আমরা মহাযুদ্ধকে অনুভব করেছি একটা দুনিরীক্ষ্য দূরগত উপপ্লব রূপে—যা আমাদের চাল ও কাপড়ের দাম চড়িয়ে দিয়েছে, আমাদের কণ্ঠরোধ করে সমর-ঋণ আদায় করেছে—আর অনুভব করেছি পরোক্ষভাবে ও-দেশের সাহিত্যের আদর্শ-বিপর্য্যয় থেকে! অর্থাৎ এটা আমাদের পক্ষে একান্তই পরোক্ষ ছিল সেদিন—যদিও আজ বুঝি, ব্যবসার বাজারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে অল্পসংখ্যকের ধনবৃদ্ধির দ্বারা বিশ বৎসরে গোটা দেশের নিরন্ন হাড়পাঁজড়া এমন করে বার করে দেওয়ার পেছুনে হাত ছিল মহাযুদ্ধেরই সব চেয়ে বেশী! সেদিন আমরা তেমন বুঝিনি, বুঝলেও কিই বা প্রতিকার ছিল?

(আমাদের দেশে ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধ ব্যাপক ভাবে কোন কালেই ছিল না—অতীত বাংলার ইতিহাসে সমগ্র দেশের ওপর একটা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব কোন দিন ছিল বলে শোনা যায় না—কাজেই দেশ ছিল তার গৃহ নিয়ে, রাজা ছিল রাষ্ট্র নিয়ে। সেই সনাতন দ্বৈত-বিধির ওপর প্রথম আঘাত পড়ে মহাযুদ্ধের অল্প আগে এবং ইউরোপের কাছে ধারকরা কড়ি নিয়েই আমাদের প্রথম জাতীয় এক্সপেরিমেণ্ট।) (আমি বলছি স্বদেশী আন্দোলনের কথা। তার পেছুনে জিদ ছিল, ত্যাগ ছিল, সাহস ছিল—ছিল না প্রাণের সঞ্চয়—কাজেই সেই বিপ্লবের ব্যর্থ বুদ্বুদ অচিরে বিদীর্ণ হয়ে দেখালো, গুটি কতক সাহেব মারাই জাতীয় স্বাধীনতার পক্ষে চরম বা পরম নয়—নিজেদের তৈরি করে তোলা দরকার—নিজেদের অপ্রবুদ্ধ মন, অপটু অস্তিত্ব, অস্ফুট জাতীয় চেতনা, সংস্কারের ও কু-আচারের বেড়াজাল ঘেরা কুণো মনোভাব আমাদের পরকীয় রাষ্ট্রশক্তির চেয়ে বড় বাধা—তা তিরোহিত না হলে বৃথা এই ছেলে খেলা। সে আন্দোলন নিষ্ফল হল, কারণ তা দেশের অন্তর থেকে উৎসারিত হয় নি,

হয়েছিল দুচারটি ইংরেজী শেখা তরুণের মাথা থেকে—বাকী সমস্ত দেশই তখনো ছিল ঘোরতর নিষ্কর্ম—আজও আছে। সুতরাং মহাযুদ্ধটাকে চাকা হিসাবে গ্রহণ করে আমরা জাতীয় জীবনের মোড় ফেরাতে পারিনি—সেদিকে হুঁসই হয় নি আমাদের।

এই বইয়ের 'বিবেচনা অবিবেচনা' প্রবন্ধে কবি এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের যে চক্ষু-কর্ণহীন রক্ষণশীলতা বহুযুগের জীর্ণ নামাবলী গায়ে আমাদের সর্ব্ববিধ অগ্রগতির পথ আটক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তাকে কবি অত্যন্ত কড়া ভাবে আঘাত করেছেন এই প্রবন্ধে। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সবাই বোধ করি একমত যে এই ঘুণধরা বৃদ্ধত্ব আমাদের চিন্তার বুকে ভারী পাথরের মতো জেঁকে বসে আছে এবং তা আছে বলেই বাইরের স্বাস্থ্যকর কোন হাওয়াও আমাদের গায়ে লাগে না। 'লোকহিত' এবং 'ছোট-বড়' প্রবন্ধেও কবি এই মনোভাবকে ব্যাখ্যা করে দেখাতে চেয়েছেন—দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিন্তা-চেষ্টা, তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অর্থ হারিয়ে কি ভাবে গতানুগতিক ধারায় দিনের পর দিন নিষ্ফল আবর্ত্ত সৃষ্টি করে এক জায়গায় পাক খেয়ে ফিরছে, তা কবির চেয়ে নৈপুণ্যের সঙ্গে কেউই দেখাতে পারতেন না। এই সমস্ত প্রবন্ধ প্রায় বিশ বছর পূর্ব্বের রচনা—কিন্তু আজও এর প্রত্যেকটি কথা বর্ণে বর্ণে খাটে, হয়ত আরও ঢের দিন খাটবে। কারণ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পৃথিবীর বহু দেশের ভৌগোলিক সংস্থান এবং আত্মিক ঐতিহ্য ওলট-পালট হয়ে গেলেও, আমরা যথারীতি টিঁকে আছি, এই টিঁকে থাকাটা নাকি আমাদের পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যের জোর। বস্তুতঃ এর গ্লানিটা যে কত বড়, কবি সে দিকে আমাদের অবহিত করে দিয়েছেন। এই যে দেশে রেল ষ্টিমার মোটর কল কারখানা প্রাসাদ অট্টালিকা পলিটিক্স সাময়িক পত্রিকা ইউনিভার্সিটি মিউনিসিপালিটি আরও

কত কত কি হয়েছে, এ করেছে অন্যে—এদের প্রসার আমাদের জীবনের বাহিরেই সীমাবদ্ধ—আমাদের অন্তরদেশে আজও অক্ষুণ্ণ তেজে সনাতন আটচালা মাথা তুলে রয়েছে—আমরা এক চুলও এগোইনি, তাই আমাদের সর্ব্ববিধ আন্দোলন-আলোড়ন কৃত্রিম—ওদের জন্ম আমাদের প্রাণের তাগিদে নয়—এ কথা যত লজ্জারই হক সত্যি কথা। কাজেই ওরা কোন দিন সুফল কিছুই আনতে পারে নি। আমরা পরানুকরণে রাতারাতি মাতামাতি করেছি, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের পুঁজি শেষ হয়ে গেছে—অমনি আমরা ধূলোর মতো গা থেকে সমস্ত আন্দোলন ঝেড়ে ফেলে গৃহ-কোণে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।

সমস্যা এই, কিন্তু সমাধান কি তা কবি দেখান নি। সেটা সংস্কারকের কাজ। সেদিকে আজও বৃথা প্রত্যাশায় পথ চেয়ে থাকা ছাড়া আমাদের উপায় নেই।

'সমস্যা', 'বাতায়নিকের পত্র', 'শক্তিপূজা' প্রভৃতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গান্ধী-আন্দোলন সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে কবি দু' একটি ইঙ্গিত করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনটা আমাদের শৈশবের ব্যাপার—কিন্তু এই আন্দোলন কালে আমরা নেচেছি, যদিও বুঝেছি এ নাচের অর্থ শুধু নাচাই, কারণ দেশের নাড়ির যোগ ছিল না এর সঙ্গেও। দলে দলে ছেলে-মেয়ে জেলে গেছে, লাঠির তলায় মাথা দিয়েছে, স্কুল-কলেজ কাজ-কারবার ছেড়েছে—কিন্তু তাদের সামে কোন লক্ষ্য ছিল না, কোন গঠনমূলক পদ্ধতি ছিল না—সুতো কেটে, হরতাল করে, আরো তজ্জাতীয় নানা খেলো কাজ করে অচিরে শক্তিক্ষয়ের ফলে সমস্ত দেশ অসম্ভব রকম ক্লান্ত হয়ে একেবারে ঝিমিয়ে পলো, তার সেই অবসাদের সুযোগে কখন গলায় নূতন শাসন-সংস্কারের লোহার হাঁসুলি চড়েছে, তা কেউ টেরই পেলোনা! জালিয়ান-

ওয়ালাবাগের উৎপীড়নকে উপলক্ষ্য করে যে সাময়িক চাঞ্চল্যে এর জন্ম, তার সঙ্গে খিলাফতের রসায়ন মিশেল দিয়ে, চলনসই একটা পলিটিক্যাল পথ্য তৈরী করা হয়েছিল—বিচক্ষণ বৈদ্যের হাতে তা মহিমান্বিত চেহারা ধরলেও, আসল রোগের তাতে আসান হল না—তার কারণ রোগটা বহুজীর্ণ এবং পুরুষানুক্রমিক। ওর সংস্কার সম্ভবই নয় হয়ত।

কবি বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন এই রোগটা কোথায়। তিনি জোরের সঙ্গেই বলেছেন, এই রোগটা পলিটিক্যাল মার্কামারা হলেও, এর আসল বিস্তারক্ষেত্র হচ্ছে আমাদের গৃহ। এরই সীমানার মধ্যে এটা অদৃশ্য প্রেতের মতো উপদ্রব করে ফিরছে—আমরা তার আভাস পাই, উদ্দেশ পাইনে। বলা বাহুল্য আমাদের সমাজের এই জীর্ণ পাঁজরে আর খাড়া হয়ে দাঁড়ানোর বল নেই - আমাদের কৃষি নেই, বাণিজ্য নেই, শিক্ষা সীমাবদ্ধ, স্বাস্থ্য লুপ্ত—আমাদের নূতন করে সহজ করে নিজেদের সমস্যাগুলোকে যাচিয়ে বাজিয়ে নেবার মতো শক্তি বা সাহসও নেই—অথচ দিনের পর দিন অন্ধের মতো আমাদেরকে এই ভাঙাচোরা জিনিষটাকে আঁকড়েই চলতে হচ্ছে—দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে এর ভগ্নদশাটাও আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। তারই ফলে বহু আবর্জনা এর অলিতে-গলিতে জমে উঠেছে—তাও আমাদের কাছে পুরাতনের গৌরবে সমৃদ্ধ। তাই কবি বলেছেন, বিচারের চেয়ে আচারকে আমরা বড় করেছি—আমরা মানুষকে চিনিনি, চিনেছি তার সাময়িক বদখেয়ালকে, এবং তাকেই দিয়েছি ষোল-আনা শ্রদ্ধার উপচার! তাই বলা যেতে পারে, আমাদের জাতীয় জীবনে কালান্তর আজও আসে নি—আজও আমাদের চলছে পূর্ব্বতনের একটানা ঢিমেতালা গতি!

তবে কালান্তরে বিলম্ব আর নেই। ধনিক ও শ্রমিকের মাঝখানকার যে বৃহৎ স্তরটা—যেটাকে বলে মধ্যবিত্ত, আসলে এ দেশে যেটা গরীব সম্প্রদায়—তার অবলম্বন চাকরি—তাতে কন্যাদায়, শিক্ষাদায়, জাত্যভিমান আরও বহু অবাঞ্ছিত জিনিষের ভীড়—চাকরি আর হবে না, মেয়ের বিয়ে হওয়া বড় কঠিন, ছেলেমেয়ের শিক্ষার পথ প্রায় রুদ্ধ—এই ভাবে ক্রমে এই সম্প্রদায়টা ধ্বংস হবেই। তারপর মাঝখানের এই স্তরটা সরে গেলেই প্রথম ও তৃতীয়ে যে একটি বিপুল ঠোকাঠুকি হবে, তাতে আমাদের জাতের ভাগ্য হয়ত বদলালেও বদলাতে পারে। সেদিন এই কৌলীন্যের গর্ব্ব, এই সনাতনতার গর্ব্ব, এই নিশ্চেষ্ট রক্ষণশীলতার গর্ব্ব হয়ত দূর হবে। কিন্তু সেদিন থাকবেন না কবি—আর থাকবো না আমরা, তাঁর অনুগামীরা !

[২] প্রান্তিক

রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতম কবিতার বই 'প্রান্তিক' পড়ার পর বাংলা কাব্যের পাঠককে কবির কাব্য-দৃষ্টি নিয়ে নূতন করে ভাবতে হবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে আমাদের একটা বিশেষ ক্ষোভ বরাবরই ছিল এই যে, তা প্রধানত সূর্য্যালোকিত মুহূর্ত্তের কবিতা—তাতে প্রাণবন্ত আনন্দের পূর্ণতা আছে, কিন্তু আনন্দহীন বিক্ষুব্ধ অন্ধকার তাঁর কাব্যে ভাষা পায়নি—জীবনের সেই গভীরতম সুরটি তাঁর কাব্যে প্রায় উপেক্ষিত, তাঁর কাব্য তাই অনেকাংশে নৈর্ব্যক্তিক। বর্ত্তমান বইয়ে কবি আমাদের সেই ক্ষোভ মিটিয়েছেন, সেই সঙ্গে তাঁর বহুবিচিত্র কাব্যসাহিত্যে একটি নবতন সুর সংযোজন করেছেন।

কিছুদিন আগে গুরুতর পীড়ায় কবির সংজ্ঞা কয়েক ঘণ্টার জন্যে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়েছিল—সেই চেতন ও অচেতনের মধ্যবর্ত্তী অবস্থাটা জীবনে অনুভব হয়ত অনেকে করেছেন—এই অবচেতন মনই যদিও যত কিছু স্বপ্ন ও স্মৃতির ভাণ্ডার স্বরূপ, তবু এর গতি-প্রকৃতির হদিশ আমরা পাই না—কিন্তু তার স্বরূপকে কাব্যে ভাষান্তরিত করার দৃষ্টান্ত বিরল। মনোরাজ্যের ধরণ-ধারণ স্বভাবতই নিরুপাধিক, তার অনুগমনে কল্পনার ফলকে কোনো 'রূপ' উদ্রিক্ত হয় না বলেই তা অনির্ব্বচনীয়, তাকে অনুভব করা যায়, কিন্তু ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু এমন অবস্থা অবশ্যই আসা সম্ভব, যখন সজীব ও জীবনহীন এই দুই চরম অবস্থার মধ্যস্থলে থেকে বিচিত্র অর্দ্ধস্ফুট স্বপ্নাচ্ছন্ন এই মানস-জগৎকে প্রত্যক্ষ করা যায়। সাধক হয়ত ধ্যানে এই তুরীয় লোককে প্রত্যক্ষ

করে থাকেন, কবি হয়ত এমনি কোন দুর্লভ অবসরে তাকে উপলব্ধি করেন—

অতীতের সঞ্চয়পুঞ্জিত দেহ খানা, ছিল যাহা
আসন্নের বক্ষ হতে ভবিষ্যের দিকে মাথা তুলি,
বিন্ধ্যগিরি ব্যবধানসম, আজ দেখিলাম
প্রভাতের অবসন্ন মেঘ তাহা, স্রস্ত হয়ে পড়ে
দিগন্তবিচ্যুত—বন্ধমুক্ত আপনাকে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
অলোক আলোকতীর্থে, সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।

দার্শনিক বলেন, 'Suddenly flashes out a region long hidden in the depths of our being—an acquisition of the subject's own on some privileged moment' এ সেই একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঞ্চয়—এ দুজ্ঞের্য় অন্তর জগৎ, যা আমাদের মনোরাজ্যের পশ্চাৎপট, যার আশ্রয়ে আমাদের মনোধর্মের স্ফুরণ, অথচ যা আমাদের বস্তুমুখী চেতনার নাগালের বাইরে।

বস্তুকে আশ্রয় করেই বোধ—বস্তুসম্পর্কহীন নিরবলম্ব বোধের কোন অস্তিত্ব আছে কি? কি তার স্বরূপ? সে সম্বন্ধে আমরা অচেতন, কারণ আমাদের মানস-ক্রিয়াই বস্তু-আশ্রয়ী। কিন্তু কবি বলছেন—

দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায়
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ।
দূর হতে দূরে যেতে যেতে
ম্লান হয়ে আসে তার রূপ।
এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ববৈচিত্র্যের 'পরে,

ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়।

এ অনুভূতি জীব-লোক থেকে জীবনাতীত-লোকে যাবার পথে সকলেই হয়ত লাভ করে থাকেন। কিন্তু এই পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে, আবার সৌভাগ্যবশে ফিরে আসার সুযোগ যাঁর ঘটে, মনের স্বভাবধর্ম্মেই সেই লোকের ভাব-স্মৃতি তাঁর অন্তর থেকে লুপ্ত হয়। কাজেই মরণোন্মুখ ব্যক্তির তাৎকালিক অনুভূতির সম্বন্ধে কল্পনা চলতে পারে, তার সুস্পষ্ট নজির দাখিলের উপায় দুর্লভ। সৌভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি এ বিষয়ে প্রাকৃতজন থেকে স্বতন্ত্র—তাই সর্ব্বাঙ্গীণ না হলেও, আবছা আবছা ভাবে সেই রাজ্যের আভাস তাঁর রোগমুক্তির অব্যবহিত পরমুহূর্ত্তের কবিতাগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। একে কবি-কল্পনার অতীন্দ্রিয় লোক বলে মনে করলে ভুল করা হবে—হেমলক পান করে মৃত্যু-সমুদ্রে তলিয়ে যাবার মতো যে অপার্থিব অনুভূতি নাইটিংগেলের গান শুনে কীটসের মনে জেগেছিল, তার নিদর্শন রবীন্দ্রকাব্যেও প্রচুর আছে। শেলীর 'অনন্ত জগৎ' তারই একটি সূক্ষ্মতর সংস্করণ—বন্ধুর মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে, তাঁর আত্মার আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে দুর্জ্ঞেয়ের পথে এসে অজ্ঞাতে শেলী ভারতীয় ঐতিহ্যের আবর্ত্তে পড়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যে ঐতিহ্যকে পিছনে ফেলে রেখে স্বচ্ছন্দ অনুভবকে রূপ দিয়েছেন—এমন কি ছন্দে মিল দেবার প্রয়াসটুকুও তিনি স্বীকার করেন নি, পাছে এই সহজ আবেশটুকু ব্যাহত হয়। সমগ্র কাব্যটিই তাই লম্বিতপর্ব্বের অমিত্রাক্ষরে রচিত—শুধু শেষের দু-একটি ছাড়া।

এই অবচেতন লোকের রূপও কবির ভাষায় বিচিত্রতা লাভ করেছে। আলো নেই, শব্দ নেই, বায়ুপ্রবাহশূন্য অনড় অন্ধকারের ভেতর একটি প্রচ্ছন্ন দ্যুতির শিহরণ, একটি সম্মিলিত গুঞ্জনধ্বনির অস্ফুট প্রতিধ্বনি—

সম্মুখ-পিছন, উপর-নিচু পরিব্যাপ্ত করে সীমাশূন্য একটি নিরবয়ব পরিমণ্ডলের বিস্তার…

এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিলসূত্র যবে
ছিঁড়িল অদৃশ্যঘাতে, সে মুহূর্তে দেখিনু সম্মুখে
অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতি দূর নিঃসঙ্গের দেশে
নিরাসক্ত নির্মমের পানে। অকস্মাৎ মহা একা
ডাক দিল একাকীরে।
মনে হোলো মুহূর্তেই থেমে গেল সব বেচা কেনা
শান্ত হোলো আশাপ্রত্যাশার কোলাহল।
বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে।

সংজ্ঞাপ্রাপ্তির অল্পক্ষণ পরেই কবি একখানি ছবি এঁকেছিলেন—সেই ছবিতে যে অস্ফুট একটি অজ্ঞাত লোকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কয়েকটি কবিতায় তারি আভাস সুস্পষ্ট। মনের এই গ্রন্থিমুক্ত ক্ষণিক বিরতির অবকাশে ভাষা যখন নিরস্ত, স্মৃতি যখন বিচ্ছিন্ন, তখনকার অনুভূতি কেবল বর্ণময়, আলো-অন্ধকারের সূক্ষ্ম তারতম্যে তার পরিমাপ। ঐ ছবির মতো প্রান্তিকের বহু কবিতায়ও তার ছায়া দেখলাম। ক্রমে সংজ্ঞা যত স্ফুট হয়ে এসেছে, অস্তিত্ব ও তার বৈচিত্র্য ততই প্রকট হতে হতে পূর্ণাঙ্গ চেতনার বিকাশ কি ভাবে সমগ্রতা পেয়েছে, তারও ক্রমিক আভাস প্রান্তিকে দেখা যায়।

চরম ঐশ্বর্য্য নিয়ে
অস্তলগনের, শূন্য পূর্ণ করি এল চিত্রভানু,
দিল মোরে করস্পর্শ, প্রসারিল দীপ্ত শিল্পকলা
অন্তরের দেহলীতে, গভীর অদৃশ্যলোক হতে

ঈশারা ফুটিয়া পড়ে তুলির রেখায়। আজন্মের
বিচ্ছিন্ন ভাবনা যত
রূপ নিয়ে দেখা দেয়!

পূর্ণ চৈতন্যের স্ফূরণ হবার পর কবি দেখলেন, পুরাতন পরিচিত পৃথিবীর সত্যকার রূপ—

দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্ব্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য্য বিদ্রূপ ··

তখন তিনি কাতরকণ্ঠে বললেন—

···শক্তি দাও শক্তি দাও মোরে
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী।

মানবীয় চৈতন্যের সঙ্গে অহংজ্ঞান ওতপ্রোত ভাবে জড়িত—সেই চৈতন্য যখন দেহের তটসীমায় নিরুদ্ধ, তখন সর্ব্বপ্রথম যে অনুভূতি, তা আত্ম-বিস্মৃতির, অহঙ্কারমুক্তির। সেই সর্ব্বস্মৃতিহীন নির্ম্মুক্ত একাকিত্বের ওপর সংজ্ঞাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কি করে আবার নবচেতনার সঞ্চার হল, কি করে সহসা বিচ্ছিন্ন অতীতের সঙ্গে আপনা আপনিই আবার সংযোগ সাধিত হল, নিজত্ববোধ ফিরে এলো, কবি তা নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁর ভাষাই এই ক্রম-পরিণতিটুকু ধরিয়ে দিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এখানেই প্রান্তিকের শেষ। সংজ্ঞালুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বস্তু-জগতের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ দিয়ে সুরু হয়ে, সংজ্ঞাশক্তির পুনঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই বহু বিচিত্র দুর্লভ দুজ্ঞে'য় ব্যাপারটি সমগ্রভাবে প্রান্তিকে আশ্চর্য্যরূপে পরিস্ফুট হয়েছে—একটির সঙ্গে আর একটি কবিতার ঐক্য তাই এই বইয়ে এতই সহজলভ্য যে এদের সবগুলিকে নিয়ে অখণ্ড একটি

কাব্যই জন্মলাভ করেছে বলতে পারি। এদের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী বলিষ্ঠ, ঋজু অথচ অনলঙ্কৃত এবং অকৃত্রিম—লিরিকধর্ম্মী রবীন্দ্রকাব্যে এরা নবজাত। এই কাব্যের সত্যিকার বিচার ঠিক এখনি হওয়া সম্ভব কি না বলতে পারি না, কারণ এই কাব্যকে ঠিক ঠিক বুঝতে হলে প্রচলিত রসশাস্ত্রের প্রত্যাশিত পথে হাঁটার উপায় নেই—কারণ এই কাব্যের মর্ম্মদেশে যে অনুভূতির বাসা, তা মনোসমীক্ষণের অন্তর্গত—কাব্যসৃষ্টির একেবারে গোড়ার সূত্র ধরে এই কাব্যের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। মনে হয় সে হিসাবে 'প্রান্তিক' কবির ইদানীন্তন কাব্য-গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

সর্ব্বশেষ কবিতাটি এই বইয়ের অন্তর্গত না হলেই ভালো হতো। কাব্যটির সমাপ্তিতে যে একটি গাম্ভীর্য্যের সুর আছে, তা ওতে আহত হয়েছে মনে হয়।

[৩] শেষ সপ্তক

শেষ সপ্তক রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতম কবিতার বই এবং তাঁর গদ্য কবিতা পর্য্যায়ের এটি দ্বিতীয় বই। প্রথম বইয়ে কবি যে আদর্শ নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেছিলেন, বর্ত্তমান বইয়ে তা পূর্ণতা লাভ করেছে মনে করতে পারি। কিন্তু প্রচলিত ছন্দোবন্ধ ও মিলকে পরিহার করে, গদ্যে কবিতা লেখার হেতু কি তা নিয়ে অনেক পাঠকের মনেই হয়ত প্রশ্ন আছে—রবীন্দ্রনাথ নিজে চিঠিপত্রে এবং প্রবন্ধে সাধারণকে মোটামুটি ভাবে এ বিষয়ে কতকটা অবহিত করেছেন। তিনি নিজে প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং সাহিত্য পরিষদে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করেও দেখিয়েছেন যে তথাকথিত ছন্দ এবং মিল না থাকলেও, এই গদ্য কবিতাগুলির মধ্যে একটা সমাহিত অথচ সূক্ষ্ম সুরের আমেজ আছে, যা একটু তৈরী কান থাকলেই ধরতে পারা যায়। এ কথা সত্য হলেও অবশ্য ছন্দচাতুর্য্য কাব্যের পক্ষে অনাবশ্যক হয়ে পড়ে না—আবার গদ্যে কবিতা লেখার বিরুদ্ধেও কোন যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না তা থেকে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকার প্রসিদ্ধ কবি ওয়াল্‌ট হুইটম্যান্ তাঁর Leaves of Grass কাব্যে ছন্দকে পরিহার করে সোজা গদ্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন। হুইট্‌ম্যানের কাব্যে লালিত্য, মাধুর্য্য বা সৌকুমার্য্য সৃষ্টির কোন আবশ্যক হয় নি—তিনি রসশিল্পী নন—সংসার সম্বন্ধে, মানুষ সম্বন্ধে, অন্যায় অসত্য ও অনৈক্য সম্বন্ধে তাঁর মনে যে সুতীব্র অনুভূতি জেগেছিল, যে সমস্ত মতবাদ জন্ম লাভ করেছিল, তাই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন—শিল্পের দৃষ্টিতে তাদের রূপায়িত বা রসায়িত করেন নি। কাজেই তাঁর পক্ষে এই টেকনিক খুব

উপযোগীই হয়েছিল সন্দেহ নেই। তাঁর সমসাময়িক রুষ কথা-সাহিত্যিক টুর্গেনিভও Poems in Prose নামে একটি বই লেখেন। এই বইয়ের কবিতাগুলিও একটু নূতন ধরণের—একটি কুকুর, কি একটি রিক্সাওয়ালা, কি দুটি বোন বা এই শ্রেণীর ছোট ছোট ছবি ও তাদের আনুষঙ্গিক ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, প্রীতি-প্রেমের ইঙ্গিতকে কেন্দ্র করে এই কবিতাগুলির সৃষ্টি। এরা যেন এক একটি ছোট গল্পের চালচিত্র। এরকম কবিতার পক্ষেও গদ্যই হয়ত প্রশস্ত টেকনিক।

কিন্তু হুইটম্যান্ বা টুর্গেনিভের ধারা রসাত্মক লিরিকের পক্ষে কতটা উপযোগী তা বলা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের ধারা কিন্তু এঁদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অনেক দিন পূর্ব্বে ইংরাজী 'গীতাঞ্জলি'তে তিনি যে রীতি অবলম্বন করেছিলেন, এতকাল পরে বাংলাতে কতকটা সেই রীতিরই অনুসরণ করেছেন মনে করা যেতে পারে। ইংরাজী 'গীতাঞ্জলি'র ধরণটা আবার Book of Psalms থেকে নেওয়া কি না, সে গবেষণা বর্ত্তমান আলোচনার পক্ষে অনাবশ্যক। কারণ এ বিষয়ে টম্সন্ সাহেবের সঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই মতদ্বৈধ আছে শুনেছি।

ছন্দ ও তান-লয়ের ওজন বাঁচিয়ে, অনুপ্রাস ও অলঙ্কারের জড়োয়া গহনার ভারে কবিতা যে সহজ ভাবে চলতে পারে না, তার স্বাভাবিক গতি যে কতকটা পঙ্গু হয় এবং অন্তরের স্বতঃ-উৎসরিত আনন্দটি যে অনেকটা কৃত্রিম হয়ে পড়ে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাজেই এই লৌকিক স্তরের সুলভ কল-গুঞ্জনকে পরিত্যাগ করে, কবিতার মধ্যে যদি বলিষ্ঠতর, নূতনতর গতির বেগ সঞ্চারিত করা যায়, তাহলে যে এই শব্দগত music-এর পরিবর্ত্তে প্রাণগত বৃহত্তর music-এর স্ফূর্ত্তি হবার সুযোগ হয়—এ কথাও পরীক্ষিত হয়েছে কার্ল স্যাণ্ডবার্গ ও ডি-এইচ. লরেন্সের হাতে। কবিচিত্তের অত্যুগ্র ভাবাবেশকে সৌখীন শব্দ-

লালিত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, তাকে তাল-মাত্রার বাঁধাপথে হাঁটাতে গেলে, কাব্যের প্রাণ-বস্তু ক্ষুণ্ণ হয় বলেই বিংশ শতাব্দীর কবি কাব্যের অপরূপ দেহ-সৌষ্ঠব চাইলেন না, তিনি চাইলেন তার প্রাণ-সম্পদের প্রাচুর্য্য। তাই বল্গাহীন গদ্য কবিতাই হল বিশেষ করে এ যুগের কবিতা। //

ধরা যাক শেষ সপ্তকের এই অংশটি—

বিপুল ঔৎসুক্য আমাকে বহন করে নিয়ে যায় সুদূরে।
বর্ত্তমান মুহূর্ত্তগুলি
অবলুপ্ত করে কালহীনতায়।
যেন কোন লোকান্তরগত চক্ষু
জন্মান্তর থেকে চেয়ে থাকে
আমার মুখের দিকে,
চেতনাকে নিষ্কারণ বেদনায়
সকল সীমার পরপারে দেয় পাঠিয়ে।

এই কবিতাকে যদি ছন্দোবন্ধে বাঁধা হতো (সে বলাকার ছন্দই হক না কেন), তাহলে ঔৎসুক্য, মুহূর্ত্ত, অবলুপ্ত, লোকান্তর, চক্ষু, নিষ্কারণ প্রভৃতি যুক্তাক্ষরবহুল এবং আপাতদৃষ্টিতে রূঢ় শব্দগুলিকে (পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করতে হলে) হয় যথাসম্ভব মোলায়েম করতে হতো, না হয় এদের ভারসাম্য রক্ষা করতে প্রত্যেকটি চরণ ওজন করে বসাতে হতো। তা ছাড়া প্রাণের কথাগুলিরও এমন স্বচ্ছন্দ প্রকাশ হতো কি না সন্দেহ। এই যে কৃত্রিমতা এর বিরুদ্ধেই কবির প্রধান আপত্তি।

ইংরাজী থেকে একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—

Then must I not talk? Must I remain silent, with lips sealed in your burning kisses and look vacantly at the eyes, that betray no passion, no yearning, but a dull

desire floating drearily, like clouds hanging along a projecting precipice ?

এর সঙ্গে সুইনবার্ণের Why should you not let me speak, Oh the longing for a word প্রভৃতি লাইনগুলির তুলনা করলেই তফাৎটা কোথায় তা ধরা পড়বে।

। বিংশ শতাব্দীর কবিরা বলছেন, এই তফাৎ থাকবার কোন অর্থ হয় না। এ ছাড়া কাব্যের যে একটা বিশেষ ভাষা আছে, কতকগুলি বিশেষ ম্যানারিজম্ আছে, সেগুলিরই বা সার্থকতা কি ? আমরা যে ভাষায় কথা বলি, ভাবি, চিন্তা করি, কাব্যের ভাষা তা থেকে পৃথক হবে কেন ? তা যেখানেই হয়, সেখানেই রচনা হয়ে পড়ে আড়ষ্ট, কাব্যের এলাকা হয় সীমাবদ্ধ। এই কথা আরো বেশী করে খাটে বাংলা কাব্য সম্বন্ধে—বাংলা কাব্যে প্রচলিত অসংখ্য নামধাতু, অব্যয় ও সর্ব্বনামের ছড়াছড়ি রয়েছে, যা গদ্যে কদাচ চলে না। এর ওপর কাব্যের গঠনে এমন একটা বিশেষ ধরণ আছে, যার ফলে কেবল কান্তপদাবলীই বাংলা ভাষায় বাগিয়ে লেখা চলে। কিন্তু এই যুক্তির পেছুনে যে কথাটা আছে, সেটা আগে প্রণিধান করা দরকার। কাব্যের পক্ষে বিষয়-বস্তুটা চিরদিনই উপলক্ষ বলে গণ্য হয়েছে, এবং প্রচ্ছন্নভাবে তার ভেতর কাজ করেছে সৌন্দর্য্য ও শিষ্টতার আভিজাত্য—কাজেই তার প্রকাশ-ভঙ্গীও হয়েছে তারি অনুরূপ। এখন যদি প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে গদ্যাত্মকতা প্রবেশ করানো হয় (সে গদ্য যতই সুরেলা হক), তাহলে তার বিষয়-বস্তু বা দৃষ্টি-ভঙ্গীরও পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য—নচেৎ কাব্যের দেহে ও প্রাণে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটবেই। ছন্দোবদ্ধ কাব্যে যা বলা যায় না বা যায় নি, তাই বলার উদ্দেশ্যেই ছন্দ-মুক্ত কবিতা লেখার সূত্রপাত এবং শুধু এদিক থেকেই এর সার্থকতা। ।

কিন্তু শেষ সপ্তকের কবি-দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত দৃষ্টি-ভঙ্গী থেকে স্বতন্ত্র নয়। শুধু ছন্দের মিল ও ধ্বনিসাম্য বর্জ্জন ছাড়া আর সব দিক দিয়েই এ কবিতাগুলি কবির পরিণত জীবনের কাব্যগুলির (পূরবী, মহুয়া, বনবাণী) সমগোত্রীয়। যেমন—

তারা কোন প্রথম প্রত্যূষের আলোকে
কোন গুহা থেকে বেরোলো,
অসংখ্য পাখা মেলে ঘুরে বেড়াতে লাগলো চক্রপথে
আকাশ থেকে আকাশে।

এই শ্রেণীর কবিতায় মিল জুগিয়ে দেওয়া খুবই সহজ। যতি-সংস্থান এবং মাত্রা-বিভাগ ত প্রায় তৈরীই আছে। আর প্রাণ-বস্তুর দিক থেকেও এরা খাঁটি রবীন্দ্রপন্থী। তাই শেষ সপ্তকের কোন কোন স্থলে টেকনিক যেন তার বিশিষ্টতা হারিয়ে ফেলেছে মনে হয়। হুইটম্যানের কাব্যে আমরা মতবাদের তূর্য্যধ্বনি ও শাণিত উক্তির অসি-সঞ্চালন দেখেই সন্তুষ্ট। কিন্তু শেষ সপ্তক যে কলালক্ষ্মীর নৃত্যের আসর—এখানে নূপুরনিক্কণকে ত বাহুল্য মনে হবার কোন কারণ নেই! তবে এখানেই হয়ত রবীন্দ্রনাথের নিজস্বতা! তিনি নিজেই বলেছেন—

তারপর দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো সাদা সূত্রে গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে,
নির্জ্জন নামহীন নিভৃতে,
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সঙ্গীতের গভীরতায়।

[৪] রবীন্দ্রনাথের গদ্য-সাহিত্য

বিচিত্র প্রবন্ধ : রবীন্দ্রকাব্যের অত্যধিক প্রসার তাঁর বহু বিচিত্র গদ্য গ্রন্থাবলীকে অনেকটা আড়াল করে ফেলেছে। তাঁকে আমাদের দেশ জানে প্রধানতঃ কবি বলে—কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ কবি হিসাবে অসাধারণ হলেও, গদ্য লিখিয়ে হিসাবে তাঁর আসন আরো উঁচুতে। তাঁর গদ্য রচনাবলীর কতকাংশ তাঁর কাব্য রচনার অনুপূরক সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী চিন্তা, দৃষ্টি ও বিচার-বিশ্লেষণের যে একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে, এ আমরা বিশেষ ভাবে কোন দিনই ভেবে দেখিনি। কৈশোরে লেখা 'ইউরোপে প্রবাসীর পত্র' থেকে সুরু করে, 'রাজা প্রজা', 'শিক্ষা', 'আধুনিক সাহিত্য', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'পঞ্চভূত', 'বিচিত্র প্রবন্ধ,' 'চারিত্র পূজা', 'জীবন স্মৃতি', 'শান্তিনিকেতন', 'লিপিকা', 'ছিন্নপত্র', 'রাশিয়ার চিঠি' পর্য্যন্ত কত রকমের গদ্য গ্রন্থই না তিনি রচনা করেছেন এবং বিষয়-বস্তু, দৃষ্টি-ভঙ্গী ও রচনা-পদ্ধতির দিক থেকে তারা কত বিচিত্র এবং চমৎকার! গল্প, উপন্যাস, নাটক ও কাব্য যদি তিনি আদৌ না লিখতেন, কেবলমাত্র গদ্য গ্রন্থাবলীই তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের আসন দিত। তিনি যে রাস্কিন, এমার্সন, কার্লাইল বা ম্যাথু আর্ণল্ডের চেয়ে বড় গদ্য লেখক, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

কাব্যে যাঁর উৎকর্ষ, গদ্যে তাঁর হাত চলে না, এমনি একটা কথা সচরাচর শোনা গিয়ে থাকে। মিল্টনের Ærcopagitica অবশ্য পাঠ্য-পুস্তকের গণ্ডী কোন দিনই অতিক্রম করে নি, কিন্তু শেলীর Defence of Poetry বা কোলরিজের Biographia Literaria রীতিমতো উচ্চাঙ্গের

সাহিত্য। হাল আমলের স্যুইনবার্ণ বা লরেন্সের গদ্য রচনাও কোন মতেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে না। প্রতিভা যাঁর আছে, তিনি গদ্যেই লিখুন, আর পদ্যেই লিখুন, কৃতিত্ব তাঁর অবশ্যম্ভাবী, কারণ গদ্য বা পদ্য হল রচনার রীতি মাত্র, তার প্রাণ অন্য জিনিষ—সেটা নির্ভর করে প্রতিভার ওপর। অবশ্য অনুশীলন চাই। অনুশীলনের অভাবে মাইকেল গদ্য লিখতে গিয়ে কৃতকার্য্য হন নি, কিন্তু নবীন সেন বা দ্বিজেন্দ্রলাল চমৎকার গদ্য লিখতেন। অসাধারণ শক্তির অধিকারী রবীন্দ্রনাথের তুলনা অবশ্য পৃথিবীতেই দুর্লভ সে গদ্যেই হক আর পদ্যেই হক—তিনি কারো আদর্শ নেন নি, কোন বাঁধা পথে হাঁটেন নি, তাঁর সৃজনী মন তাঁর প্রতিভাকে নিত্য নূতন উদ্ভাবনের পথে চালিয়েছে—গদ্য তারি একটা পর্য্যায় মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনা সুরু হয় 'ভারতী'র আমলে। প্রথম তিনি দেখা দেন সমালোচকরূপে। 'মেঘনাদ বধ কাব্য' দিয়ে তাঁর সমালোচনার সূচনা এবং তারি পরবর্ত্তী পরিণতি হচ্ছে 'শকুন্তলা', 'রামায়ণ', 'কাব্যের উপেক্ষিতা', 'কাদম্বরী', 'রাজসিংহ'। 'সাধনা' ও 'বঙ্গদর্শনে' তাঁর গদ্য রচনার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়—তখন তিনি সম্পাদক। শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, নানা দিককার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাঁর শিক্ষার বাহন, স্বদেশী সমাজ, বিলাসের ফাঁস, সফলতার সদুপায় প্রভৃতি প্রসঙ্গাত্মক রচনার জন্ম হয় এই সময়ে। প্রথম পর্য্যায়ের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের তফাৎ হল প্রকাশ ভঙ্গীতে—গাঢ়বন্ধ তালমান সুসঙ্গত অলঙ্কারাঢ্য সংস্কৃতানুগামী গদ্যে কেকাধ্বনি, কাব্যের উপেক্ষিতা প্রভৃতি লেখা কবি রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। আবার শাণিত তরবারির মতো উজ্জ্বল সতেজ ভাষায় এই সমস্ত প্রাত্যহিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা, এও তিনি ছাড়া আর কারো দ্বারা সম্ভব হত না। এমন সাদৃশ্য ও উপমা প্রয়োগের কৌশল,

এমন বক্রোক্তির কায়দা, বাংলা সাহিত্যেই দুর্লভ। যুক্তির ফাঁক হয়ত অনেক জায়গায় আছে, কিন্তু উক্তির বিশেষত্ব আগাগোড়াই অপূর্ব্ব।

(তাঁর সমালোচনা-সাহিত্য সম্পর্কে একটা কথা বলা দরকার। তিনি আলোচ্য বিষয়কে অবলম্বন করে হিসেবী লোকের মতো দাঁড়ি ধরে বিচার করেন না, ধারাবাহিক ভাবে একের পর এক প্রসঙ্গের অবতারণা করে, তার সাহায্যে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হন না। তাঁর সমালোচনা সম্যক আলোচনা নয়—অবলম্বিত বিষয়ের ওপর নূতন সৌন্দর্য্য আরোপ করে, সমালোচনায় তিনি আলোচনীয় বিষয়টিকে নূতন করে সৃষ্টি করেন। মূলে বিষয়টি তাই কিনা, সে প্রশ্ন তাঁর সমালোচনা সম্পর্কে অবান্তর—তিনি যা দিচ্ছেন, তাতেই বিষয়টি পাঠকের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একেই বলা যেতে পারে রসাত্মক সমালোচনা।)

রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্যের তৃতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হয় 'সবুজ পত্রে' —তখন তিনি তত্ত্ব-বিচারক। পূর্ব্বের সেই কাব্যধর্ম্মী অলঙ্কৃত গদ্যরীতি ছেড়ে এবার তিনি অবলম্বন করলেন তীক্ষ্ণ ও সজীব কথ্য ভাষা—বাংলা গদ্যের ঐশ্বর্য্যবহুল নবযৌবন রূপান্তরিত হল পৌরুষপুষ্ট মধ্য বয়সে। রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের গদ্য রচনায় তীব্রতা ও তিক্ততার আমেজ আছে, তবু এমন সর্ব্বাঙ্গীণ প্রাণবন্ত গদ্য তিনি ছাড়া আর কে লিখতে পারতেন! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কবির এই তিন পর্য্যায়ের গদ্যের কোন পর্য্যায়ই পরবর্ত্তী কালের লেখকদের দ্বারা আর এক পাও বেশী অগ্রসর হয় নি। জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রিয়নাথ সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিতে প্রথম দুই পর্য্যায়ের অনুসরণ দেখতে পাই, আর তৃতীয় পর্য্যায়ের প্রভাব দেখতে পাই প্রমথ চৌধুরী, অতুল গুপ্ত প্রভৃতির রচনায়।

গদ্যে ও পদ্যে মূলতঃ প্রভেদ কোনখানে, আত্মায় না দেহে? যথেষ্ট

সুরেলা কাব্যধর্মী গদ্য আছে, আবার রীতিমতো গদ্যাত্মক কবিতারও অভাব নেই। তবে মোটের ওপর এইটুকু বলা যেতে পারে যে কাব্যের পারম্পর্য্য ভাবাবেগের দিক থেকে, আর গদ্যের পারম্পর্য্য যুক্তিশৃঙ্খলার দিক থেকে—কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে দুয়ের মিশ্রণ যেমন সম্ভব, তেমনি প্রতি যুগেই সাহিত্যের মাপকাঠি বদলানোও স্বাভাবিক। Lyrical Ballads-এর ভূমিকায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ এ বিবাদের এক ধরণের সমাধান করেছিলেন, 'বিচিত্র প্রবন্ধ' লিখে রবীন্দ্রনাথ আর এক ধরণে এর সমাধান করেছেন। বস্তুতঃ গদ্য বললেই যে কাটা-ছাঁটা কাঠখোট্টা কাজের কথা বোঝায়—যা আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনে ব্যবহার হয়—রবীন্দ্রনাথ তা কোন দিন লেখেন নি। পাঠকের গোচরে বক্তব্য পেশ করাটাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য নয়, তাঁর সাহিত্যে বস্তুর চেয়ে ভঙ্গী বড়। এটা সর্ব্বদাই রূপে-রসে অভিনব—তার জন্যে তাঁর হাতে সাময়িক প্রসঙ্গও যেমন চিরন্তন শিল্পের মূর্ত্তি ধরে, গদ্যের আকারে তেমনি পরিপূর্ণ কাব্যও বাঁধা পড়ে যায়। তাঁর আধুনিক গদ্য কবিতায় এই গদ্য ও পদ্য সমস্যার চরম সমাধানই তিনি করে দিয়েছেন।

নিছক কাজের কথাপূর্ণ Didactic লেখার প্রাত্যহিক মূল্য যথেষ্ট থাকলেও, সাহিত্যিক মূল্য নেই। আবার নিতান্ত উপেক্ষণীয় জিনিষ নিয়েও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে, ল্যাম্ব তার দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশের কাজের কথা বোঝাই গদ্যের জগতে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ সাহিত্যিক গদ্য রবীন্দ্রনাথই প্রথম সৃষ্টি করেন। 'পায়ে চলার পথে', 'শ্রাবণ সন্ধ্যায়' ইত্যাদির কথা বলছি। এর আগে বাংলা ভাষায় ব্যক্তিক নিবন্ধ আর কিছু লেখা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

আর একটি উল্লেখযোগ্য শাখা তাঁর পত্র-সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে নবীন সেন 'প্রবাসের পত্র' লিখেছিলেন, কিন্তু তার সাহিত্যিক রূপ যথেষ্ট

উজ্জ্বল নয়। এদিক থেকেও রবীন্দ্রনাথই প্রথম। কৈশোরে 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র', যৌবনে 'ছিন্ন পত্র', প্রেৌঢ় বয়সে 'ভানুসিংহের পত্র' এবং বার্দ্ধক্যে 'রাশিয়ার চিঠি' লিখে পত্র-রচনাকে তিনিই সাহিত্যিক কৌলীন্য দিয়েছেন।

ইউরোপ প্রবাসীর পত্র ঃ আমাদের সঙ্গে যখন থেকে সাহিত্যের সম্বন্ধ, গদ্যে ও পদ্যে তখন রবীন্দ্র প্রভাব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। পূর্ব্বতন আদর্শ, বিরুদ্ধ আদর্শ সমস্তই তখন রবীন্দ্র-আদর্শের ভেতর মিশে এক হয়ে গেছে। কাজেই কোন প্রতিকূল আবহাওয়াকে আমরা চেনবার সময় পাইনি। তারপর থেকে এ পর্য্যন্ত আমরা সাহিত্য-রাজ্যে রবীন্দ্রনাথেরই একাধিপত্য দেখে আসছি। তাঁর ছত্রচ্ছায়ায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ কত পাত্র-মিত্রেরই উদ্ভব হল, কিন্তু তাঁর প্রাধান্য ও প্রভাবকে না মেনে চলবার শক্তি কারুরই হল না। যাঁরা অক্ষম আত্মাভিমানে তাঁকে স্বীকার না করবার ভান করলেন, তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যই উচ্চকণ্ঠে সেই পিতৃ-ঋণ ঘোষণা করতে লাগলো। আমাদের বাল্যকালে সাহিত্য ক্ষেত্রে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের পরই উল্লেখযোগ্য ছিলেন, তাঁরা সকলেই চলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের তৈরী রাজপথ দিয়ে। রবীন্দ্র-ধারা পরিহার না করলে, স্বতন্ত্র কোন সাহিত্যিক আদর্শ গড়ে না তুললে, আমরা কোন দিনই সত্যিকার স্রষ্টার মর্য্যাদা পাবো না—এ কথা আমরা ইদানীং বলছি বটে, কিন্তু যারাই একথা বলছি, তারাই সতর্কভাবে করছি রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ।

কিন্তু এখন থেকে যদি ষাট বছর পিছু হটে যাওয়া যায়, তাহলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে কি ভাবে দেখতে পাই? বনফুল, ভগ্নহৃদয়, কবি কাহিনী, সন্ধ্যা সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, কড়ি ও কোমল প্রভৃতি কাব্য—প্রকৃতির প্রতিশোধ, বাল্মীকি-প্রতিভা, বৌঠাকুরাণীর হাট,

রাজর্ষি প্রভৃতি নাটক-উপন্যাস—ইউরোপ প্রবাসীর পত্র, বিবিধ প্রসঙ্গ প্রভৃতি প্রবন্ধ তখন বঙ্কিম শাসিত সাহিত্য-গগনে একটি নূতন যুগের অরুণোদয় সূচনা করেছিল বটে, কিন্তু দেশ সেই লোভনীয় অরুণচ্ছটার পেছনে রবির উদয় উপলব্ধি করতে পারে নি। তাই অভিনন্দনের পরিবর্ত্তে ভবিষ্যতের রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে সেদিন লাভ হয়েছিল অপমান। দেশের সেই ঘোরতর বিরোধিতার কুয়াসা ভেদ করে পূর্ণজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হলেন যে রবীন্দ্রনাথ, আমরা তাঁকে দেখেছি—কিন্তু উদয় গোধূলির অধ্যবসায়ী রবীন্দ্রনাথ আমাদের কল্পনার বিষয়। কবির স্বরচিত জীবন-স্মৃতিতে তাঁর সঙ্গে আমাদের এক-আধটু পরিচয় হয়—কিন্তু অনেকটাই খুঁজে নিতে হয় সমসাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে।

এই সময়ের রচনা কবি নিজেই বেশীর ভাগ বাতিল করে দিয়েছেন। সন্ধ্যা সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত এবং ভানু সিংহের দু'-একটি কবিতা ছাড়া আর সবই আজ দুর্লভ। বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষিকে পরে কবি নাটকে রূপান্তরিত করে এদের পূর্ব্বতন অস্তিত্বের ওপর যবনিকা টেনে দিয়েছেন। অন্যান্য বইয়ের প্রকাশও তাঁর অনভিপ্রেত—এ তাঁর মুখেই শুনেছি। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যের জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে এই রচনাগুলোর মূল্য কম নয়। কাব্যের দিক থেকে মানসী, নাটকের দিক থেকে চিত্রাঙ্গদা, গোড়ায় গলদ, উপন্যাসের দিক থেকে নৌকাডুবি দিয়ে সত্যি সত্যি যে রবীন্দ্রযুগের সুরু, এই রচনা গুলোই হল তার প্রাথমিক ভিত্তি। এই বনিয়াদের ওপরই তাঁর সমগ্র সাহিত্য-সৌধের স্থিতি। অবশ্য এদের অভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুশীলনের কোন ক্ষতি হয়, এমন কথা কেউই বলবেন না। কবির নিজের কথাতেই 'ডিমের ভেতর রয়েছে যে শাবক, তাকে পাখী আখ্যা দেওয়া যায় না'। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে ডিমের ভেতর থাকে বলেই একদিনের শাবকটি আর

একদিনের পাখী রূপে দেখা দেয়, সুতরাং তার পক্ষী-জীবনকে সমগ্র করে জানতে হলে, তার অণ্ড-জীবনকে বাদ দিয়ে সেটা হতে পারে না।

এই পর্য্যায়ের বইগুলির মধ্যে 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' বইটির অভাব বহুদিন পর্য্যন্ত আমার পক্ষে ছিল একটি বিশেষ কষ্টের কারণ। অধুনা দুষ্প্রাপ্য হিতবাদী প্রকাশিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে এই বইটি যখন পড়ি, তখন আমি নিজে বালক—সুতরাং বালকের চোখ দিয়ে দেখা ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের সেই পথ-ঘাট ও দর্শনীয় বস্তুগুলির বর্ণনা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রীতি, সংস্কার ও সভ্যতার সেই তুলনামূলক বিতর্ক মনকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। তারপর আর এ বই চোখে দেখিনি। রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা সম্বন্ধে একটা আলোচনা করার ইচ্ছা ছিল অনেক দিন থেকে, কিন্তু এই বইটির অভাবেই তা হয়ে ওঠে নি। সৌভাগ্যের বিষয় এই বইটি এবং এর বারো বৎসর পরে লেখা ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী একত্র যুক্ত হয়ে ইদানীং পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। যতদূর মনে হয়, পুরনো ইউরোপ প্রবাসীর পত্রে পাদটীকায় ভারতী সম্পাদকের কিছু কিছু টিপ্পনী ছিল, বর্ত্তমানে সেগুলি দেখলাম না, দু'-এক জায়গায় অল্প-বিস্তর রিপু করা হয়েছে বলেও মনে হল। তা হক, তবু বইটি পেয়ে আমি বিশেষ সুখী হয়েছি। এতে বা এর অনুগামী ডায়েরীতে আমরা যে প্রতীচ্যের দেখা পাই, (প্রাক-মহাযুদ্ধের সেই সদ্য-Industrialised ইউরোপ আজ আর নেই—তার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে মহাযুদ্ধের প্রবল বন্যা, সমাজতন্ত্রবাদের তুমুল তুফান—সমাজ, রাষ্ট্র, শিল্প, সংস্কৃতি সমস্ত তার উল্টেপাল্টে আজ অন্য এক দিকে ছুটে চলেছে! তবু এ লেখাগুলো পুরনো খবরের কাগজের মতো বাসি হয়ে যায় নি, তার কারণ আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে গন্তব্য স্থানটা কোন দিনই সব চেয়ে বড় নয়, যাবার ধরণটাই তার আসল জিনিষ। অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রম

করেও সেই বিশিষ্ট শিল্পীক গুণের জন্যেই এ বইটি আজো সুখপাঠ্য। রবীন্দ্রনাথ যে বয়সে প্রথম বিলাত যান, সে বয়সে সেদিন বাঙালীর ছেলের নাবালকতা ঘোচাই ছিল কঠিন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে বাল্যেই বাঙালীত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠেছিলেন, সেকথা এই পত্রগুলির যে-কোন পৃষ্ঠা খুললেই বোঝা যায়। মাঝে মাঝে বয়সোচিত ঝাঁজ আছে, এবং অহেতুক বক্রোক্তিও আছে স্থানে স্থানে, কিন্তু তথাকথিত সিভিলিয়ানদের লেখায় যে আত্ম-বিস্মৃত অভিভূতির পরিচয় পেয়ে লজ্জা হয়, রবীন্দ্রনাথ ছেলে বয়সেই তা থেকে আশাতীত রকম মুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া ইউরোপ প্রবাসীর পত্র আর এক দিক থেকে বিশেষ ভাবে প্রণিধান করার যোগ্য। মধ্য বয়সে রবীন্দ্রনাথ গদ্যে ধ্বনিবহুল ক্ল্যাসিকাল রীতির পক্ষপাতী হলেও, সাহিত্যিক জীবনের একেবারে আরম্ভেই কিন্তু কথ্য ভাষা নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। কথ্য ভাষায় লেখা বাংলা বই হিসাবে ইউরোপ প্রবাসীর পত্র প্রথম নয়—কিন্তু সাহিত্যিক সুষমায় সমৃদ্ধ কথ্য ভাষা এর পূর্ব্বে কোন বইয়েই ব্যবহৃত হয় নি।

সাহিত্যের পথে ঃ ‘সাহিত্য ধর্ম্ম’ ও ‘সাহিত্যের নবত্ব’ এই দুটি প্রবন্ধ নিয়ে বছর বারো আগে এদেশে ভয়ানক হৈ চৈ হয়ে গেছে। এই দুটি প্রবন্ধে এবং এদের অনুপূরক ‘বাস্তবতা’, ‘সাহিত্য বিচার’, ‘আধুনিক কাব্য’ ইত্যাদি প্রবন্ধে আধুনিকতা সম্বন্ধে কবির একটি সুস্পষ্ট অভিমত পাওয়া যায় এবং সে অভিমত আধুনিকতার প্রতিকূলে।

কবি মোটামুটি যা বলেন তা হচ্ছে এই যে যা প্রত্যক্ষ, যা স্থূল, যার উদ্ভব প্রয়োজনে, নয়ত উত্তেজনায়, যার প্রসার ইন্দ্রিয় সীমায় আবদ্ধ—এমন জিনিষ সাহিত্য নয়। এমন জিনিষ নিয়ে যখন সাহিত্য সৃষ্টি করতে যাওয়া হয়, তখন স্বভাব-ধর্ম্মেই তা কৃত্রিম হয়ে দাঁড়ায়। তার বহিরঙ্গিক জৌলুষ সাম্প্রতিকের মনোহরণ করে বটে, কিন্তু চিরন্তন মানব-মনের

সঙ্গে তার মেল-বন্ধন হবার সম্ভাবনা কম। কাজেই বাস্তব-ঘেঁষা এই আধুনিকতা সাহিত্যকে কোন ক্রমে জলাচরণীয় রাখলেও, তার আভিজাত্য নষ্ট করেছে। এই সঙ্গে কবি একথাও বলেন যে, সত্যিকার সাহিত্যের পক্ষে বিগত কালের প্রশ্নও যেমন নিরর্থক, আজকের প্রশ্নও তেম্নি অর্থহীন। আজো যা সাহিত্য তা এনামেল করা ফ্যাসানের জোরে নয়—তার অন্তর-সম্পদের জোরেই। যা এই রসাদর্শ থেকে ভ্রষ্ট, তা হট্টগোল করে যতই বাজার মাৎ করুক, আসলে তা হল খেলো জিনিষ।

বলা বাহুল্য একথা প্রতিবাদ সাপেক্ষ। কিন্তু একথা বলছেন এমন কেউ, যাঁর প্রতিবাদে লেখনী ধরতে স্বভাবতই সঙ্কোচ বোধ করি। তবু যে কথাটা এই প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথম মনে আসে, তা না বললেও অন্যায় হবে মনে করি। তাই সসঙ্কোচেই আমার বক্তব্য বিষয়টা বলছি। একথা অবশ্যই ঠিক যে সাহিত্য শুধু বর্ত্তমানের জন্যে নয়—আজকের যে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাল তা নাও থাকতে পারে—সুতরাং কেবলমাত্র আজকের দিকে বদ্ধদৃষ্টি হয়ে সাহিত্য রচনা করলে, তা প্রয়োজন সাধনের অন্যান্য বাস্তব উপকরণগুলির মতোই একদিন বাসি হয়ে যাবে। তাই সাহিত্যের লক্ষ্য গভীরতর সুদূরতর হওয়া দরকার। কিন্তু একথাও ঠিক যে মানুষের মন একটি বিশেষ কেন্দ্রে যুগ যুগ ধরে আবদ্ধ থাকে না—তার পরিবর্ত্তন হয়ই। ভেতরকার পরিবর্ত্তন তার বাইরের ফ্যাসানকে বদলে দেয়, নয়ত বাইরের অবস্থান্তর তার ভেতরে পরিবর্ত্তনের স্রোত নিয়ে আসে। এ না হলে গুহাবাসের আদিমতা থেকে মানুষের মুক্তিই ছিল না কোনদিন। সুতরাং সাহিত্যের আদর্শ-বিপর্য্যয়কে অস্বীকার করা যায় না। যেটাকে বিপর্য্যয় বলা হচ্ছে, সেটা যে কেবলমাত্র ফ্যাসানের খাতিরেই জন্মেছে তা নয়—তার ঐতিহ্য ঘটনাক্রমে এমন ভাবেই পরিবর্ত্তিত হয়েছে যে তার

পক্ষে এই বিপর্য্যয়ই হয়েছে অনিবার্য্য। তা ছাড়া এটা বিপর্য্যয়ই বা কেন ?

প্রকাশ্য রাজপথে যে কেবলমাত্র দৃষ্টি-আকর্ষণের জন্যে চীৎকার করে, সে হয়ত উপহাসাস্পদ। কিন্তু দস্যুহস্তে হৃতসর্ব্বস্ব হয়ে যে চীৎকার করে, তার কি চীৎকারের সঙ্গত অধিকার নেই? হয়ত নিস্তব্ধতাই তার পক্ষে শোভনতর নাগরিকতার পরিচায়ক হতো, কিন্তু মানুষের হৃদয়-ধর্ম্মের তা বিরোধী। তথাকথিত আধুনিকতা এই হৃদয়-ধর্ম্মের অনুগমনকে বড় করে দেখেছে, এবং এখানেই তার ভূতপূর্ব্বের সঙ্গে বিরোধ। এ বিরোধের হয়ত কোনদিন মীমাংসা হবে, কিন্তু সেদিন আমরা কেউ থাকবো না।

(আধুনিকতার অজুহাতে অনেক মেকী জিনিষও মাথা তুলেছে সন্দেহ নেই এবং তাদের পরমায়ুও যে সীমাবদ্ধ, সে কথা সুনিশ্চিত। কিন্তু তারি সঙ্গে এমন জিনিষও হয়ত আসছে, যার স্থিতি সাম্প্রতিকের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকবে না। একথা জোর করে বলার সাহস হয় না, কিন্তু যে যুগে আমরা বেঁচে আছি, তার ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করতেও আমাদের বাধে। আমাদের ক্রিয়ায় কর্ম্মে, চিন্তায় চেষ্টায়, দর্শনে বিজ্ঞানে, আজ পূর্ব্বতনের সঙ্গে একটা স্পষ্ট বিরোধ ঘটে গেছে। এক পারে তাঁরা, আর এক পারে আমরা—মধ্যে মহাসমর, যা শুধু জগতের ভৌগোলিক সংস্থানকেই উল্টেপাল্টে দেয় নি, তার সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও দিয়েছে আমূল ভেঙেচুরে। এর পর অতি-প্রাকৃতের প্রতি, সুন্দরের প্রতি, চিরন্তন সত্যের প্রতি মানুষের বিশ্বাস বা আস্থা থাকাই কঠিন।)

অবশ্য মানুষের মনে সুন্দরের ক্ষুধা, অতি-প্রাকৃতের ক্ষুধা আছেই

—আজকের লক্ষ বিক্ষোভের ভেতরও তা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গেই জেগে উঠেছে অন্যান্য ক্ষুধা, যা হয়ত আগেও ছিল, কিন্তু সম্মানার্হ বা স্বীকৃত ছিল না বলেই সাহিত্যে তাদের রূপ পাওয়া যায় নি। আজকের সাহিত্য তাদের স্বীকার করছে—নূতন বলে একটু বেশী করেই করছে বলতে পারি। একে সুন্দরের চিরন্তনতা থেকে অসুন্দরের সাময়িকতায় লাফিয়ে পড়া বলতে পারি না—এ একটা নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী, যা যুগধর্মে আপনিই আত্মপ্রকাশ করেছে।

বস্তুতঃ যন্ত্র বিজ্ঞানের অত্যধিক প্রসার যেমন আজ মানুষকে বহুবিধ প্রাকৃতিক বাধার ওপর দিয়েছে আধিপত্য, তেমনি মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও দর্শনের নবতম দৃষ্টি-ভঙ্গী তার জীবনাদর্শকেও আমূল ঢেলে সেজেছে। এই ভেতরে-বাইরে যুগপৎ পরিবর্ত্তনের মধ্যে থেকে তার সাহিত্যিক আদর্শ অবিকৃত থাকতে পারে নি—তা পারা স্বাভাবিকও নয়। কিন্তু তাতে সাহিত্যের প্রাণ-সম্পদ বৃহত্তর পরিণতির পথেই আসছে কিনা, কে জানে? কুঙ্কুম, কাজল, দুকূল বসন বা মেখলা-মঞ্জীরের স্থানে রুজ, পাউডার, ব্লাউজ, হাই হিল আমদানির মতো সাহিত্যের আধুনিকতাকে আমরা নিতান্তই বহিরঙ্গিক ব্যাপার বলতে পারি না।)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্যের প্রসঙ্গে আধুনিকতা সম্বন্ধে এত বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন কি ছিল, এ প্রশ্ন অনেকে করতে পারেন। যাঁরা কবির ইদানীন্তন প্রবন্ধ-সাহিত্য পড়েছেন, তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে আধুনিকতা বনাম চিরন্তনতা নিয়ে কবি যে সমালোচনার সূত্রপাত করেছেন, তাতে প্রকারান্তরে আমাদেরকেও এই আলোচনায় হস্তক্ষেপ করতেই বলা হয়েছে। কবির আধুনিক গদ্য রচনা বুঝতে হলে এ আলোচনার প্রয়োজন নিতান্ত কম নয়।

[৫] রবীন্দ্রনাথের নাটক

রবীন্দ্রনাথের সৃজনী-প্রতিভার একটি বৃহৎ অংশ তাঁর নাট্যসাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম যৌবন থেকে সুরু করে, একেবারে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তিনি অল্লাধিক কুড়িখানা নাটক রচনা করেছেন। দু-একখানি ছাড়া তাঁর কোন নাটকই বাংলা রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সমাদৃত হয় নি, কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্রমাভিব্যক্তিতে তাঁর দানের পরিমাণ যে কম নয়, এ কথা সাহিত্যরসিকমাত্রেই স্বীকার করবেন। দুর্ভাগ্য-বশতঃ কবির নাট্যসাহিত্য তেমন করে দেশের সমালোচক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি, তাই সে সম্বন্ধে এখনও পর্য্যন্ত নির্ভরযোগ্য কোন বইও লেখা হয় নি। বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধ সেই অভাব পূরণ করার জন্যেই লেখা হচ্ছে না—যাতে এদিকে সুধী জনের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তারই প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছে মাত্র।

কবির বহুবিস্তৃত নাট্যসাহিত্যকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। (বলা বাহুল্য ছক কেটে সাহিত্যের শ্রেণী নির্ণয় কোন দিনই হতে পারে না, বিশেষতঃ রবীন্দ্রসাহিত্যের, যার একের সঙ্গে অন্যের আকৃতিতে কিছু মিল থাকলেও, প্রকৃতিতে আগাগোড়াই অমিল। সুতরাং তাঁর কোনও দুখানি বইকে এক লেবেলভুক্ত করা সঙ্গত হয় না। তবু মোটা কথার একটা হিসেব চলতে পারে বৈকি !) সেদিক থেকে প্রথম ভাগে পড়ে দ্বন্দ্বনাট্য—প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিসর্জ্জন, রাজা ও রাণী, চিত্রাঙ্গদা, নটীর পূজা। দ্বিতীয় ভাগে রঙ্গনাট্য—চিরকুমার সভা, বৈকুণ্ঠের খাতা, গোড়ায় গলদ (শেষ রক্ষা), শোধবোধ। তৃতীয় ভাগে রূপক নাট্য—রক্তকরবী, ডাকঘর,

ফাল্গুনী, রাজা, অচলায়তন, অরূপ রতন, মুক্তধারা, শারদোৎসব। মায়ার খেলা প্রভৃতি গীতিনাট্যকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করা চলে না—ওরা ঠিক নাটক নয়, ওদের বিশিষ্টতা গানে—নাটকীয় আকারটা ওদের গানের মালায় সূত্রের মতো শুধু গ্রন্থনের উপায়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এই হল সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের নাট্যগ্রন্থাবলী। এর মধ্যে প্রথম পর্য্যায়ের নটীর পূজা ছাড়া আর সমস্তই এবং দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সমস্তই কবির যৌবনের রচনা। পরে এদের কোন-কোনটার কবি পুনর্লিখন করেছেন, যেমন রাজা ও রাণীকে তপতী করেছেন, গোড়ায় গলদকে করেছেন শেষরক্ষা। আর তৃতীয় পর্য্যায়টি সমগ্রভাবেই তাঁর পরিণত বয়সের রচনা। এঁদের জন্ম কবির নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পর, যে সময় থেকে কবির রচনা মিষ্টিক পন্থা অনুসরণ করেছে।

এই তিন পর্য্যায়ের মধ্যে প্রথম দুই পর্য্যায়ের আমি সবিশেষ অনুরাগী। বাংলা দেশে অনেক নামজাদা নাট্যকার হয়েছেন, তাঁদের নাটকও আছে অনেক—কিন্তু বিসর্জ্জন, চিত্রাঙ্গদা, চিরকুমার সভা বা গোড়ায় গলদের মতো বই আমাদের ভাষায় আর লেখা হয় নি। গিরিশচন্দ্রের ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক, অমৃতলালের রঙ্গনাট্য রঙ্গমঞ্চের দিক থেকে হয়ত অনেক বেশী সার্থক রচনা, কিন্তু সাহিত্যের উচ্চ সমাজে এই সমস্ত বই খুব বড় মর্য্যাদার দাবি করতে পারে কি না সন্দেহ। এইসব রচনার পাশে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে দাঁড় করিয়ে দেখলেই এদের সাহিত্যিক কৌলীন্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্য বাংলা রঙ্গালয়ের প্রচলিত ঐতিহ্য থেকে জন্মায় নি বলেই এটা হয়েছে। এরা জন্মেছে কবির অনন্যসাধারণ সৃজনীশক্তির প্রেরণায়, আর ইউরোপীয় নাট্য-সাহিত্যের প্রভাবে।

চিরাচরিত ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর সন্দেহাকুল প্রশ্নের আবির্ভাবে বিসর্জ্জনের যে ট্র্যাজেডি বা রূপ-যৌবনের সাময়িক মদিরায় আত্মবিস্মৃত প্রেমের স্বপ্নভঙ্গে চিত্রাঙ্গদার যে ট্র্যাজেডি, অনন্যনির্ভরশীল দাম্পত্য-বন্ধনের মধ্যে নারীর ব্যক্তিত্ববোধের জন্মে রাজা ও রাণীর যে ট্র্যাজেডি বা সন্ন্যাসের আপাত কঠোরতার অন্তরালে, মানবীয় হৃদয়দৌর্ব্বল্যের সহসা উদ্ভবে প্রকৃতির প্রতিশোধের যে ট্র্যাজেডি—তা বাংলার বস্তুধর্ম্মী নাট্যসংসারে একেবারেই অপরিজ্ঞাত। এদের উৎস হচ্ছে ইউরোপীয় ট্র্যাজেডি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডিগুলির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বাইরের সমস্ত ব্যবস্থাকে অব্যাহত রেখেই, অন্তরে অন্তরে কি বিপর্য্যয়ের ঝড় উঠতে পারে এবং সেই ভাঙনের ধাক্কায় মানুষের জীবনধারায় যে কি শোচনীয় ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে, তাঁর ট্র্যাজেডিগুলিতে তার ভাষা পাওয়া যায়। এদের দ্বন্দ্ব বহিরঙ্গিক ব্যাপারকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব নয়, এদের দ্বন্দ্ব আদর্শের সঙ্গে আদর্শের দ্বন্দ্ব, ভাবের সঙ্গে ভাবের দ্বন্দ্ব। তাই এদের ট্র্যাজেডি বাইরের খুনোখুনি বা রক্তারক্তির অপেক্ষা রাখে না—বাইরে অনেক সময় একটি দীর্ঘশ্বাসেরও অবকাশ থাকে না, অথচ প্রবল ভূমিকম্পে হৃদ-জগৎ নিঃশব্দে চুরমার হয়ে যায়।

সেক্সপীয়ারের এ ট্র্যাজেডির ভাষা আছে, কিন্তু তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব বহিঃসংঘাতকে অবলম্বন করে। জীবনের প্রতি পাদক্ষেপে মানুষের ভুল চাল বা অন্যায়পনা তাকে ও তার আবেষ্টনীকে কি ভাবে রূপান্তরিত করে, তিনি তাই দেখিয়েছেন। গোয়েটের দ্বন্দ্বে প্রাকৃতের সঙ্গে অপ্রাকৃতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই একান্তভাবে ক্রিয়াশীল। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা তাঁর ট্র্যাজেডিতে অনেকটা যন্ত্রবদ্ধ, অনেকটাই প্রাক্‌ব্যবস্থিত। ইবসেনের ট্র্যাজেডি লৌকিক পরিবেশকে আশ্রয় করে, হঠাৎ একটা

দীর্ঘদিন পোষিত ফাঁকি ধরা পড়ে যাওয়া বা একটা নিষ্ঠুর সত্য নিবারণ হয়ে যাওয়া বা সেই রকম একটা আকস্মিক ব্যাপারকে উপলক্ষ করেই তাঁর ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডি অনেকটা রবীন্দ্র-ট্র্যাজেডির মতোই নৈর্ব্যক্তিক। বিশ্বমানবের মনোবৃত্তির একটা-না-একটা পর্য্যায়ের সঙ্গে বিপরীতমুখী একটা-না-একটা শক্তির সংঘর্ষ নিয়েই এদের ট্র্যাজেডি। বিসর্জ্জন নাটকে জয়সিংহের মৃত্যুর একটা ঘটনা আছে বটে, কিন্তু ওর ট্র্যাজেডি তাতেই নয়। আধ্যাত্মিক প্রভুত্বের সঙ্গে রাষ্ট্রিক প্রভুত্বের যে বিরোধ, তারই শোচনীয় পরিণতিতে হল ওর ট্র্যাজেডি—জয়সিংহ তাতে একটা বুদ্বুদ, অপর্ণা আর একটা—এবং রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্য পরস্পর-বিরোধী ভাবের প্রতীক রূপে আরও দুটি বুদ্বুদ। রাজা ও রাণী বা প্রকৃতির প্রতিশোধের মর্ম্মকথাও এইভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। এখানে বলে রাখা দরকার যে এগুলি নাটকাকারে লেখা হলেও, কাব্যধর্ম্মের প্রাবল্য এদের নাটকীয় সংস্থানকে হয়ত একটু ক্ষুণ্ণই করেছে। কিন্তু এদের অন্তর্গত যে ট্র্যাজেডি, তা ভাবের ট্র্যাজেডি। চিত্রাঙ্গদার যৌবন ও রূপ-লাবণ্য অপগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্জ্জুনের স্বপ্নভঙ্গ হওয়া এবং তা থেকেই উভয়ের দাম্পত্য বন্ধন শিথিল হয়ে যাওয়ার ভেতর দিয়ে মূলে একটি তত্ত্বই রূপায়িত হয়েছে, তার এক দিকে অর্জ্জুন, অন্য দিকে চিত্রাঙ্গদা। এই তিনখানি নাট্যকাব্যের পাত্রপাত্রীরা সকলেই অল্পবিস্তর নৈর্ব্যক্তিক—তারা চিন্তাসমষ্টির এক-একটি নিরুপাধিক প্রতিভূ স্বরূপ। অর্থাৎ তারা স্ব স্ব রূপে আত্মস্বতন্ত্র চরিত্র নয়, তাদের সকলেরই সত্তার মূল নিবদ্ধ কবির subjective মনে, তারা কেউ তাঁর ভাবদ্বন্দ্বের এ-দিক, কেউ ও-দিক। তাদের ষোল-আনা পরিভ্রমণ কবিকে কেন্দ্র করে, দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে নয়। সেই জন্যেই খাঁটি জাতের নাটক না বলে আমরা এগুলিকে নাট্যকাব্য আখ্যা দিয়েছি। বিয়রনসনে বা ইবসেনে কাব্যের

অবকাশ কম, শ-তে ত তা নেইই। তা সত্ত্বেও তাঁদের বইকেও খাঁটি জাতের নাটক বলা যায় না। প্রথম দু'-জনের প্রচারকার্য্য এবং তৃতীয়ের প্রজ্ঞামূলক কচকচি চরিত্র-বিকাশের পথে রীতিমতো বাধা স্বরূপই হয়েছে। তা সত্ত্বেও এঁদেরই হক, আর রবীন্দ্রনাথেরই হক, নাট্যরচনাবলী প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যরূপে গৃহীত হয়েছে, তার কারণ এঁদের দৃষ্টি-ভঙ্গী ও লিখন পদ্ধতিতে সেই সত্যকার শিল্পীক উৎকর্ষ দেখা যায়, যা স্থায়ী সাহিত্যের কুললক্ষণ।

কিন্তু কমেডিতে কবির নাটকীয় বৈশিষ্ট্য সত্যিই অতুলনীয়। কবির কমেডিগুলিতে কোনও গুরুভার সমস্যা নেই, কোনও তত্ত্ব তথ্য নেই। বাস্তব সংসার থেকে চয়ন করে কবি এমন কতকগুলি নরনারীকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন, যারা রক্তমাংসের মানুষ। বৈকুণ্ঠের খাতার বৈকুণ্ঠ, গোড়ায় গলদের গদাই, চিরকুমার সভার অক্ষয়··· কেউই কোনও বাণীর বাহক নয়, তারা বিশ্বমানবের প্রতিনিধি নয়, তারা স্ব স্ব খেয়াল, সংস্কার ও অভ্যাস নিয়ে সম্পূর্ণ এক-একটি মজার মানুষ। তাদের কথাবার্ত্তা, কাজকর্ম্ম, ভঙ্গীরঙ্গি, সমস্তই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পশ্চাদ্‌ভূমি থেকে আহৃত, যদিও প্রাত্যহিকতার মালিন্য নেই তাদের। তারা নিজেদের দুঃখ-সুখের টানা-পোড়েনে নাটকীয় পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, নিজেরা তারা জানেও না, তারা অন্যকে কি ভাবে হাসাচ্ছে। জেনে হাসালে এগুলো নাটক হতো না, হতো ফার্স! তাদের চরিত্রের মূলসূত্রগুলি পাঠকের চোখে উদ্ঘাটন করেই কবি আড়াল থেকে বাজিকরের মতো তাদের নাচিয়ে গেছেন, অনেকটা মলেয়ার বা শেরিডানের মতো। ঘটনার স্রোতে তারা ছুটে চলেছে, আমরা সেই চলমান জীবনস্রোতের ভিতর দিয়েই তাদের চারিত্রিক বিশেষত্বগুলো চিনে নিই এবং কৌতুক পাই। কবি চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের তা দেখিয়ে

দেবার চেষ্টা করেন নি কোথাও, যা সস্তা দরের কমিক লিখিয়ে প্রায়ই করে থাকেন। অবশ্য চিরকুমার সভার হাস্যরস সময় সময় চরিত্র বা ঘটনাকে ছেড়ে কেবলমাত্র শব্দকে ভর করে এবং সেখানে প্রয়োজনের চেয়ে প্রয়াসটা বড় হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু গোড়ায় গলদ বা বৈকুণ্ঠের খাতা বিশেষতঃ বৈকুণ্ঠের খাতা সংযত মার্জ্জিত, শিষ্ট হাস্যরসের আদর্শ রচনা। হয়ত ওদের সুর একটু বেশী সূক্ষ্ম, মোটা কানের পক্ষে পরিমিত। সেই জন্যেই বোধ করি মঞ্চে এরা খুব বেশী জমে না।

কবির তৃতীয় পর্য্যায়ের নাট্য রচনাবলী সম্বন্ধে আমার ধারণা আজও বেশ স্পষ্টতা লাভ করে নি। রাজা, রক্তকরবী, ফাল্গুনী, ডাকঘর প্রভৃতি পড়তে খুবই ভাল লাগে, শাণিত তরবারির মতো তীক্ষ্ণ কথার খেলা চমক লাগায়। কিন্তু মনে হয়, রূপকের গহনে ওদের আখ্যান-বস্তুর তন্তুতে প্রতি মুহূর্ত্তে জোট পাকিয়ে যাচ্ছে, শেষ পর্য্যন্ত রূপকের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকছে না—রূপকে ও প্রত্যক্ষে মেলামেশা হয়ে যাচ্ছে, চরিত্রগুলো হচ্ছে নিরবয়ব, গতিহীন এবং প্রতিপাদ্য দুর্নিরীক্ষ্য। যে কোনও সিদ্ধান্ত খাড়া করে ওদের উপর আরোপ করা যেতে পারে এবং যে কোনও রহস্য খুঁজে বার করে ওদের উপর চাপানো যেতে পারে। কিন্তু সহজ দৃষ্টিতে যা ধরা পড়ে না, তা খুঁজে বার করে রসোপলব্ধি সম্ভব নয়। তাই মনে হয়, কবির এই পর্য্যায়ের নাটক সর্ব্বসাধারণের জন্যে নয়। বলা বাহুল্য আমরা সেই সাধারণেরই দলভুক্ত।

নন্দিনীকে বা বিশু পাগলাকে, কবিকে বা রাজাকে আমাদের বেশ লাগে। কিন্তু তাদের কথাবার্ত্তা ও কার্য্যকলাপ বিশ্লেষণ করে আমরা সুস্পষ্ট কোনও ব্যঞ্জনার নির্দ্দেশ পাই না। মেটারলিঙ্কের আদর্শে কবি এই নাটকগুলো লিখেছিলেন শুনেছি। মেটারলিঙ্কের সাধারণ নাটকগুলি বিশেষ আনন্দের সঙ্গেই পড়েছি, কিন্তু তাঁর সিম্বলিক নাটক আমার সহ্য

হয়নি। যে কোনও 'ইজম'ই থাক তার ভেতর, তা সহজবোধ্য নয়। স্বয়ং টলষ্টয়ই তার অর্থ বার করতে হয়রান হয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য সম্বন্ধেও আমরা [illegible] অনাসক্তি জ্ঞাপন করেই ক্ষান্ত হতে চাই। যদিও এ কথা আবার বলবো যে, বইগুলো পড়তে খুবই চমৎকার লাগে। কেমন একটা আবছা আবছা ব্যঞ্জনা, সব কিছুর সমবায়ে কেমন একটা অন্তর্গূঢ় লিরিকস্বপ্নের মতো লাগে!

এইখানেই মোটামুটিভাবে রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যের আলোচনা শেষ হল। এর পর কবির আর দুখানি নাটক বেরিয়েছে—তপতী ও বাঁশরি। কবির কাব্যজীবনের শেষপর্ব্বের এই দুটি বই থেকে নাটককার হিসাবে তাঁর সামর্থ্য নিরূপণ করতে বসলে, আমরা অন্যায় করবো বলেই তাঁর সময়কালের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি নিয়ে বিস্তৃততর আলোচনা করেছি। বাঁশরি পড়লে মনে হয়, কবির লেখনীতে আর সেই ক্ষিপ্রতা, সেই প্রাণবন্ত ভাষার সহজলীলা নেই—তাতে ক্লান্তির ছায়া পড়েছে। রাজা ও রাণীর পুনর্লিখন করে তপতী নাটক রচিত হয়েছে, এতে রাজা ও রাণীর সেই কাব্যসুষমা নেই—কিন্তু তার স্থানে সজীব নাটকীয় বৈশিষ্ট্য দানা বেঁধে উঠেছে। তাই এ বইটিকে রবীন্দ্রনাথের লিরিকধর্ম্মী অন্যান্য গদ্য নাটিকার ভিতর বেশ একটি স্বাতন্ত্র্য দিয়েই চিহ্নিত করা যায়।

[৬] পত্রসাহিত্য

বাঙালী পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্য সুপরিচিত। দীর্ঘকাল হল তাঁর ছিন্নপত্র বের হয়েছে—তারপর ভানুসিংহের পত্রাবলী এবং রাশিয়ার চিঠি। ছিন্নপত্রে তরুণ রবীন্দ্রনাথ বস্তু-সংসারে নিত্যকার সুখ-দুঃখ আলো-ছায়ার যে সহজলীলা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, তাকেই অনাড়ম্বর সহজ ভাষায় রূপ দিয়েছেন। অনায়াসে লেখা বলেই সেগুলোর ওপর কোথাও কৃত্রিমতার ছাপ নেই। এক একটি চিঠি, এক একটি ছবির মতো আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ—তার আড়াল থেকে রচয়িতার যে রূপটি পাওয়া যায়, তা একটি ভাবমুগ্ধ কবির রূপ। ভানুসিংহে কিন্তু এ রূপের পরিবর্তন ঘটেছে—যদিও ভানুসিংহ চিঠিগুলো লিখেছিলেন একটি ন'বছরের বালিকাকে এবং এর অন্তর্গত ছোটখাটো নানা হাসিঠাট্টার ইঙ্গিত সেই উদ্দেশ্যেরই সমর্থন করে, তবু মনে হয় ভানুসিংহের অবলম্বন বস্তু-সংসার ও তার বিচিত্র বৃহৎ রূপলীলা নয়—এর বিষয় কবি রবীন্দ্রনাথের মনোজগতের ভাবলীলা। বস্তু-জগৎ অনেকটা আমাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যেই—কাজেই তাকে যখন বর্ণনার বিষয় করা হয়, তখন আমরা অভ্যস্ত পথে হাঁটতে হাঁটতেই অনভ্যস্ততার চমকে দিশেহারা হই—সেইটুকুই তার দান। কিন্তু হৃদয়-রহস্যের অপ্রবুদ্ধ অনুভূতি ছাড়া প্রাকৃত জনের পুঁজি বড় বেশী কিছু নয়—তাই মনের গহনে অহরহ নানা বহিসংঘাতকে উপলক্ষ্য করে যে সব ছোটবড় আবর্ত্ত রচিত হয়, সেখানে কল্পনা ও স্বপ্নের ওপর বরাত না দিয়ে উপায় নেই। তাই মনে হয়, ছিন্নপত্র অতি সহজ স্বভাবোক্তির কবিতা, আর ভানুসিংহ নিগূঢ় ভাব-ব্যঞ্জনাময় লিরিক কবিতা।

রাশিয়ার চিঠি এ দুই থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতের জিনিষ। ওতে

কোথাও কোন অনুভূতি, কল্পনা বা অলঙ্করণের বাষ্প নেই, সহজ দৃষ্টিতে রাশিয়ার সমাজ, রাষ্ট্র এবং শিক্ষায়তনের যে রূপ কবি দেখেছেন, তাকেই সর্ব্বজনবোধ্য করে যুক্তিতর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণ সহকারে বুঝিয়েছেন। সেখানে বক্তব্যটাই তাঁর বড় কথা এবং সেটাকে সুন্দর করে, স্পষ্ট করে, বলাটাকেই তিনি লক্ষ্য হিসাবে নিয়েছেন। ছিন্নপত্রে বা ভানুসিংহে আমরা যে ভাবাবেগের সহজ অজস্রতা ও লিপিচাতুর্য্যের সুসঙ্গত পরিপাটিতা দেখি, রাশিয়ার চিঠিতে তার বদলে দেখি, একটা সুস্পষ্টতা, একটা প্রজ্ঞাশীল বিশ্লেষণমুখিতা। এ ছাড়া আর একটা জিনিষ দেখি, সেটাই এই প্রসঙ্গে সব চেয়ে বড় লক্ষ্য করার বিষয়, ছিন্নপত্র বিশেষভাবে আত্মকেন্দ্রিক—সেখানে দ্রষ্টা বা বোদ্ধারূপে কবি দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর উপলব্ধিকে রূপ দেননি, তিনি নিজেকে তাঁর প্রতিপাদ্যের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে নিয়ে দেখেছেন—কাজেই বাইরেটার ওপর যেমন এসে পড়েছে তাঁর আলো, তেমনি তাঁর ওপরেও এসে পড়েছে বাইরের আলো—পরস্পরের আলোকে পরস্পরের রূপ অধিকতর সুন্দর হয়ে ধরা পড়েছে ভাষার মায়াজালে। ভানুসিংহ সে হিসাবে অনেকটা নির্ব্যক্তিক, কিন্তু তাতেও আমরা কবির ব্যক্তিসীমাকে একেবারে ছাড়িয়ে যাই নে। তাঁর হৃদয়-রহস্যের আরোহ-অবরোহের মধ্যে দিয়েই তাঁর কল্পসত্তার স্পর্শ পাই—যা তাঁর প্রাত্যহিক জীবনকে উজ্জ্বলতর করে আমাদের চোখে ফুটিয়ে তোলে। রাশিয়ার চিঠি সে হিসাবে প্রবন্ধ এবং সর্ব্বথা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। এগুলো কোন কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছিল সত্যি, কিন্তু আসলে এগুলোতে লক্ষ্য করা হয়েছিল সাময়িক পত্রিকার স্তম্ভকে। তাই ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রচ্ছন্ন পদসঞ্চারে ওরা রসাত্মক সৃষ্টি হয়ে ওঠেনি। ওরা হয়েছে তত্ত্ব-বিচার। কবি ওগুলি লিখেছেন কর্ত্তব্যবোধে, আনন্দ বশে নয়।

এতদিন রবীন্দ্রনাথের পত্র সাহিত্য বলতে মোটের ওপর আমাদের এইটুকু মাত্র পুঁজি ছিল। এছাড়া সাময়িক পত্রে তাঁর বিভিন্ন সময়ের লেখা কতক কতক চিঠির সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে—তারপর আর কিছু না। কিন্তু যা এ পর্য্যন্ত সাধারণের গোচরে এসেছে, তা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র পত্র-সাহিত্যের এক-চতুর্থাংশ মাত্র। অবশিষ্ট অংশ এতকাল তাঁর প্রকাশ বিভাগের দপ্তরেই আটক ছিল। সম্প্রতি তা থেকে নির্ব্বাচন করে আর এক খণ্ড বই বের করা গেল। এই প্রসঙ্গে পত্রধারা সম্পাদনে যে পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে, তার একটু আভাস দেওয়া যেতে পারে।

কবির নিজের অভিপ্রায় এই ছিল যে, যে সমস্ত চিঠি মূলতঃ তত্ত্ব-বিচার, তথ্য প্রচার বা মতবাদ বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ, প্রত্যক্ষতঃ যা সাহিত্য নয়—যা হয় বিতর্ক, নয় ভ্রমণ বিবরণ, নয় আলাপ-আলোচনা, সেগুলো চিঠির আকারে লেখা হলেও অনেকটা প্রবন্ধ গোত্রীয়, সুতরাং সেগুলিকে খাঁটি জাতের পত্র বলে গণ্য করা চলবে না—অর্থাৎ রাশিয়ার চিঠি বা পাশ্চাত্য ভ্রমণ বা এই জাতের রচনাগুলিকে প্রবন্ধ-সাহিত্যের অন্তর্গত করে দেখতে হবে। আর যে সমস্ত চিঠি লেখকের প্রাত্যহিক ছোট-বড় ব্যক্তিগত অনুভূতির রঙে অনুরঞ্জিত, অর্থাৎ যার গরিমা বিষয়-গৌরবের জন্যে নয়, আন্তরিক অনুভূতি ও মনোজ্ঞ প্রকাশ-ভঙ্গীর গুণে যা অনেকাংশে আত্ম-জীবনী-মূলক—(কারণ সত্যিকার আত্মজীবনী প্রত্যক্ষ জীবনের বিবরণ মাত্র নয়—তা হচ্ছে অন্তর-সত্তার নিত্য ক্রিয়াশীলতার ইতিহাস), তাই হল সত্যিকারের চিঠি, তাই এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সেই অনুসারে এই পর্য্যায়ের পত্র-সাহিত্যকে 'পত্রধারা' এই সাধারণ নামে অভিহিত করা হল এবং ছিন্নপত্রকে প্রথম, ভানুসিংহকে দ্বিতীয় এবং বর্ত্তমান বইকে তৃতীয় খণ্ডরূপে প্রকাশ করা গেল। পরবর্ত্তী খণ্ডগুলিতেও এই আদর্শই অনুসৃত হবে।

আলোচ্য খণ্ডের সম্পর্কে একটা কথা এখানেই বলে রাখা দরকার, এই পত্রগুলি সমস্তই লেখা হয়েছিল শ্রীমতী রাণী মহলানবীশকে, যেমন ছিন্নপত্র সমস্তই লেখা হয়েছিল শ্রীশ মজুমদারকে ও কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে এবং ভানুসিংহের পত্রাবলী লেখা হয়েছিল শ্রীমতী রাণু অধিকারীকে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন তৃতীয় বার ইউরোপ যাত্রা করেন, সে সময় শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবীশ এবং তাঁর পত্নী কবির সঙ্গে ছিলেন—কবি ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফিরলেন, কিন্তু মহলানবীশ দম্পতি ইউরোপেই থেকে গেলেন। ফেরার বেলা কবি পত্রযোগে তাঁদের সঙ্গে যে আদান-প্রদান করেছিলেন, তা প্রধানতঃ পথেই, তাই এই পত্রাবলীর নাম 'পথে ও পথের প্রান্তে'। অবশ্য কতকগুলি পত্র দেশে ফিরেও লেখা হয়েছিল।

ছিন্নপত্র বা ভানুসিংহের সঙ্গে এই খণ্ডের একটা প্রধান বিভিন্নতা চোখে পড়বে—তা হচ্ছে, এর দৃষ্টির ব্যাপকতা ও প্রকাশের স্পষ্টতা। এটা রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যের ক্রমপরিণতির নির্দেশক। এর মূলানুসন্ধান করলে স্বভাবতঃই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছাই—সময়ে-অসময়ে কোন প্রসঙ্গ, কোন ঘটনা, কোন চিন্তা বা ভাবকে আশ্রয় করে কবির চিত্তে যে দোলা লেগেছে, তাকে কবিতায় রূপ দিতে হলে, তাঁকে ছন্দ, অলঙ্কার ও আনুষঙ্গিক উপকরণের শরণাপন্ন হতে হতো,—আর যদি তাকে প্রবন্ধে রূপ দিতে হতো, তাহলে যুক্তি পরম্পরার অনুসরণ করতে হতো—তাতে দেখাতে হতো একটা আরম্ভ, একটা ক্রমিক গতি ও সবশেষে একটা পরিণতি—উভয় ক্ষেত্রেই যে কথাটা সহজে চিন্তাকে অধিকার করেছিল, তার মুখে লাগাম পরাতে হতো। অনেক ডালপালা ছাঁটতে হতো, অনেক ঘোরপ্যাঁচ অবলম্বন করতে হতো এবং কাব্য বা প্রবন্ধের প্রত্যাশিত ঐতিহ্যের অনুধাবন করতে হতো। তার চেয়ে চিঠির শরণাপন্ন

হওয়ায় একটা সুবিধা হয়েছে এই যে, এখানে কবি লেখনীকে অব্যাহত বেগে বহাতে পেরেছেন। এতে যেখানে কাব্য আসার, আপনিই এসেছে, যেখানে প্রবন্ধ হবার, আপনিই হয়েছে—অথচ দুটোকেই ছাপিয়ে একটা ব্যক্তিগত ভাবব্যঞ্জনা এদের ভেতরে ভেতরে প্রবাহিত হয়ে এদেরকে সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট জাতি-বিচারের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে। ফলে এদের মধ্যে একমাত্র যে ধর্ম্ম প্রকট হয়েছে তা নির্ভেজাল সাহিত্য-ধর্ম্ম। টুকরো টাকরা সুখ-দুঃখের, বিশেষতঃ হাসি-ঠাট্টার স্পর্শে এরা জীবন্ত ও মুখর। পাঠকের সঙ্গে কবির এদের ভেতর দিয়ে যেন হয়েছে সামনাসামনি বাণী বিনিময়। রবীন্দ্রনাথের সুবৃহৎ সাহিত্য শাখার ভেতর পত্র-পর্য্যায়টি যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, বরং অন্যান্য অনেক পর্য্যায়ের চেয়ে এর বিশিষ্টতা ঢের বেশী, সমগ্র পত্রধারা থেকে একথা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হবে আশা করা যায়।

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখকদের পত্র-সাহিত্য প্রায় নেই। বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনচরিতে তাঁদের যে পত্রাবলী আহৃত হয়েছে, তা বড় বেশী বৈষয়িকতাক্লিষ্ট—সাহিত্য হিসাবে তা উপভোগ্য নয়, যদিও জীবনে ইতিহাসের দিক থেকে তা বিশেষ মূল্যবান। মধুসূদনের পত্রগুলি সত্যিই সুন্দর—তাঁর সমুদয় রচনার মধ্যে এইগুলিই সমধিক প্রাঞ্জল, স্বচ্ছ এবং মর্ম্মানুগামী, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তার প্রত্যেকটিই ইংরেজীতে লেখা। নবীনচন্দ্রের 'প্রবাসের পত্র' সুখপাঠ্য এবং উপভোগ্য—কিন্তু বড় বেশী অগভীর। এ ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের বা স্বামী বিবেকানন্দের বিলাত ভ্রমণ সম্বন্ধীয় পত্রাবলী আছে, যা সাহিত্যাংশে অনেক স্থানে উপাদেয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তা যে উক্ত লেখকদ্বয়ের খুব বিশিষ্টজাতের রচনা নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্যের সাদৃশ্য ইংরাজী সাহিত্যে পাই—কুপার, শেলী, কীটস বা

বাইরণের কিংবা আধুনিককালে লরেন্স বা ব্রিজেসের পত্রাবলী যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা এই শ্রেণীর সাহিত্যের মূল্য বা মর্য্যাদা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

বলা বাহুল্য একথা আমরা বলছি না যে রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্য বুঝতে বাঙালী পাঠককে আদাজল খেয়ে ইংরেজী পত্র-সাহিত্যের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে—আমরা যা বলছিলাম, তা হচ্ছে আনুরূপ্যের কথা। সাহিত্য যখন লিখিত হয়, স্বভাবধর্ম্মেই তা লেখকের ব্যক্তিগত আবেষ্টনী থেকে দূরে এসে পড়ে, তাতে লেখকের যে ছোঁয়াটুকু আমরা পাই, তা হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিত্বের ভাব-রূপ—সেখানে সমগ্র দেশবাসী বা ভাবী কালকে লক্ষ্য হিসাবে নিতে হয়, কাজেই নিজের প্রত্যক্ষ সত্তা স্বভাবধর্ম্মেই সেখানে সঙ্কুচিত হয়ে আসে। কিন্তু চিঠি যখন লেখা হয়, তখন তার লক্ষ্য থাকে কাছের লোকটি, কাজেই তার এলাকা দূর-নিবদ্ধ না হওয়ায় তা অনায়াসেই আপনার রসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। এদিক থেকে পত্র-সাহিত্য সমস্ত বড় লেখকেরই সাহিত্য ও জীবন বিচারের নিশ্চিততম মানদণ্ড, নিজের সাহিত্য ও নিজের জীবনকে সাম্নে দাঁড় করিয়ে, তাকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ লেখকদের আর কোথাও হয় না চিঠি ছাড়া। সুতরাং পত্র-সাহিত্য অনেকাংশে মূল সাহিত্যেরই অনুপূরক—বিশেষতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যের ক্ষেত্রে। সে হিসাবে পত্র-ধারা প্রকাশের প্রয়োজন ছিল সব চেয়ে বেশী।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলে রাখা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের প্রথমতম গদ্যগ্রন্থ হল 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র'—এই বইয়ের রচনাকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ষোল-সতেরো বৎসর। আশ্চর্য্যের বিষয় এত আগেই চিঠিতে তিনি পূর্ণভাবে কথ্য ভাষাকে অবলম্বন করেছিলেন। সে বই এখন 'পাশ্চাত্য ভ্রমণে'র অন্তর্গত।

[৭] শিশু-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

কলকাতা সহরে পথ চলতে দু'ধারে বহু বিচিত্র শিশু-সাহিত্যের পসরা চোখে পড়ে। শুনতে পাই, বড়দের সাহিত্য ইদানীং বাজারে অচল হয়ে পড়েছে—কিন্তু স্কুলের প্রাইজে, জন্মদিনের উপহারে, এম্নিধারা নানা ব্যাপারে শিশু-সাহিত্য নাকি মন্দ চলে না—সুতরাং দেশের সাহিত্য প্রচেষ্টা এখন শিশু-জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে সুরু করছে। উপলক্ষ্যটা যাই হক, কার্য্যটা কল্যাণকর। শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ, তার চিন্তা, চরিত্র ও মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষের ওপরই নির্ভর করে জাতির ভাগ্য, তাই তাদের মানুষ করে তোলার চেয়ে বড় কাজ কিছুই হতে পারে না।

এই শিশু-সাহিত্য সমগ্রভাবে মন্থনের অবসর পাই নি—তবে অনেকগুলো বই এ পর্য্যন্ত পড়েছি। তাতে এই সাহিত্য-শাখাকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি—রূপকথা, ভূতের গল্প এবং এডভেঞ্চার। এর প্রথম দুটি ভাগ বাংলা-মৃত্তিকার পুরাতন ফসল—কালধর্ম্মে হয়ত তার ওপর বিলিতি প্যাকিং ও লেবেল পড়েছে, কিন্তু জিনিষ আসলে তাই আছে—সেই রাজা-রাণী, রাক্ষস-খোক্কস, ময়ূরপঙ্খী নৌকা, পক্ষীরাজ ঘোড়া, দুধ সমুদ্র, সেই ঘুমন্ত রাজকুমারী—আর নয়ত সেই পোড়াবাড়ী, সেই ঠ্যাঙাড়ে বটগাছ, সেই কনেডোবার পুকুর! এ সব বইয়ের গল্প খুব জমাট এবং ছেলে-মেয়েদের সহজ-বিশ্বাসী অন্তঃকরণকে সমগ্রভাবে দখল করার পক্ষে অনুপম শক্তিশালী। একটা ভয়মিশ্রিত কৌতূহলে তারা এই বইগুলি পড়ে থাকে এবং অনেক সময় পড়ে বিশ্বাসও করে। ইদানীং অনেকে বলতে সুরু করেছেন—ওতে ছেলেমেয়েরা ভীরু হয়, তাদের অন্তর অন্ধবিশ্বাস ও অযৌক্তিক সম্ভাব্যতায় অভিভূত হয়ে পড়ে। পরে জীবন-

সংগ্রামে তারা পিছু হটতে থাকে এই বাল্যশিক্ষার দরুণ। দুঃখের বিষয় জীবন-সংগ্রামে যে সব জাতি পিছু হটে নি, তাদের রূপকথা বা ভূতের গল্পও কিছুমাত্র শৌর্য্য-বীর্য্য-সংবর্দ্ধক নয়। যাই হক, এ-মতে অনেকের আস্থা আছে, কাজেই ইদানীং আমাদের শিশু-সাহিত্যে তৃতীয় ভাগের অর্থাৎ এডভেঞ্চারের আধিপত্য হয়েছে—এ জিনিষ অবশ্য খাস বিদেশী এবং আমাদের সমতল মাটির দেশে বিসদৃশ পরগাছা বিশেষ। বাঙালীর ছেলে গোরিলা বা হিপোপটেমাস শিকার করছে আফ্রিকার জঙ্গলে—নয়ত এটলান্টিক মহাসাগরের অতলে ডুবুরী সেজে অক্টোপাশের সঙ্গে লড়াই দিচ্ছে—বিশাল বিমানপোতে নায়গ্রা প্রপাত প্রদক্ষিণ করছে, নয়ত সাবমেরিণে করে আরব সমুদ্রের বক্ষদেশ তোলপাড় করে ফিরছে প্রবাল-দ্বীপের সন্ধানে—ব্রেজিলের বনে, বা কঙ্গোর সোণার খনিতে দুর্দ্ধর্ষ রেড-ইণ্ডিয়ান বা কাফ্রীদের হাতে বন্দী হয়ে অনন্যসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছে, অথবা ফিজীতে বসে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছে—কুমীরের মস্তিষ্ক চালাচ্ছে মানুষের মাথায় এম্নি আরো কত কি দেখতে পাই এই সব বইয়ে।

আগেই বলেছি ছোটদের বিশ্বাসপ্রবণতা অত্যন্ত বেশী। তা ছাড়া তাদের বুদ্ধি বিশ্লেষণমুখী নয়, আহরণমুখী—কাজেই যাতে তারা নূতন কিছুর চমক পায়, তাই নির্ব্বিচারে গলাধঃকরণ করে, ফল যাই হক! অবশ্য আমাদের লেখকরা মনে করেন, এই সাহিত্য-প্রচারের দ্বারা তাঁরা রাতারাতি দেশের ছেলেমেয়েদের নেপোলিয়ান, নেলসন বা জোয়ান দার্ক করে তুলছেন। মানুষের বিশ্বাসকে আঘাত করে লাভ নেই! তবে ছেলে-মেয়েদের অভিমত নিয়ে দেখেছি, তারা এই সব ভয়ানক কাণ্ডকে ভয়ানক বলেই উপভোগ করে—অনুকরণীয় বলে মনেও করে না।

কিন্তু কথা তা নয়। বিশ্ব জগতে ভয়, রহস্য, কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন দুর্জ্ঞেয়তার

কোনই মূল্য নেই তা নয়। এ সবের সমবায়ে গঠিত যে একটি বিচিত্র স্বপ্ন-জগৎ মানুষের কল্পনাকে চিরকাল অধিকার করে আছে, তার প্রভাব জীবনের ওপর খুব অকিঞ্চিৎকর নয়। ছোটদের সেই স্বপ্ন-রাজ্য থেকে নির্ব্বাসন দেওয়া অন্যায়। আবার শৌর্য্যের রোমাঞ্চের ত্যাগের দুঃখের একটা রৌদ্রদীপ্ত জগৎ আছে। এই দুই আলো-অন্ধকারের জগতেই শিশু-মন করে নিত্য চলাফেরা। সাহিত্যে এ দুইয়েরই রূপ থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এ ছাড়াও সাহিত্য হয় এবং সেই সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তাই বর্ত্তমানে আমাদের আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথের শিশু-সাহিত্য সেই নবতম ধারার প্রবর্ত্তন করেছে। তা রূপকথা নয়, এডভেঞ্চার নয়, বর্ণহীন নীরস প্রত্যক্ষতার কাহিনীও নয়—তা রসসাহিত্য, হাল্কা হাতে তৈরী—যাতে ফুরফুরে হাসি আছে, ঝলমলে রৌদ্র আছে, টুকরো টুকরো জুঁই ফুলের মতো কান্না আছে—যার পিছনে গুরু-পাণ্ডিত্যের ঘন মেঘ নেই—আছে কৌতুকরসের আলতো আবরণ। সাত বছরের নাতনাকে ধরে 'সে' বইয়ে যে সমস্ত রস-গল্প কবি মজলিসী দাদামশায়ের মতো আপন আনন্দে বলে গেছেন, তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে ত নেইই, বিদেশী সাহিত্যেও হয়ত তা সুলভ নয়। গেছোবাবার অদ্ভুত মাহাত্ম্যের অদ্ভুততর বিবরণ বা হাঁচিয়ান্দিনী কুরুঙ্কুনার করুণ কাহিনী কার না ভালো লাগবে? বিস্ময় বোধ হয়, এই রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের দুরূহতম চিন্তাশীল কবি ও লেখক ভেবে! তাঁর নিজে হাতে আঁকা ছবিগুলি গল্পগুলির রসকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছে দেখলাম। তবে জায়গায় জায়গায় বলার ভঙ্গী একটু উঁচুদরের হয়ে পড়েছে, হয়ত ছোটরা তার নাগাল পাবে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের রসানুভূতি ও কৌতুকবোধ তাদেরকে শেষ পর্য্যন্ত অব্যাহত বেগেই টেনে নিয়ে যাবে। পঠিত সাহিত্যের প্রত্যেকটি কথা তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে বুঝতে না পারার

একটা বিশেষ উপকার আছে এই বয়সে—তা হচ্ছে নিজের কল্পনা দিয়ে ফাঁক ভরিয়ে নেবার অভ্যাস হওয়া। এতেই শিশু-মনে উদ্ভাবনীশক্তি দানা বাঁধে। পরে তা থেকেই আসে শিল্প-সৃষ্টির সহজ দক্ষতা। রবীন্দ্রনাথের 'সে' সেদিক থেকে আদর্শ শিশু-সাহিত্য—যা শিশু-বৃদ্ধ সকলকেই সমান আনন্দ দেবে।

শিশু-মনের কামনা-কল্পনা নিয়ে মধ্যবয়সে কবি 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' নামে দুখানি কবিতার বই লিখেছিলেন। তা 'শিশু' কবিতা বটে, কিন্তু শিশুদের কবিতা নয়। শিশু-মনের অপার রহস্যময়তা—তার নানা খেয়ালী কল্পনা, নানা স্বপ্ন ও অনুভূতিকে আশ্রয় করে লেখা সেই সব কবিতায় পরিণত মনের ধারা ও ধরণই সুস্পষ্ট—ছোটরা তা পড়ে অপ্রবুদ্ধ আনন্দে খুসী হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের মনের স্বল্প পুঁজি ঐ সব কবিতার শব্দ-সঙ্গীতকে অতিক্রম করে অর্থ পর্য্যন্ত এগুতে পারে না—কারণ ওদের বেশীর ভাগের ব্যঞ্জনাই প্রবীণ মনের অনুগামী, যদিও প্রকাশের ভঙ্গীতে কোমল মনের লঘুলীলাই আছে প্রায় সর্ব্বত্র। কিন্তু 'ছড়ার ছবি' সত্যিই ছোটদের কবিতা—সুকুমার রায়ের মতো ছন্দ-বৈচিত্র্য ও কিম্ভুত কৌতুক কাহিনী এদের অবলম্বন নয়—এরা প্রধানতঃ ছবি—এক-একটা ছোট ঘটনা, নয়ত এক-একটা মানুষ বা স্থান ও তাকে কেন্দ্র করে এক-একটা গল্প—সে গালভরা খোস-গল্প নয়, অতি লঘু এক-একটা সুখ-দুঃখের বিবরণ, যা সহজেই শিশু-চিত্তে সাড়া তোলে—তাই নিয়েই এর কবিতা। আর এর ছবি নন্দলাল বসুর আঁকা, সুতরাং ছবি যে কবিতারই তুল্য মূল্য তা বলাই বাহুল্য! আকাশ প্রদীপ, অজয় নদী, ছবি আঁকিয়ে, বাসাবাড়ী…যে কোন কবিতারই উল্লেখ করি, তাদের সুর যেমনি মঠে, তেমনি সিধে, কোথাও কোন খোঁচ নেই, শিশুর রসবোধ কোথাও হোঁচট খায় না—অপূর্ব্ব লঘু এতে কাব্যশ্রীর পদসঞ্চার!

'খাপছাড়া' টুকরো টুকরো মজার কবিতার সংগ্রহ—কোনটা নক্সা, কোনটা ঠাট্টা, কোনটা বা একটু ইঙ্গিত—বেশীর ভাগেই নূতন নূতন ছন্দ নিয়ে খেলা···সেই খেলার সঙ্গে আছে খেয়াল মতো আঁকা কবির নিজেরই ছবি। ছেলেরা 'ছড়ার ছবি' পড়ে উপভোগ করবে—আর খাপছাড়া পড়ে পাবে আমোদ। বস্তুতঃ ও দুইই আসলে এক ফলদায়ী হলেও, একের গতি গূঢ়তার দিকে—যে দিক দিগন্ত প্রসারী কল্পনার জগতের পথনির্দ্দেশ করে, অন্যের গতি অবাধ আনন্দের জনতার দিকে—যা থেকে জীবনের ভালো-মন্দ হরেক রকম ফসল তারা আপন খুসীতে কুড়িয়ে নিতে পারবে। বাংলা কাব্যে এ জাতের লেখাও এই প্রথম—ইংরাজী কাব্যে ব্লেকের বা ষ্টিভেনসনের কবিতায় এর কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সে আভাস মাত্র।

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের শিশু-সাহিত্য আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের চোখের সামনে একটা নূতন জগৎই খুলে দিয়েছে, যার সন্ধান আগে আমরা পাই নি।

ষষ্ঠ স্তবক : জীবন ও প্রতিভা

[১] স্বামী বিবেকানন্দ

(এদেশের ধর্মগুরুরা বস্তু-সংসারের সঙ্গে সংযোগ রহিত হয়ে একান্ত-ভাবে আত্মকেন্দ্রিক তপস্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই জনসাধারণের পার্থিব কল্যাণ তাঁদের দৃষ্টি-সীমার বাইরে থেকে গেছে। জনসাধারণ তাঁদের আসনের চারিদিকে ভীড় জমিয়েছে সন্তান কামনায়, যশোলিপ্সায়, অর্থ-সন্ধানে। তাঁরা শুনিয়েছেন তাঁদের বাসনা-বর্জ্জনের বাণী, ত্যাগ-তিতিক্ষার সন্দেশ। তাদের স্বধর্ম্মে ও আপ্তবাক্যে বিরোধ ঘটেছে, দুই চরম প্রান্তের মাঝখানে তারা থেকেছে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে।)

ঐশ্বরিক অনুভূতি বলে সতিাই কোন জিনিষ আছে কিনা প্রকৃত জনের সে সম্বন্ধে জোর গলায় কিছু বলার পুঁজি বড়ই কম। যুগার্জ্জিত সংস্কারে—যার জন্ম প্রধানতঃ ভয় থেকে—মানুষ ঈশ্বরকে মেনে এসেছে এবং নিজের কল্পনা দিয়ে তাঁকে তৈরি করেছে নিজের মতো করেই। পিতা, মাতা, সখা, প্রভু, প্রিয়তম, সাংসারিক জীবনের যাবতীয় নৈকট্যবোধক সম্বন্ধই সে ঐশ্বরিক সত্তার উপর আরোপ করেছে এবং সুখে-দুঃখে তাঁর দিকে বদ্ধদৃষ্টি হয়েই দিন কাটিয়ে চলেছে। জীবনে এর প্রয়োজন কম নয় ঠিকই, কিন্তু জিনিষটা খেলা। (এটা ধর্ম্ম নয়, উপধর্ম্ম—আসল ধর্ম্ম বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করলেও যা টেঁকে তাই।) সে পরীক্ষা। (নির্ব্বিশেষ ভাগবত-সত্তা বলে কোন জিনিষের স্বীকৃতি নেই, আছে একটা মননশীল, ক্রিয়াশীল চৈতন্যের, যা স্থূলরূপে এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডে ব্যক্ত, আবার সূক্ষ্ম

রূপে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ-শক্তিতে প্রচ্ছন্ন! এই জড় ও চেতনের মধ্যে অহরহ যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার লীলায় সমুদয় জাগতিক ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তাকেই মোটা কথায় বলা যায় পারমার্থিকতা।) এর বাইরে কোন রকম প্রতীক সৃষ্টি ও সেই প্রতীককে উপলক্ষ্য করে সম্মোহের বা দিব্যোন্মাদের অবস্থা একটা অসাধারণ মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। প্রাকৃত জন এর হদিশ পায় না, কারণ এটা যাঁর মধ্যে জন্মায়, সীমাবদ্ধও থাকে তাঁরি মধ্যে। তাই বলেছি, এটা আত্মকেন্দ্রিক।

স্বামী বিবেকানন্দ এদেশে ধর্ম্মগুরুরূপে পরিচিত হলেও, সৌভাগ্য-বশত: তাঁর সাধক-সত্তাটা তিনি রেখেছিলেন নিজের মধ্যে আড়াল করে, অনেকের মতো তাকে মূলধন করে আধ্যাত্মিকতার কারবার ফাঁদিয়ে বসেন নি, কারণ তিনি জানতেন, এটা সঞ্চারিত করার জিনিষ নয়, এটা অর্জ্জনের। কিন্তু তাঁর বিরাট জীবন একান্তভাবেই আধ্যাত্মিকতার চর্চ্চায় পর্য্যবসিত হয়ে যায় নি—বস্তু-সংসারকেও তিনি ভালোবেসেছিলেন প্রগাঢ়ভাবে এবং সেইটুকুই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে বড় সান্ত্বনার কথা। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের, এই কথা যে আমরা স্পষ্ট করে বলতে পারি এবং আমাদের সমুদয় সংস্কার ও সংস্কৃতিমূলক আন্দোলনে যে আমরা তাঁকে আমাদেরই একজন অমিত শক্তিমান পূর্ব্বাচার্য্য বলে ভাবতে পারি, এখানেই তাঁর সত্যিকার শ্রেষ্ঠতা। এর বাইরে পরমহংস প্রদত্ত মিষ্টিক মন্ত্রের জাগ্রত শক্তি তাঁকে কি মহা-অনুভূতি দিয়েছিল, সে আমরা জানিনে, অবশ্য জানিনে বলেই তাকে উড়িয়ে দিতেও পারিনে। বরং মনে করি, তাঁর ভেতর সেই রকম একটা প্রচণ্ড, প্রবল ও প্রত্যক্ষ শক্তি জন্মিয়েছিল বলেই তাঁর বহির্জীবন এত ব্যাপক ও বিচিত্র-ভাবে কার্য্যকরী হতে পেরেছিল. কিন্তু দুজ্ঞেয় যে জিনিষ, তাকে 'হস্তামলকবৎ' ব্যাখ্যা করতেও সাহস করি না।

বিবেকানন্দ স্বামী এদেশের সামাজিক দুর্গতি মর্ম্মে মর্ম্মে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন—এই দুর্গতির প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে তাঁর যে সমস্ত উক্তি পাওয়া যায়, তা ভাব-বিলাসী সংস্কারকের উক্তি নয়, বিদ্রোহীর বাণী। যারা মানুষের অন্তর্লীন মনুষ্যত্বকে স্বীকার করে না, লৌকিক ক্রিয়া-কলাপের দাসত্বে যূপবদ্ধ থেকে ধার্ম্মিক সাজার অপচেষ্টা করে, তাদের তিনি নির্ম্মমভাবে কশাঘাত করেছেন। সে তেজস্বিতা আধুনিক কালের যে কোন সংস্কারকের লেখাতেই দুর্লভ। ধর্ম্মকে তিনি সমাজের বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলেন নি—সমাজের ভেতর দিয়ে, সামাজিক সঙ্ঘবদ্ধতা ও শৃঙ্খলার ভেতর দিয়েই ধর্ম্মের মর্য্যাদাকে স্বীকার করেছেন। তাই জাতিভেদ থেকে সুরু করে, ক্ষুদ্র আচার-বিচার ও বৃহৎ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তাঁর শাণিত দৃষ্টি পড়েছে এবং অপরিসীম মমতা ও অসাধারণ পৌরুষের সঙ্গেই তিনি একদিকে তাদের উচ্ছেদ চেয়েছেন, অন্যদিকে চেয়েছেন সুস্থ ও প্রাণবন্ত করে তাদের পুনরায় গড়ে তুলতে। জাত্যভিমান ও সামাজিক কু-প্রথার শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে আজ দেশের মনে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মেছে—এই ধারণা সৃষ্টির মূলে স্বামী বিবেকানন্দের দান যে কতখানি, তা আমাদের ভুললে চলবে না। কিন্তু স্বামীজী শুধু ধারণা সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হন নি, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মধ্যে দিয়ে এই সমস্ত জাতীয় ব্যাধির চিকিৎসারও পথ দেখিয়ে গেছেন। দেশের যুব-শক্তির ভাবপ্রবণতা ও কর্ম্মবিমুখিতাকে তিনি অন্ধ মমতায় উৎসাহিত করেন নি—তাদের তিনি ভৎসনা করেছেন, পার্থিব লাভালাভে নিরুদ্বেগ সন্ন্যাসীর মতো নয়, সাংসারিক কল্যাণে সজাগ-দৃষ্টি কর্ম্মীর মতো। তিনি নিজে গৈরিকের আবরণে থেকেও অন্যকে বৈষয়িক সিদ্ধির পথ দেখিয়ে-ছিলেন, এইখানেই তাঁর ভাব-ধারার সত্যিকার পরিচয়। দেশের যুব-আন্দোলন আজ একটা বিশিষ্ট রূপ ধরেছে, এবং তা আজ রাজনৈতিক

মেরুদণ্ডে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন স্বামীজীকে কেন্দ্র করে যে তরুণ দল সঞ্জীবিত হয়েছিল, তার রূপটা ছিল সামাজিক—কিন্তু সেদিনের বনিয়াদের ওপরই আজকের এই রূপান্তরের স্থিতি, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের আজকের যে রূপ, তারও আংশিক পূর্ব্বাভাষ দিয়েছেন স্বামীজী। তাঁর রচনা তাঁর কর্ম্ম-জীবনের অনুপূরক হলেও নির্ব্বিশেষ ভাবে তারও মূল্য কম নয়। তাঁর মতো সহজস্বচ্ছ ষ্টাইল ও কথাভঙ্গী সেদিনের সাহিত্য-জীবীদের মধ্যেও বেশী দেখা যায় নি। তিনি করতালি লাভের আশায় কলম ধরেন নি—অকপট অনুভূতিকে অবাধ সারল্যে প্রকাশ করেছেন, তাই তাঁর লেখা হয়েছে এত স্পষ্ট ও ধারালো। তাঁর কর্ম্মী, সংস্কারক ও সাহিত্যিক রূপ কিন্তু আসলে একই রূপের আকারভেদ। আসল রূপ হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিত্বশীলতা, যার তুলনা হয় না।

এই ব্যক্তিত্ব তাঁর আধ্যাত্মিক প্রেরণাসঞ্জাত কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের দেশের সংস্কৃতিকে তিনি যেন প্রাণ-সম্পদ দিয়ে গেছেন, সেই জন্যেই তিনি আমাদের নমস্য।

[২] কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস

অনেক দিন হল কবি গোবিন্দ দাস লোকান্তরিত হয়েছেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর একখানি জীবনী বেরিয়েছে এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তাঁর জীবন ও প্রতিভা নিয়েও অল্পস্বল্প আলোচনা হয়েছে—কিন্তু তাঁর কবিতা যে জাতির মনের পুরোভাগে জেগে নেই, তার প্রমাণ, বাজারে তাঁর কোন বই পাওয়া যায় না। এখনকার পাঠককে তাঁর কথা বলতে গেলে, অনেকেই মনে করেন, বুঝি পদাবলী লেখক গোবিন্দদাসের কথা বলা হচ্ছে। অথচ তিনি আমাদেরই সময়ের মানুষ, তাঁর পুত্রেরা আজও জীবিত এবং বয়সে আমাদের চেয়ে বিশেষ বড়ও নন।

কবি দরিদ্র ছিলেন এবং শেষ জীবনে অন্নকষ্ট ভোগ করেছিলেন, এটা অনেকের জানা এবং সৌখীন সহানুভূতি প্রকাশ করে বার বার তাঁর অসামান্য প্রতিভাকে লজ্জিত করতেও দেখা যায়। কিন্তু যে দেশ তাঁর দারিদ্র্য দূর করবার দায়িত্ব নেয় নি, অন্ন ও বস্ত্রের জন্যে প্রত্যহের ক্লান্তিকর হিসাব-নিকাশ থেকে মুক্তি দিয়ে একান্ত মনে তাঁকে কাব্য-সেবায় মনোনিবেশ করবার সুযোগ দেয় নি, তাঁর বই কিনে পড়ে নি, তাঁর প্রতিভার যথোচিত সমাদর করে নি, সে দেশে যদি তিনি না খেয়েই মারা গিয়ে থাকেন ত তা নিয়ে সুলভ কারুণ্য বর্ষণের অধিকার আমাদের নেই। তাঁর অভাব-দুঃখ নিয়েই তিনি চলে গেছেন, পেছনে যা রেখে গেছেন, তাই নিয়েই আজ আমরা তাঁকে বিচার করবো না কেন?

বাঙালী জাতি হৃদয়বান এবং জাতিগত ভাবেই নাকি কাব্য-প্রাণ—কিন্তু মধুসূদনের যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত সত্যিকারের কবিদের সম্বন্ধে

তার যে শ্রদ্ধাশীলতার পরিচয় পাওয়া গেছে, তাতে একথা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয় যে বাঙালী চরিত্রে আর যে দোষই থাক, কাব্যানুরাগ নামক দুর্ব্বলতা নেই। কবির অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করা হয়ত দেশীয় শাসকের কর্ত্তব্য এবং ব্যক্তিগতভাবে মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে কারুর অভাব ঘোচানোও হয়ত সহজ নয়—কিন্তু কবির সম্বন্ধে যাই হক, কাব্যকে বাঁচানোর দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের নয়। জাতির হৃদয়ানুরাগের ভেতর দিয়েই তা যুগ যুগ ধরে সঞ্চারিত হয়ে চলে। (কিন্তু বাঙালী জাতি নূতনের ভক্ত, পুরাতনকে বাতিল করা বা বিস্মৃত হওয়াটাই তার বিচারে আভিজাত্যের লক্ষণ।) তাই আজকের বাঙালী পাঠকের কাছে বঙ্কিম, দীনবন্ধু, টেকচাঁদ, বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকরা প্রাগৈতিহাসিক ফসিলের সমকক্ষ—বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যে বা সাহিত্য পরিষদের গবেষণাগারে এঁরা শিক্ষার্থী ও অনুসন্ধিৎসুদের অনুগ্রহের মুখ চেয়ে পড়ে আছেন। কাজেই সাগরদাঁড়িতে মাইকেলের বা কাঁটাল-পাড়ায় বঙ্কিমের বসতবাটী ধ্বংস হতে চলেছে বলে কাগজে তারস্বরে আবেদন করেও দেশের মর্ম্ম থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায় না! এমন দেশে মাইকেল হাঁসপাতালে অচিকিৎসায় মরেছিলেন, গোবিন্দ দাস না খেয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন, আমি-আপনিও অমনি কোন একটা অপঘাতে মরবো, তাতে কার কি যায় আসে ?)

শুনেছি দেশবন্ধু এবং মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র গোবিন্দ দাসকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন, স্বর্গীয় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁর অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ ছাপিয়েও দিয়েছিলেন। এ খবরও খুব বেশী লোকের জানা নেই, কাজেই দেশবাসী তাঁদের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ধন্য হতে পারেন নি। কবির সমসাময়িক সাহিত্যরথীরা কেউ তাঁর কাব্যের সমাদর করেন নি, কোন দিন তাঁরা তাঁকে ডাকেননি, সভায় সংবাদপত্রে তাঁর

সম্বন্ধে কেউ কোন উক্তি করেন নি, এ নিয়েও কারুর কোন অভিযোগ নেই। অন্যের কথা ছেড়ে দিই, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরা যাক। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য এবং প্রভাতকুমারের গল্প সাধারণ্যে পরিচিত করিয়েছিলেন, হাঁসপাতালে মুমূর্ষু রজনীকান্তকে দেখে এসেছিলেন, দেবেন সেনকে 'সোনারতরী' উৎসর্গ করেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে শুধু স্নেহই দেন নি, কবি-খ্যাতি অর্জ্জনেও সহায়তা করেছিলেন, অথচ তাঁর পূর্ণ খ্যাতির দিনে এত বড় শক্তিশালী একজন সমসাময়িক কবিকে তিনি একেবারেই এড়িয়ে গেছেন। এ শুধু কবির নয়, দেশেরই দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

কিন্তু দেশব্যাপী এই উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যের ভরা উজান ঠেলেই গোবিন্দ দাস এগিয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিভার কথা পরে, কিন্তু পৌরুষ ও আত্মবিকাশের যদি কোন মূল্য থাকে ত সেদিক থেকেও এই কবিকে শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই। এই যে বাইরের বাধাবিপত্তি ও সঙ্ঘাতকে অগ্রাহ্য করে আপনার অন্তরের আগুনে উৎসারিত হয়ে চলা, একে আমাদের বৈষ্ণব নতির দেশে কেউ ভালো চোখে দেখেন নি সন্দেহ নেই. জন্মভূমিতে তাঁর স্থান হয় নি সে এই জন্যেই, দেশে তার আসন জোটে নি সেও এই জন্যেই---কিন্তু এই অসীম দুঃসাহসের জন্যেই তিনি এত বড় হতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রতিভার মূলানুসন্ধান করতে হলে, আমাদেরকে তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের এই গোপন উৎসটিরই সন্ধান নিতে হবে।

এখনকার বাজারে যাকে আমরা উচ্চ শিক্ষা বলি, তা ত দূরের কথা, তিনি ভালো করে ইংরেজী ভাষাই জানতেন না—যাকে মোটা কথায় বলে সংসর্গ, তাও তাঁর ভাগ্যে কোন দিনই তেমন করে জোটে নি—আর দারিদ্র্য, যা সর্ব্বগুণাপহারী বলে প্রসিদ্ধ, তা ত তাঁর ছিলই। সুতরাং শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং চিত্ত-প্রসার কোন দিক থেকেই তাঁর সাহিত্যিক

উৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা ছিল না। নিতান্তই কবি হয়ে জন্মানোর অপরাধে তিনি বড় জোর একটা পেশাদার ছড়া লিখিয়ে হতে পারতেন – এইটুকুই আমাদের বিচারে প্রত্যাশিত এবং নিজের শিক্ষাভাব, নিজের দারিদ্র্য ইত্যাদি নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে ভক্তিমূলক এবং আত্মধিক্কারসূচক কতকগুলো পদ রচনা করে গেলে, আমরা হয়ত তাঁর সম্বন্ধে কিছুটা নেকনজরও করতাম। অন্ততঃ ডক্টরেট প্রার্থীরা কোন দিন করতেনই। কিন্তু তিনি ইংরেজী শিক্ষা না পেয়েও প্রকৃতিতে ছিলেন অনেকের চেয়ে ঢের বেশী ইংরেজ—বাইরের ধাক্কা যত জোরে পেয়েছেন, ততই ভেতরে তাঁর অন্তর-পুরুষটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। দুঃখের কাছে বাধ্যতামূলক আপোষ না করে, তিনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন—এবং বাইরের প্রভাব-সঞ্জাত ভদ্রয়ানির মোলায়েম পালিস না থাকায়, তাঁর বিদ্রোহ ধরেছে নির্ম্মুক্ত, শাণিত, উলঙ্গ তরবারির রূপ—এই দুর্দ্দমতাই তাঁর প্রতিভার প্রাণ, তাঁর প্রকৃতিরও ধর্ম্ম। এটা তাঁর স্বভাবজাত ছিল বলেই, যাঁরা না বুঝেও তাঁকে স্বভাব-কবি আখ্যা দিয়েছিলেন, তাঁরা ভুল বলেন নি। (এই অন্তর্গূঢ় আত্মিক শক্তিই তাঁকে কবি করেছিল এবং এত বড় কবি করেছিল!)

যদি তিনি তথাকথিত গৃহস্থ ঘরের একটি বাবু হতেন—অর্থাৎ বি-এ, টি-এ পাশ করতেন এবং ভাওয়াল ষ্টেটের সেই রায় বাহাদুর সাহিত্যিক কর্ম্মচারীর রোষ-দৃষ্টিতে না পড়ে, যদি তাঁর প্রসন্ন অনুগ্রহ অর্জ্জন করে একটি কেরাণীগিরি পেতেন, তাহলে তাঁর কথাবার্ত্তা চাল-চলন নিশ্চয়ই বেশ দুরস্ত হয়ে আসতো—ভেতরকার দাহ এবং অসন্তোষ আসতো স্তিমিত হয়ে, যে শ্রেণীর পানসে সৌজন্যকে বাঙালী সন্তানরা প্রশংসা করে থাকেন, তাতে ভূষিত হয়ে তিনি বাংলার বহু গোবিন্দেরই অন্যতম হতেন—কিন্তু কবি গোবিন্দ দাস হতে পারতেন না কখনই। (সিধা

অনুভূতির যে আদিম রূপ, কালচারের জাঁতা-কলে পিষে তা থেকে এক রকম বিশুদ্ধ পাউডার তৈরী হয়, তারই নাম আর্ট। সরাসরি তাকেই বাজারে বের করলে আমরা আঁৎকে উঠি, বলি অশ্লীল—কারণ কৃত্রিমতা এবং লাগামটানা প্রতারণায় আমরা এতই অভ্যস্ত যে সেইটাই আমাদের কাছে স্বাভাবিক. কিন্তু যে জন্যে মনিহারী দোকানের চলন্ত বিজ্ঞাপন কলেজের তরুণীদের চেয়ে, জোলাটে কাপড় পরা নিরাভরণা সাঁওতালীরা বেশী সুন্দরী, সেই জন্যেই মুখোস-পরা কালচারাল কাব্যকারুর চেয়ে চাঁছা-ছোলা অকপট কাব্য অনেক বড় জাতের জিনিষ। গোবিন্দ দাস এই জাতের কাব্য লিখেছেন এবং লিখে সাফল্য লাভ করেছেন, তার কারণ তাঁর ভেতরের চোখ দুটি বাইরের জৌলুষে ঝাপ্সা হয়ে যায় নি এবং সহজাত অনুভূতি তথাকথিত শিক্ষার সাম্প্রতিক সঞ্চয়ে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে নি। বরং ব্যবহারিক জীবনের প্রাত্যহিক আঘাত-সঙ্ঘাতে তা উত্তেজিত, উদ্বেলিত এবং দুর্নিবার হয়েই প্রকাশ পেয়েছে।

আমি তারে ভালোবাসি অস্থি-মাংস সহ।
আমি ও দেহের স্তূপে,
কামনার কাল কূপে,
কালিয়া নাগের মতো সুখী অহরহ!

শুনলেই রবীন্দ্র-কাব্যের দেহাতীত প্রেমে অভ্যস্ত পাঠকের মন বিরূপ হয়ে উঠবে, তাঁরা বলবেন, স্থূল। স্থূল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সূক্ষ্ম বলতে যা বুঝি, তা ত এই স্থূলের ওপরই আরোপ করা একটা জিনিষ—একটা আইডিয়া মাত্র। যখন স্থূলটা থাকে না, তখন সূক্ষ্মটাও যায় মাঠে-মারা। অথচ এই পরম সত্যটাকে নিয়েই আমাদের যত গোল—এটা আছে এবং এটা আছে বলেই, একে গোপন করার জন্যেও

সভ্যতার এত প্রয়াস! যা আমার, তাকে বিশ্বের করে না বললে সভ্যতার পিত্ত রক্ষা হয় না, এবং যা ব্যক্তিক তাকে বিশ্বজনীন করবা মাত্রই তার প্রত্যক্ষ রূপটিও যায় বদলে, তখন তা হয়ে পড়ে অপৌরুষেয়—অতএব অসত্য। এই নীতি থেকেই নিরুপাধিক আর্টের জন্ম—ব্যক্তি-সীমার বাইরে ব্যর্থ ভাব-বিলাস নিয়েই তাই বেশীর ভাগ কবির বেসাতি চলে থাকে। কিন্তু আগেই বলেছি, গোবিন্দদাসের হৃদয় ছিল আদিম—সভ্যতার এই অপরিহার্য্য দড়ি-দড়া তিনি অনায়াসেই এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন সেই জন্যে।

(যে সহজ সাদা চোখে মানুষ একদা আদিম সূর্য্যোদয়কে অভ্যর্থনা করেছিল, তার ভেতর ছিল একটা দুরন্ত জিজ্ঞাসা—আজ সে জিজ্ঞাসা নিরস্ত হয়েছে, কারণ বিজ্ঞান আগে থেকেই তার উত্তর তৈরী করে রেখেছে। তাই আজ ও নিয়ে নূতন করে রহস্য-সৃষ্টি করতে গেলে, শিল্পীর চিত্ত মুহুর্মুহু সজাগ হয়ে ওঠে এই মনে করে যে যা বলছি, সবই বানানো। এই চেতনার ফলেই তাঁর ভাষা প্রাণ-শক্তির সহজ অজস্রতা হারিয়ে অলঙ্করণের আতিশয্যে পল্লবিত হয়ে ওঠে।) কিন্তু গোবিন্দদাসের এ বিপদ ঘটেনি। তাই তাঁর কাব্যে এমন দুর্লভ লাইনও এত অনায়াসে আসতে পেরেছে—

> তরুলতা ঘুম যায়, ঘুম যায় ফুল,
> পল্লবের কোলে কোলে ঘুমায় মুকুল।
> আকাশে হেলান দিয়া ঘুমায় পর্ব্বত,
> সম্মুখে সমুদ্র পাতা মহা শয্যাবৎ।
> নিরাশার নিষ্পেষিত মহা মরুভূমে,
> কত বক্ষ-অস্থিচূর্ণ আছে ঘোর ঘুমে।
> ঘাসে ঘাসে ঘুম যায় কত অশ্রুজল,
> সৈকতে শোকের শ্বাস ঘুমেতে বিহ্বল।

দিকবদ্ধ শ্যাম মাঠ, অনিবদ্ধ নীবি,
স্খলিত অঞ্চল অঙ্গে ঘুমায় পৃথিবী !

যাকে লিপি-চাতুর্য্য বলে, সে দিক থেকে এই শ্রেণীর কবিতার বৈশিষ্ট্য প্রায় কিছুই নয়, তবু এতে যা আছে, অধিকাংশ কাব্যেই তা নেই।

আরও একটা নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। তার সেই প্রসিদ্ধ কবিতা—

আয় বালিকা খেলবি যদি, এ এক নূতন খেলা—
তোমার কেবল কুসুম খোঁজা,
কানে গোঁজা, খোঁপায় গোঁজা,
আমি অমন বইতে নারি, ফুলের বোঝা মেলা।
চুপ চুপ চুপ কসনে কারেও, এ এক নূতন খেলা।

আয় বালিকা খেলবি যদি, এ এক নূতন খেলা,
তোমার সনে গেলে যে ছাই,
সকাল আসতে ভুল করে যাই,
ভয়ে মরি একলা যেতে সবুজ সন্ধ্যেবেলা—
চুপ চুপ চুপ কসনে কারেও, এ এক নূতন খেলা !

এই কবিতার বিরুদ্ধে নৈতিক দরবারের প্রহরীরা এ পর্য্যন্ত অনেক লাঠি-তলোয়ারই হাঁকিয়েছেন, কিন্তু 'সবুজ সন্ধ্যা বেলা'র ছাপ বুকে নিয়ে কবিতাটা অটুট গৌরবেই টিকে আছে, কিসের জোরে? সে অতি-মানুষী ভাব-ব্যঞ্জনার জন্যে নয়, মানুষী ভাবের অকপটতার জোরেই।

কিন্তু এবার হয়ত প্রশ্ন উঠবে, যা কিছু সত্য, নিছক সত্য এবং

একমাত্র সত্য, তাই কি তাহলে কাব্যের গণ্ডীভুক্ত হবে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে কাব্য-বিচারের মূলসূত্র নিয়েই টানাটানি পড়বে, যা বর্ত্তমান উপলক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। তবে এটা ঠিক যে, ক্যারেট গোল্ডের বহুল প্রচার হলেও, খাঁটি সোনার দাম বেশী—দুর্ল্লভ বলেই নয়, জিনিসটা স্বভাবতঃই দামী বলে। তাই গোবিন্দদাসের কবিতায় প্রসাদগুণের অভাব এবং গ্রাম্যতার আতিশয্য থাকলেও, তার ধাতুগত মর্য্যাদা স্বীকার করে নিতে আমাদের সন্দেহ ত হয়ই না, সঙ্কোচও হয় না। বরং মনে হয়, খাদ যা আছে সেটাও ওর সঙ্গে মানিয়েই গেছে।

কে বেশী সুন্দর?

চুমার রাক্ষসী নারী শত জন্ম অনাহারী
দিনে রেতে খেয়ে চুমা ভরে না উদর।
বালিকা অত না বোঝে, চুমা খেতে চোখ বোঁজে,
ছুঁইতে শিহরি ওঠে কদম্ব কেশর॥

ঠিক এম্নি করে আমরা বলি না হয়ত, বলতে সাহস পাইনে বলেই, কিন্তু যিনি পেরেছেন, তিনি দুঃসাহসী, এ সহজেই বুঝতে পারি।

(এখনকার মনস্তাত্ত্বিক বিচারে হয়ত এই সব কবিতা বিকৃত যৌন বাসনা বা অবদমিত কামনার কুশ্রী প্রতিক্রিয়ার ফল বলে বিবেচিত হবে। কেউ কেউ হয়ত বলবেন, কবি এই স্থূল জান্তবতাকে অতিক্রম করে Sublimation-এর শিখরে উঠতে পারেন নি, অতএব তিনি নিন্দার্হ। বস্তুতঃ যে যাই বলুন, আমরা মনে করি, গোবিন্দদাসের বৈশিষ্ট্যই এখানে এবং তিনি যে সত্যিকার বড় কবি, সেও এই জন্যেই। শিল্প-সৃষ্টির মূলে সর্ব্বত্রই যৌন-বাসনার অস্তিত্ব নিশ্চিত, কিন্তু সেটা সৃষ্ট শিল্পে প্রচ্ছন্ন, না প্রকট? রবীন্দ্র-দর্শন মতে তা প্রচ্ছন্ন। কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক আদর্শের অনুগমনে কেউ যদি তাকে প্রকট রেখেই শিল্প গড়তে পারেন

এবং সে শিল্প যদি মনকেও নাড়া দেয়, তাহলে একমাত্র নীতি ও রুচির অজুহাত ছাড়া আর কোন্ কারণে তা নিয়ে লড়াই বাঁধানো যেতে পারে? তাছাড়া গোবিন্দদাসের উদ্দামতায় একটা পৌরুষদীপ্ত নির্লিপ্ততা আছে, যা তাঁকে অশ্লীল হতে দেয় নি।)

আমরা আগেই বলেছি, গোবিন্দদাস মনে-প্রাণে বিদ্রোহী ছিলেন—তাঁর দৃষ্টি বিদ্রোহী, ভাষা বিদ্রোহী, ভাব বিদ্রোহী। এ সমস্তই যদি কোন অবদমন জনিত বৈকল্যের ফল হয় ত হক, বৈকল্য যখন মানুষের পক্ষে অনতিক্রমণীয়, তখন যিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ আত্মকেন্দ্রিক এবং অকপট, তিনি তা গোপন রাখবেন কি করে? সে গুলোকে স্বীকার করেই তাঁকে গ্রহণ করতে হবে। সেগুলোর ভিতর দিয়েও তাঁর সৃষ্টি সহনীয় হতে পেরেছে কি না, মানব-মনের ওপর তা প্রভাব বিস্তার করতে পারে কি না, সেইটুকুই বিচার্য্য। আমরা মনে করি, সে বিচারে সমসাময়িকদের মধ্যে গোবিন্দদাসের পাশে দাঁড়াবার মতো কবি দেবেন সেনও নন, অক্ষয় বড়ালও নন, দ্বিজেন্দ্রলালও নন—অথচ তাঁদের আমরা যেমন করে হক কিছুটা মনে রাখতে চেষ্টা করেছি, ভাওয়ালের কবিই আমাদের নজরের বাইরে চলে গেছেন।

[৩] শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের লোকান্তরপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই তাঁর সাহিত্য নিয়ে চুলচেরা বিচার সম্ভব নয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব এখনো আমাদের চোখের সাম্নে এমন সুস্পষ্টরূপে জাগরূক রয়েছে যে তাঁকে বাদ দিয়ে তাঁর সাহিত্য-বিচার আজ এক রকম দুঃসাধ্য। অথচ সত্যিকার সমালোচনা মানেই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হয়ে সাহিত্যকে দেখা ও বোঝা এবং সেই দর্শন ও মননকে অন্যের গোচরে আনা। এই জন্যেই সমসাময়িকের পক্ষে নির্ভরযোগ্য সমালোচনা করা প্রায়ই ঘটে ওঠে না। বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের মতো সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ প্রতিভার সমালোচনা করা—তাঁর সৃষ্টির পরিধি এত ব্যাপক, তাঁর দৃষ্টির বৈচিত্র্য এত বেশী যে তাঁকে প্রচলিত সমালোচনা সাহিত্যের বাঁধা ছকে বোঝানো যায় না—তিনি স্বকৃত আদর্শের পথে স্বয়ংসিদ্ধ, কোন মতবাদ বা দলীয় আন্দোলনের অনুপূরক হিসাবে তাঁর সাহিত্য জন্মায় নি। কাজেই বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা কোন সমালোচনা করতে প্রয়াস করবো না।

ব্যক্তিগত ভাবে বর্ত্তমান লেখকের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কতটা সম্বন্ধ ছিল, পত্রান্তরে তা সংক্ষেপে লেখবার চেষ্টা করেছি। দেশের নবীন-প্রবীণ বহু লেখক-লেখিকাই তা লিখেছেন। কাজেই তারও পুনরাবৃত্তি নিরর্থক। বিশেষতঃ শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের কাল থেকে সুরু করে একেবারে মৃত্যু-শয্যা পর্য্যন্ত যাঁরা তাঁর নিত্য-সাহচর্য্য লাভ করতে পেরেছেন, এ কাজে তাঁদেরই সমধিক অধিকার। আমাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ মাত্র গত সাত আট বৎসরের—তখন তিনি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট্, আমরা নূতন সাহিত্যব্রতী। তবে সৌভাগ্যের বিষয়

আমাদের তিনি ভালোবেসেছিলেন এবং এত বেশী ভালোবেসেছিলেন যে তাতে অনেকেরই ঈর্ষা উদ্রিক্ত হয়েছিল। সেজন্যে অন্তরালে আমরা তাঁর জন্যে দীর্ঘকাল অশ্রু বিসর্জ্জন করবো, কিন্তু দেশের পাঠক পাঠিকাদের কাছে সেজন্যে আমাদের নিজস্ব কোন দাবী-দাওয়া নেই। বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লেখক হিসাবে তাঁর জন্যে সমস্ত দেশই শোকার্ত্ত—সেই শোকের একজন সাধারণ অংশীদাররূপে আমাদের দাবী আর কত দূর যেতে পারে?

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আসন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার যুগে আমরা ছিলাম ছাত্র। তখন আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভেতর প্রবেশ করেছি, বঙ্কিমের প্রভুত্ব তখনো ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে কাজ করছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' থেকে 'চোখের বালি'তে এসে আমরা অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু দোষে-গুণে যে জীবন আমরা নিত্য যাপন করি, তাকে আরো স্পষ্ট করে আমরা সাহিত্যে পাবার জন্যে লুব্ধ হয়ে উঠেছিলাম। শরৎচন্দ্র ঠিক সেই সময়ই আবির্ভূত হলেন এবং প্রথম আবির্ভাবেই তিনি দেশের চিত্তবৃত্তিকে সবলে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নিলেন। হঠাৎ একদিন আমরা আবিষ্কার করলাম যে তিনি একান্ত আমাদেরই।

ভাবাবেগের ঢেউ কাটিয়ে যখন বিচার-বুদ্ধির শক্ত জমিতে পা পড়লো, তখন অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা করার দুষ্টবুদ্ধি মাথায় আসেনি এমন নয়। কেতাবী যুক্তি-তর্কের জাঁতাকলে ফেলে বিশ্লেষণ করে দেখার ইচ্ছা হয় নি এমন নয়। কিন্তু সমস্ত অপচেষ্টাকে ছাপিয়েই তিনি আমাদের হৃদয়কে জয় করেছিলেন—সে তাঁর অনন্যসাধারণ ষ্টাইল আর অকপট অনুভূতির গুণে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের অতিমানুষী প্রভাবের ছায়ায় দাঁড়িয়ে, এত বড় বলিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্য দাবী করার শক্তি আর কারুরই হয় নি—হওয়া সহজও ছিল না।

বলা বাহুল্য তাঁকে সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত বলা যায় না—তিনি জীবিত কালে একথা শুনে দেখেছি ক্ষুব্ধই হতেন, কিন্তু তাঁর সাহিত্যদৃষ্টি যে একান্ত তাঁরই ছিল এবং তাঁর ষ্টাইলও যে কারুর ধার-করা ছিল না, একথা কোন প্রমাণেরই অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য খবরের কাগজে তাঁকে দীন-দুঃখী ও নির্য্যাতিতের বন্ধু এবং পতিতাদের পেট্রণ বলে ঘোষণা করা হয়ে থাকে—সরল-হৃদয় শরৎচন্দ্রও এতে খুসী হতেন এবং মনে করতেন, এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। বস্তুতঃ এটা সাহিত্য-বিচারে সুলভ ism-এর দোহাই পাড়া। এর উর্দ্ধে উঠতে পেরেছিলেন বলেই তিনি এত বড় ছিলেন। Ism জিনিসটা হল জীবদেহে অস্থি-সংস্থানের মতো অন্তর্লগ্ন জিনিস—এ যে রচনায় গলাবাজী করে বাইরে আত্মস্বাতন্ত্র্য দাবী করে, সে রচনা আর যাই হক সাহিত্য হয় না।

শরৎচন্দ্র কোন দিনই মনে করেন নি যে পাপ-তাপ পতন-স্খলনই জীবনের চরম গতি বা পরম প্রসাদ। কিন্তু জীবনে এদের স্বীকৃতি আছে—নীতিজ্ঞানবশে এদের উড়িয়ে দিতে যাওয়া নিরর্থক—এদের মেনে নেওয়াতেই জীবনের সার্থকতা—তাই তিনি এদের শ্রদ্ধা দিয়েই দেখেছেন। কিন্তু তাঁর যদি মিশনারী বুদ্ধির আতিশয্য থাকতো, তাহলে তিনি এদেরই মহিমান্বিত করে তুলতেন এবং এদের পাশে এসে ক্ষমা প্রেম পবিত্রতা তুচ্ছ হয়ে যেতো। কিন্তু তা তিনি করেন নি। দরিদ্রকে তিনি শ্রদ্ধা করেছেন, কিন্তু অদরিদ্রের বিরুদ্ধেও তিনি জেহাদ ঘোষণা করেন নি। পতিতাকে তিনি মর্য্যাদা দিয়েছেন, কিন্তু সতীর বিরুদ্ধেও তাঁর কোন নালিশ ছিল না। জীবনকে যিনি সত্যিকার চোখ দিয়ে দেখেছেন, তাঁর দৃষ্টি কোনদিনই সে রকম একদেশদর্শী হতে পারে না। এখানেই শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী শুধু তাঁরই। তিনিই দেশকে

বুঝিয়েছেন যে মানুষ দেবতাও নয়, দানবও নয়—দুয়ের উপাদানই তাতে আছে, তার চেয়ে বেশীও কিছু আছে, সে তার মানবত্ব। এই সর্ব্বাঙ্গীন মানবত্বের উপাসক বলেই তিনি আমাদের নমস্য।

তাঁর সাহিত্যে বিশ্ব-মানব নেই—তারা পরস্পর-বিরোধী অন্তর্বৃত্তির প্রতিনিধিরূপে একে অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয় না। তারা ভালো-মন্দ দোষ-গুণ নিয়ে একান্ত আমাদেরই মতো মানুষ। তারা দোষ করে আমাদেরই মতো, আমাদেরই মতো দোষের ঊর্দ্ধে ওঠে—ক্ষমা দিয়ে, প্রীতি দিয়ে, মমতা দিয়ে। সাহিত্যের মধ্যে তাদের মেনে নেওয়াতে সত্যকেই মেনে নেওয়া হয়, আর যে সাহিত্য তাই মেনে নেয়, সেই সাহিত্যই হল সত্যিকার জাতীয় সাহিত্য। সেদিক থেকে তাঁর মতো খাঁটি বাঙালী লেখক এ যুগে আর কেউ নেই—বাংলাকে আর কেউ এত ভালো করে দেখেনি, এত ভালো কেউ বাসে নি। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'দোষে-গুণে বাঙালী জাতটা, বাংলা দেশটা বেশ'। তাঁর সাহিত্য তাঁর সেই ঐকান্তিক উক্তিরই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। যুগ যুগ ধরে তা থেকে বাঙালী প্রাণের খাদ্য আহরণ করবে।

শরৎচন্দ্র আজ নেই—তাঁর সাহিত্য আছে, চিরদিনই থাকবে। কিন্তু যে মানুষটির জীবনব্যাপী সাধনা ও উপলব্ধি সাহিত্যের ভেতর দিয়ে মূর্ত্ত হয়ে, জাতির মন-প্রাণকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেছে, তাকে চিরদিনের জন্যে এত বড় করে দিয়েছে, তাঁরও কি সত্যিই বিনাশ আছে?

[৪] জলধর সেন

জলধর বাবুর সঙ্গে আমাদের যখন পরিচয়, তখন তিনি জীবনের শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছেন, সেখান থেকে আর এক-পা এগুলেই তিনি লোকচক্ষুর আড়াল হয়ে যাবেন। আমরা তখন সাহিত্যক্ষেত্রে সবে মাত্র এসেছি—আমাদের পরিচয় তখনো রীতিমতো সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিস্ময়কর রূপে দুই চরম প্রান্তের মধ্যবিন্দুতে আমাদের ভেতর আলাপ হয়ে গেল। তিনি যে যুগের সাহিত্যিক সে যুগ শেষ হয়ে গিয়েছিল—প্রবহমান সাহিত্য-ধারার সঙ্গে স্বভাবধর্মেই তাই তাঁর যোগ-সূত্র গিয়েছিল ছিন্ন হয়ে। আমরা সাহিত্যে যে আদর্শ নিয়ে এসেছিলাম, তিনি তা থেকে পিছিয়ে ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁর যুগের অন্য লেখকদের মতো আমাদের সম্বন্ধে তাঁর অবিশ্বাস, সন্দেহ বা ঈর্ষা ছিল না। তিনি আমাদের স্বীকার করে ত নিয়েছিলেনই, উপরন্তু শ্রদ্ধাও করেছিলেন।

এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে আমাদের সঙ্গে তাঁর যোগটা সাহিত্যিক অপেক্ষা সামাজিকই ছিল বেশি। এবং এই সামাজিক ঔদার্য্যই তাঁর ভেতরকার রূপটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে ফুটিয়েছিল। বয়সের দিক দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সামান্য বড় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অদ্ভুত প্রাণ-শক্তির জোরে যুগের গতির সঙ্গে তাল রেখেই চলেছেন, তবু তাঁর লেখনী থেকেও আধুনিক লেখক সম্বন্ধে হতাশার সুর বারবার প্রকাশ পেয়েছে এবং এ নিয়ে আধুনিক লেখকদের সঙ্গে একাধিকবার তাঁর ভাব-সংঘর্ষও ঘটে গেছে। শরৎচন্দ্র ত প্রকাশ্য ভাবেই আধুনিকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন। তুলনায় সমালোচনা না করেই এ কথা তাই অনায়াসে বলতে পারা যায় যে জলধরবাবু

সাহিত্য-স্রষ্টা যত বড় ছিলেন, তার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন সাহিত্যের পোষক। এই পোষকতা-বোধের মূলে ছিল তাঁর নিরহঙ্কার সরল সহজ নমনীয় অন্তর—যা বাংলা দেশে খুব সুলভ নয়।

যে জলধর বাবু একদা পরিব্রাজকরূপে হিমালয়ের পথে পা বাড়িয়েছিলেন, বা কলকাতার বহুব্যস্ত সাংবাদিক-বাজারে ক্ষিপ্রবেগে দিনের পর দিন লেখনী চালনা করেছিলেন, তাঁকে আমরা দেখিনি। কিন্তু ছোট-বড় ভালো-মন্দ নির্বিশেষে বাংলার লেখক মাত্রেরই সঙ্গে যিনি অবাধ আন্তরিকতার সঙ্গে মিশেছিলেন, সকলকে মুগ্ধ, বিস্মিত ও বিগলিত করেছিলেন, তিনি আমাদের বিশেষ চেনা। তাঁর ব্যক্তিত্বের এই অপূর্ব্বতা, তাঁর লেখাতেও আমরা পূর্ণমাত্রায় পেয়েছি। যুগের হাওয়ায় সাহিত্যের আদর্শ হয়ত বদলাবে, কিন্তু হৃদয় মাধুর্য্যের দাম কোন দিনই ত কমবে না। সেদিক থেকে জলধর বাবু আমাদের অন্তরে চিরস্মরণীয় হয়েই থাকবেন।

[৫] দীনেশচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্য

আজকের দিনে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটা মূল্য ও মর্য্যাদা শিক্ষিত সমাজে স্বীকৃত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে ছেলেমেয়েরা তা পড়ছেন, অধ্যাপক ও লেখকরা তা নিয়ে গবেষণা করছেন। গ্রাম্য সঙ্গীত, পল্লী সাহিত্য, প্রাচীন পুঁথিপত্র, আজ বিদ্বৎ সমাজের সশ্রদ্ধ অনুসন্ধানের বিষয় হয়েছে। কিন্তু অল্পকাল পূর্ব্বেও এমন দিন ছিল, যখন শিক্ষিত সমাজ পুরাতন বাংলা সাহিত্যকে শুধু অপাংক্তেয় বলেই মনে করতেন না, তার সন্ধানও তাঁরা জানতেন খুব কমই। প্রাচীন ধরণের স্ত্রী-পুরুষ কেউ কেউ এবং গ্রাম্য লোকেরা অনেকেই বটতলা, বঙ্গবাসী ও বসুমতী প্রেসের আনুকূল্যে এগুলিকে সসঙ্কোচে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। দেশের প্রবহমান সাহিত্য-ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এরা অনুন্নত সাধারণের হাতে পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং এই ভাবেই ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে আসছিল।

রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রমুখ মনীষীরা চেষ্টা করেছিলেন এই ক্ষয়িষ্ণু সাহিত্য-ধারাকে অল্পসল্প ঠেকো দিয়ে খাড়া করে রাখবার। কিন্তু তাঁদের হাতে উপাদানের অভাব ছিল এত বেশী যে তাঁরা যথেষ্ট সদিচ্ছা নিয়েও কোন কাজের কাজ করে উঠতে পারেন নি। তাঁদের লেখনী-প্রসূত বইগুলি লোকে হয়ত পড়েছেন, কিন্তু তার ফলে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁরা শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন নি। এই দেশব্যাপী উপেক্ষা ও অসাড়তার ভেতর থেকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করে, তাকে শিক্ষিত সমাজের গ্রহণীয় ও শ্রদ্ধার্হ করে তুলেছিলেন দীনেশবাবু এবং এ ব্যাপারে তিনি শুধু

প্রথমই মন, সর্ব্বপ্রধান। বৈষ্ণব প্রেম-সঙ্গীত ও বাৎসল্য-সঙ্গীত, আগমনী-বিজয়ার গান, রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের ভক্তি-সঙ্গীত, দাশু রায়ের পাঁচালী, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত, কাশীদাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মনসার ভাসান, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্ম্ম ঠাকুরের কাহিনী, গোপীচাঁদের গান, বাউল গান, ভাটিয়াল গান, সারী, জারী, মুর্শিদা গান, আজ মুদির খেরো বাঁধানো দপ্তর ও পল্লী-বধূর তেল-সিঁদুর-চর্চ্চিত ঝাঁপি থেকে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের ফাইলে ও সাহিত্যানুরাগী পাঠকদের টেবিলে যে স্থান করে নিয়েছে, এর পেছুনে দীনেশবাবুর অদৃশ্য হাত কতখানি কাজ করেছে, একথা আমরা প্রায় ভুলেই গেছি!

দীনেশবাবু প্রাচীন বাংলা সাহিত্যকে দেশের চোখের সামনে গৌরবোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে শুধু তুলেই ধরেন নি, এই সাহিত্যের আলোচনার ভেতর দিয়ে তিনিই প্রথম বাংলার নৈতিক ও সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাসও গড়ে তোলেন। বৌদ্ধ, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব—নানা ধর্ম্মমতের উদ্ভব থেকে বাংলার জীবন-ধারায় যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটেছে এবং সেই পরিবর্ত্তনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-পদ্ধতি দেশের সংস্কৃতি-ধারাকে পরিপুষ্ট করেছে, তার খবর আমরা কেউই বড় রাখতাম না। এদেরই কোন রূপান্তর আজকের বাঙালীর সমাজ-সংস্থানের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, তাও ছিল আমাদের কাছে অপরিজ্ঞাত। তাই আমরা নিজেদের মৌলিক পরিচয় ভুলে গেছলাম। বাঙালী যে একটা ভুঁইফোড় জাতি এবং তার ইতিহাস বলুন, সাহিত্য বলুন, সব কিছুরই জন্ম যে ইংরেজ আমলে, একথাই আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম। তার ফলে অতীত বাংলার দিকে পেছুন ফিরেই আমাদের যাবতীয় চিন্তা-

চেষ্টার, জ্ঞান-কর্ম্মের অনুশীলন স্থুরু হয়েছিল। অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রতিককে আশ্রয় করে যে কি করে জাতি গড়ে উঠতে পারবে, সে কথা দেশের কেউই ভাবেন নি। দীনেশবাবুই প্রথম সে কথা টের পেয়েছিলেন এবং সেই জন্যেই জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি, রীতি ও ঐতিহ্যের সত্যিকার চাবিকাঠি যেখানে, সেই সাহিত্যকে তিনি সম্যক রূপে জাতির সামনে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন। এদিক থেকে তাঁকে এযুগে বাংলা জাতীয় উদ্বোধনের অন্যতম প্রধান নেতা বলেই আমাদের নমস্কার করা উচিত।)

পরবর্ত্তী বয়সে এই দৃষ্টিকে অধিকতর স্পষ্টরূপে বাংলার সংস্কৃতির সমুদয় শাখার ভেতর দিয়ে প্রকট করার জন্যে তিনি সাহিত্য ছেড়ে, ইতিহাসে হাত দিয়েছিলেন এবং বোধ হয় তিনিই প্রথম রাষ্ট্রিক ইতিহাস ছেড়ে, সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে দেশের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলার জীবন-ধারার একটা স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়—এদেশের জনসাধারণ কেন্দ্রীয় শাসন-তন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন এবং স্ব স্ব বাস-গণ্ডীর ভেতর নির্ব্বাসিত হয়েই থেকেছে। রাষ্ট্র-শক্তির ভাঙাগড়া, উত্থান-পতনকে তাই তারা কোনদিন বড় করে দেখে নি—মহারাষ্ট্র, রাজপুতানা, পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশের জন-জীবন নিয়ন্ত্রিত করেছে তাদের রাষ্ট্রিক জীবনাদর্শ, পক্ষান্তরে বাংলার জীবনকে নাড়াচাড়া দিয়েছে, উল্টেপাল্টে দিয়েছে তাদের সংস্কৃতির প্রভাব। তাই বাংলার ইতিহাসে কোন ব্যাপক বিদ্রোহ, বা যুদ্ধ বা রাষ্ট্র-বিপর্য্যয় নেই, যা ঐ সব দেশের ইতিহাসে প্রচুর। এর বদলে বাংলায় গড়ে উঠেছে বিচিত্র সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম্ম এবং পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠান। স্থতরাং রাজনৈতিক দিক থেকে বাংলার ইতিহাসকে ধরতে গেলে বিশেষ কিছুই পাওয়া যাবে না, বারো ভূঁইয়া, বা কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ বা এমনি দু'একটা

খুচরো ব্যাপার ছাড়া। বাংলার আসল ইতিহাস, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রম-বিবর্ত্তনের ভেতর দিয়েই আহরণ করতে হবে। দীনেশবাবুই সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

দীনেশবাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' এবং 'বৃহৎ বঙ্গ' দু'খানি বই-ই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তুটি অবিস্মরণীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। পরবর্ত্তী কালের অনুসন্ধান ও গবেষণায় এদের অনেক কিছুই হয়ত উল্টে পাল্টে যেতে পারে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে চিরদিনই তা গিয়ে থাকে, কিন্তু প্রথম ভিত্তিস্থাপনের যে গৌরব, দেশের চিন্তা-ধারাকে সকলের আগে আসল দিকে মোড় ফিরিয়ে দেবার যে মর্য্যাদা, তা থেকে দীনেশবাবু কোন দিনই বঞ্চিত হবেন না।

[৬] পরলোকে রবীন্দ্রনাথ

জানা কথা মানুষ অমর নয়—এমন কি, রবীন্দ্রনাথের মতো মহা-মানুষেরাও না। সুতরাং যত বড় বেদনাই হক, তাঁর মৃত্যুকে আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। কিন্তু আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন-ধারার ভেতর রবীন্দ্রনাথ নেই, এ কথা আমরা, যাঁরা তাঁরি ভাব-ভূমিতে ভূমিষ্ঠ, তাঁরি দৃষ্টি দিয়ে দেখেছি জগৎকে জীবনকে, তাঁরি ভাষা দিয়ে প্রকাশ করেছি আপনাকে, ভাবতেই পারি না। হ্যান্স এণ্ডারসন সম্বন্ধে বিদেশী লেখক লিখেছেন, We, modern men and women, are Hans Anderson-babies—আমরা আধুনিক ভারতের নর-নারীরাও রবীন্দ্র-পৃথিবীর শিশু—আমাদের ভাব, কর্ম্ম, জীবন, মনন, সবই আবর্ত্তিত হচ্ছে তাঁকে কেন্দ্র করে। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দেখেছি তাঁকে আমাদের সংস্কৃতির প্রাণ-পুরুষরূপে। আমাদের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্ত প্রচেষ্টার ভেতরই আমরা অনুভব করেছি তাঁর সমুদ্রের মতো বিরাট, সূর্য্যের মতো প্রদীপ্ত প্রতিভার প্রত্যক্ষ স্পর্শ। সময় বদলেছে, আমাদের জীবনে আজ এসেছে দুঃসহ দুঃখ, আশাহত, আদর্শ-বিভ্রান্ত আমরা বিরোধিতা করেছি সবার বিরুদ্ধে, হয়ত তাঁর বিরুদ্ধেও, কিন্তু অজ্ঞাতসারেই আমাদের ভাষা অনুসরণ করেছে তাঁকে। আমাদের অপরিসীম পিতৃ-ঋণ আমরা গোপন করতে পারিনি। সেই রবীন্দ্রনাথ কোন একদিন থাকবেন না, এ কল্পনাই আমাদের মনে স্থান পায় নি।

আমাদের পরে যাঁরা আসবেন, জানি তাঁদের কোথাও লাগবে না। তাঁরা কবিকে পাবেন তাঁর সৃষ্টির ভেতর—বর্ষণ-মুখর শ্রাবণের রাত্রে, বকুল-মদির ফাল্গুনের প্রভাতে, প্রচ্ছায়শীতল বৈশাখী দুপুরে, তাঁদের কণ্ঠে

ধ্বনিত হবে তাঁর বিচিত্র গানগুলি। তাঁদের প্রণয়ে-বিরহে, আশায়-ব্যর্থতায় তাঁর কাব্য জোগাবে আত্তি ও আনন্দের, শান্তি ও সান্ত্বনার পরম পথ্য। তাঁদের রঙ্গালয় কল্লোলিত হয়ে উঠবে তাঁর নাটকের অভিনয়ে—তাঁদের গৃহাঙ্গনে গুঞ্জরিত হবে তাঁর গল্প, উপন্যাস, কাব্য ও কৌতুক রচনা—শিক্ষায়তন ও সংস্কৃতি-সভা পাবে তাঁর গদ্যসাহিত্য থেকে নব নব পথে দৃষ্টি ও চিন্তাকে পরিচালিত করবার পথ-নির্দেশ।) সুদূরের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ভাবময় রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কল্পনাকে রাখবেন আচ্ছন্ন করে—যেমন রেখেছেন পৃথিবীর আর আর বরেণ্য কবিরা, হোমর, ভার্জ্জিল, বাল্মীকি, কালিদাস, হাফিজ, ওমর, সেক্সপীয়ার, চণ্ডীদাস-রা! কিন্তু তাঁরা কি জানবেন, কত বড় মহিমাময় পুরুষ ছিলেন এই রবীন্দ্রনাথ? তাঁর চোখে ছিল কি অসামান্য মনীষার দীপ্তি, তাঁর শুক্ল কেশে ও শুভ্র বেশে ছিল কি অসীম সঙ্গতির সুষমা, তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল কি বিচিত্র সঙ্গীত-স্পন্দন? এই পৃথিবীর পশুপাখী, গাছপালা, ফুলফল, আকাশ জলকে তিনি ভালো বেসেছিলেন কত গভীর মমতায়, কত নিবিড় অনুরাগে চেয়েছিলেন তিনি সমস্ত মানুষকে শান্তি ও সৌন্দর্য্যের বন্ধনে বাঁধতে! দূরকে তিনি নিকট করেছিলেন কি যাদুমন্ত্রে, নিজেকে সহস্ররশ্মি রবির মতোই কি করে তিনি সীমাহীন সৌর পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন! তাঁরা জানবেন না, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র পরিচয়ও তাঁরা পাবেন না। তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ হবেন শুধু কবি, শুধু মনীষী, শুধু ভাবুক।

কবি তিনি এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কবিদের অনেকের চেয়েও হয়ত শ্রেষ্ঠই, আর নিজের কবি-পরিচয়কেই তিনি সব চেয়ে বেশী ভালো-বাসতেন, এও জানি। কিন্তু আমাদের কাছে তিনি কি খালি কবি? তিনি একটা যুগ—একটা শতাব্দীব্যাপী সংস্কৃতির চলমান প্রতিভূ।

আমরা সমসাময়িকরা ছাড়া তাঁর সেই সর্ব্বব্যাপিতা, সর্ব্বতোমুখিতা সার্ব্বভৌমিকতা আর কে বুঝবেন? তাই অনাগত যুগ কোন দিনই তাঁকে হারাবেন না। সেদিনের তাঁরা ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহ করবেন, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের কোন্ কোন্ বিভাগে কি কি দান করেছেন, দেশের সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, নৃত্যে ও অভিনয়ে এনেছেন কি কি নূতন আদর্শ, দেশের সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি কি কি নূতন মতবাদ প্রবর্ত্তিত করেছেন। সেই সঙ্গে হয়ত আবিষ্কার করবেন, কতদিন তিনি জমিদারী চালিয়েছেন, কোন্ কোন্ পত্রিকা সম্পাদন করেছেন, স্বদেশী আন্দোলনে কতটা অংশ গ্রহণ করেছেন, পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে বেড়িয়েছেন—কার কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন—হয়ত আহরণ করবেন তাঁর বিশ্বভারতীর ইতিবৃত্ত, তাঁর গার্হস্থ্য জীবনের বিবরণ, তাঁর লোক-কল্যাণকর বিবিধ অনুষ্ঠানের ইতিহাস। কিন্তু এই খণ্ড খণ্ড অভিব্যক্তিকে পরিব্যাপ্ত করে যে অখণ্ড রবীন্দ্রনাথ—জ্ঞানে, কর্ম্মে, বৈচিত্র্যে, বিস্ময়ে, অভিজ্ঞতায়, অতুলনীয় যে রবীন্দ্রনাথ, তাঁদের কল্পনা তাঁর নাগাল পাবে না। (তাই বার বার আজ মনে হয়, প্রতিভা অমর—তবু মানুষ অমর নয়।)

কিন্তু আমরা যাঁরা এই মহাপ্রতিভার স্নেহচ্ছায়া পেয়েছিলাম, জীবনের কোন কোন অধ্যায় যাঁদের মধুর হয়েছিল, মহনীয় হয়েছিল তাঁর মহিমময় ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রভায়, কোন সান্ত্বনাতেই তারা ভুলতে পারে না যে তিনি নেই। তাঁর সেই অপার্থিব দ্যুতিময় দৃষ্টি, সেই ছন্দায়িত কণ্ঠস্বর, সেই প্রশান্ত ধ্যান নিমগ্ন মূর্ত্তি···এ তারা ভুলবে কি করে? কি করে ভুলবে, কতখানি প্রসন্নতার সঙ্গে তিনি দীনতম ভক্তটিকেও নিজের হৃদয়ের সান্নিধ্য দিতেন—আলাপে-কৌতুকে, আবৃত্তিতে-গানে তাঁর সর্ব্বদা উচ্ছল অন্তঃকরণকে অবাধে উজাড় করে দিতেন তারো কাছে?

সূর্য্যের মতো বিশ্বকে যিনি ঘিরেছিলেন দীপ্তি দিয়ে, তাঁর সেই মহিমান্বিত বর্ণচ্ছটার আড়ালে যে কি স্নেহ সুকোমল প্রচ্ছায় শীতল আশ্রয়ও ছিল, তা যারা জেনেছে, তাদের দুঃখ তাই শান্ত হবে না। তাদের সেই কাছের রবীন্দ্রনাথ নেই—সামান্য অসুখেই যাদের জন্যে এসে পৌঁছুতো হোমিওপ্যাথিক ওষুধ, বিনা প্রার্থনাতেই যারা পেতো তাঁর আঁকা ছবি, নয়ত লেখা কবিতার উপহার—যাদের সমস্ত দাবী সমস্ত খেয়ালই পূরণ করতেন যিনি সহাস্য ঔদার্য্যে—মহান হয়েও যিনি পারতেন নিজের মহিমাকে সংহত করে ছোটর কাছে ছোট হয়ে ধরা দিতে - সেই রবীন্দ্রনাথ নেই। রইলো তাঁর সাহিত্য, তাঁর বিশ্বভারতী, তাঁর বিচিত্র বহু কর্ম্মান্বিত জীবনের উজ্জ্বল অবিনশ্বর ইতিহাস—কিন্তু সমস্ত কীর্ত্তির অন্তরালে ছিলেন তাদের যে রবীন্দ্রনাথ, তিনি আর নেই।

(আগামী যুগ তাঁকে দেখবে সাহিত্যের ভেতর দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বলতেই তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে একটা আদর্শ—একটা প্রাণবন্ত সংস্কৃতির ভাব-বিগ্রহ।) যেমন আজ হয় বেদ-উপনিষদের নামে, বৈষ্ণব সাহিত্যের নামে। কিন্তু এই অক্ষয় সৌন্দর্য্যের, অমর সত্যের স্রষ্টা যে অসামান্য পুরুষেরা, তাঁদের কেন্দ্র করে আজ তরঙ্গিত হয় শুধু কল্পনা, শুধু বিস্ময়-বিমুগ্ধ আবিষ্কৃতি। রবীন্দ্রনাথও হবেন তেমনি একটা ভাব, তেমনি একটা আদর্শ। আপন বিস্ময়কর সৃষ্টির অন্তরালেই তিনি থাকবেন প্রাণ-পুরুষ রূপে প্রচ্ছন্ন। কিন্তু সেদিন কে জানবে—এই যে রবীন্দ্রনাথ, এঁকে আমরা দেখেছি, এঁর কথা আমরা শুনেছি, এঁর স্নেহ আমরা পেয়েছি? আমাদের ক্ষুদ্রতা খর্ব্বতা, দীনতা মূঢ়তাকে তিনি প্রীতি দিয়ে, ক্ষমা দিয়ে, সমবেদনা দিয়ে একদিন মধুর করে নিয়েছিলেন? আমরা ধুয়ে মুছে নিঃশেষিত হয়ে যাবো একদিন ইতিহাস থেকে—সেই সঙ্গেই আমাদের স্মৃতির রবীন্দ্রনাথও চলে যাবেন। আজ সেই

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ! আমরা রবীন্দ্রনাথের ভারতভূমিতে ভূমিষ্ঠ, রবীন্দ্রনাথের করুণায় উজ্জীবিত সাহিত্য-সন্ততিরা তাঁকে হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছি—আমাদের সেই বিহ্বল বেদনা সার্ব্বভৌম বিশ্ব-বেদনার ভিতর ক্ষুদ্র একটা বুদ্বুদ হয়ত। তবু আমরা কাঁদবো—রবীন্দ্রনাথ নেই, আমাদের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী যে রবীন্দ্রনাথ তিনি চ'লে গেছেন!

সপ্তম স্তবক : ইতিহাস

[১] বাংলা কাব্য সাহিত্যের ধারা

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বলতে এক সময় আমরা প্রধানতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যকেই বুঝতাম। হয়ত প্রাচীনেরাও তাই বুঝতেন। তাই এ-দেশে পদাবলী সাহিত্যের অনুশীলন ও রক্ষণ যে পরিমাণ হয়েছে, অন্য শ্রেণীর সাহিত্যের তা হয়নি। আদি থেকে আরম্ভ করে একেবারে ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সাহিত্যকে আমরা মোটা কথায় প্রাচীন সাহিত্য বলে থাকি, তা একান্তভাবেই উপধর্ম্মমূলক। বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, একটা-না-একটা ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করেই এই সুবিস্তৃত সাহিত্যের জন্ম এবং এর এক শাখার সঙ্গে আর এক শাখার আকারে কিছু প্রভেদ থাকলেও, প্রকারে বিশেষ কোন তফাৎই নেই। সব শাখার সাহিত্যই নীতি ও অনুষ্ঠানমূলক, পুনরাবৃত্তি দুষ্ট, আধিদৈবিক উপপ্লবে ক্লিষ্ট এবং মামুলি রচনা-পদ্ধতির দোষে দুষ্পাঠ্য। বৈষ্ণব কাব্য সাহিত্য এই উপধর্ম্মের বাঁধা ছকের মধ্যে পড়লেও, তার আবেদন অনেকটা রোমান্টিক; তাই এই শাখাটা দেশে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সুফী মিষ্টিক বা বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের কাব্যের নিগূঢ়ার্থ যাই হক, আমরা তার লৌকিক ব্যঞ্জনাকেই গ্রহণ করে থাকি। ওরা আমাদের কাছে সাধ্য-সাধনতত্ত্বের রূপক ব্যাখ্যা মাত্র নয়—লিরিক কবিতা এবং সেইটাই আমাদের পক্ষে বড় কথা। বরং এ-ও আমরা মনে করি যে সুফী কবি বা বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে

রূপকের আড়ম্বর যত প্রবলই হক, তার ভেতরে আধ্যাত্মিকতার সম্বন্ধ খুব কম।

(কিন্তু বৈষ্ণব কাব্যই বাংলার সব চেয়ে প্রাচীন সাহিত্য নয়। ওর সময় চৈতন্যের শতাধিক বৎসর পূর্ব্ব থেকে চৈতন্যের পরবর্ত্তী শ' দুই বৎসরের ভেতর। এর আগে ধরা হত কৃত্তিবাস, কাশীদাস ও মুকুন্দ-রামকে—এঁরা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনরা এবং ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, দাশুরায় প্রভৃতিকে নিয়েই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ সীমাবদ্ধ ছিল।) রামগতি ন্যায়রত্ন যখন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' লেখেন, তখন তাঁর পুঁজি এর বেশী ছিল না। রমেশ দত্তের Literature of Bengal বা হারাণ রক্ষিতের 'ভিক্টোরিয়া যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য'ও আর বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। সৌভাগ্য-বশতঃ দীনেশবাবুর বই প্রকাশের সময় প্রাচীনতম বাংলা রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। নেপাল থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একখানি পুঁথি আবিষ্কার করেন—এটি একটি সঙ্কলন গ্রন্থ। তান্ত্রিক বৌদ্ধ কয়েকজন মঠাশ্রয়ীর লেখা হেঁয়ালি আকারের কতকগুলি পদ—এই হল প্রাচীনতম বাংলা রচনা। এদের অল্প পরের রচনা ময়নামতী বা গোপীচাঁদের গান, শূন্যপুরাণ, কৃষ্ণকীর্ত্তন। এদের রচনাকাল নাকি নবম শতাব্দী থেকে আরম্ভ, কারণ বৌদ্ধ দোঁহার লেখক কাহ্নপাদ, লুইপাদ প্রভৃতির সঠিক তারিখ পাওয়া যাচ্ছে। সুনীতিবাবু এই আমলটাকে তুর্কি বিজয়ের সমকাল বা তার প্রাক্কাল বলেছেন। (মোটা কথায় এটাকে বৌদ্ধ প্রভাবের যুগ বলা যেতে পারে।)

(বৌদ্ধ মহাযান ও হীনযান উভয় তন্ত্রের ছাপই এই সাহিত্যে সুস্পষ্ট —ত্যাগ, নিষ্ঠা, সংযম, সন্ন্যাস ও মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁক, গাছচালা, নলচালা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে এই আড়ষ্ট ছড়াগুলির কলেবর বৃদ্ধি করেছে।)

(কিন্তু অসাহিত্য হলেও এদের উপেক্ষা করা কঠিন। কারণ পরবর্ত্তী সাহিত্যে এদের প্রভাব জাজ্জ্বল্যমান। কৃষ্ণকীর্ত্তন বৈষ্ণব লিরিক পর্য্যায়ের অগ্রদূত, আর গোপীচাঁদে পরবর্ত্তী মঙ্গল-কাব্যের প্রথম পত্তন—শূন্যপূরাণ বা দোঁহার ছায়া পরবর্ত্তী পরকীয়াবাদী বৈষ্ণবের, বামাচারী তান্ত্রিকের ও দেহতত্ত্ববাদী বাউলের রচনায় সূক্ষ্ম বা স্থূলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ বৌদ্ধ গান ও দোঁহা থেকে রামপ্রসাদ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উপধর্ম্মেরই আধিপত্য চলেছে এবং তারই অয়নকে কেন্দ্র করে সুসাহিত্য ও কুসাহিত্য দুইই গড়ে উঠেছে। এই বাঁধা রাস্তার মধ্যে এমন একটি অবিচ্ছিন্ন পারম্পরিকতা বিদ্যমান যে পুনরাবৃত্তি দোষে এবং উদ্ভাবনের অভাবে, এই সুদীর্ঘ ইতিহাস রীতিমতো ভারাক্রান্ত।)

শুধু ময়মনসিংহ গীতিকা যদি শূন্য পুরাণ ইত্যাদির সমসাময়িক হয়, তবে বিস্ময়ের সঙ্গে বলতে হবে যে এই আটঘাট বাঁধা orthodoxyর ভেতর কি করে অত বড় একটা ধর্ম্মসম্পর্কহীন লৌকিক পর্য্যায় গড়ে উঠলো! কিছুমাত্র পারমার্থিকতার ভাণ নেই—সম্পূর্ণ মানুষী সুখ-দুঃখ, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মুখোমুখি সম্বন্ধ, তার ভেতর বৈষ্ণবীয় রূপকের অবকাশ নেই, নেই মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর অনুগ্রহ-নিগ্রহ বিতরণের সুযোগ—বর্ণাশ্রমকে এমন নিশ্চিন্তে উপেক্ষা এবং হৃদয়বৃত্তিকে সমুদয় নীতি বা রীতির ওপর প্রাধান্য দেওয়া কি করে অত পুরাণো আমলে সম্ভব হল? আর ময়মনসিংহ-গীতিকার ভাষাও যথেষ্ট সহজ, স্নিগ্ধ এবং সংস্কৃত অলঙ্কারের নাগ-পাশমুক্ত, দেশীয় idiom-এ সমৃদ্ধ, বাংলার শুদ্ধান্তঃপুরে জাত ছড়াগুলির মতো স্বচ্ছন্দ, স্পষ্ট এবং সাবলীল। এও তার প্রাচীনতার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয়। পরবর্ত্তী মঙ্গলকাব্যগুলি—সে একেবারে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্তই—যে পরিমাণ আড়ষ্ট এবং আধ্যাত্মিকতার পুটপাকে শোধিত, উপধর্ম্মের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ, বারমাস্যা, দেবদেবীর কোঁদল,

পতিনিন্দা ও রূপবর্ণনার ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, তাতে ওদের রীতিমতো আধুনিক মনে হয়। কবিকঙ্কণে, ঘনরামে, কেতকা দাসে, ভারতচন্দ্রে আমরা মানুষের দেখা পাই না এমন নয়—মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার পার্থিব চেহারা দেখি না এমন নয়, কিন্তু তাদের সমস্ত সুখ-অসুখের পরিধিকে বেষ্টন করে যে দেবদেবীরা ভীড় করে আছেন, তাঁদের উপদ্রবেই ওদের মানবীয় শক্তি ও সম্ভাবনীয়তা পদে পদে বিড়ম্বিত হয়েছে এবং এক কে করে দিয়েছে অন্যের সঙ্গে অভিন্ন। অবশ্য কবিকঙ্কণে চিত্রাঙ্কণ এবং ভারতচন্দ্রে শব্দ-লীলার বিশেষত্ব আছে, কিন্তু সবশুদ্ধ জড়িয়ে বৈষ্ণব লিরিক এবং পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার তুলনায় বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি নিতান্তই অপরিণত।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এরই জের চলেছে—শ্যামাসঙ্গীত, সখীসংবাদ, পাঁচালী প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণবকাব্যের জারক রসে সঞ্জীবিত এবং একই মামুলি পদ্ধতির অনুধাবক। রামপ্রসাদ, দাশু রায়, কৃষ্ণকমল, কমলাকান্ত, হরু ঠাকুর, সবই এক দলভুক্ত। শুধু গোপাল উড়ে, কালী মির্জ্জা, রাম বসু বা নিধুবাবুতে মানুষের সামাজিক মনের ব্যথা-বেদনার ভাষা ভাঙা ভাঙা ভাবে শুনতে পাওয়া যায়, আর কিছু ভাব-সম্পদের পরিচয় পাওয়া যায় বাউলদের গানে। বাউল গানের তাত্ত্বিক উৎকর্ষ ও আঙ্গিক সৌষ্ঠব বহু তারিফ পেয়েছে বটে, কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকার মতো তার অনেকটুকুই রিপুকর্ম্মজাত বলে মনে করবার কারণ আছে।

বৈষ্ণবীয় সঙ্গীতশাখার পেছুনে পেছুনে শ্যামা সঙ্গীত, উমা সঙ্গীত, সখী সংবাদ, টপ্পা, বাউল, ভাটিয়াল, জারী, সারী, মুর্শিদা প্রভৃতি লোক-সঙ্গীত অব্যাহত বেগে জন্ম লাভ করেছে। এরা পরস্পরে মিশে প্রাচীন সাহিত্যের সাধারণ তালিকাভুক্ত হয়েছে, কিন্তু এদের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে আশানুরূপ মনোযোগ আজ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি।

বাংলা সাহিত্যের একখানি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইতিহাসের অভাবে, এই আনুমানিক এক হাজার বছরের কাব্য-সাহিত্য সমগ্র ভাবে সকলের পড়াও যেমন অসম্ভব হয়েছে, এদের মূল্য সম্বন্ধেও তেম্নি বহু ভ্রান্ত ধারণার অবসর ঘটেছে। বস্তুতঃ কাব্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ এবং তার পরিণতির মূল্য নির্ণয় করার উপযোগী সংক্ষিপ্ত কোন উপায় উদ্ভাবিত হওয়া প্রয়োজন। Orthodox ও Secular উভয় শাখার কাব্য-সাহিত্যের ধারা কি পারিপার্শ্বিকের ভেতর থেকে পুষ্টিলাভ করেছে এবং বর্ত্তমান সাহিত্যে তাদের আর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা, অথবা প্রাচীন সাহিত্য নিজস্ব ভাবেই শেষ হয়ে গেছে এবং যাকে আমরা আধুনিক সাহিত্য বলি, তার উৎপত্তি একেবারেই সাম্প্রতিক কি না, সে বিষয়ে অনেকেরই ধারণা নেই। হাস্যরসের নামে ভাঁড়ামি, আধ্যাত্মিকতার নামে ধর্ম্ম-কোলাহল, সৌন্দর্য্যসৃষ্টির নামে অলঙ্কার শাস্ত্রের বাঁধাবুলি আবৃত্তি ও ধার্ম্মিকতার আবরণে কুৎসিত ইন্দ্রিয়-সর্ব্বস্বতা নিয়ে যে সনাতন সাহিত্য, তার সঙ্গে প্রাক-চৈতন্য লিরিক, গীতিকা বা কৃষ্ণচন্দ্র যুগের লোক-সঙ্গীত পর্য্যায়ের তফাৎটা কোথায় তা বুঝতে হলে, হাজার-পাতা কুগ্রন্থ পাড়ি দিতে হয়। গন্ধমাদন-গোত্রীয় প্রাচীন সাহিত্যের ভালোমন্দ তাই নিবদ্ধ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের দপ্তরে, লোকের ঘরে ঘরে তার প্রচার হয়নি।

এর পর আসে আধুনিক কালের কথা। এই আমলের পায়োনিয়ার ঈশ্বর গুপ্ত, যাঁর অর্দ্ধেক তরজা, পাঁচালী, হাফ-আখড়াই এর যুগে সংস্থিত, বাকী অর্দ্ধেক নবতন উদ্ভাবনের পথে প্রবাহিত।) ঈশ্বর গুপ্তের হাসির কবিতা আজ বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে—মঙ্গলকাব্যের ঔদরিকতা ও কামুকতাই তার মূল উৎস, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তই বাংলা ভাষার প্রথম দেব-মাহাত্ম্যের স্থানে দেশ-মাহাত্ম্য আমদানি করেন—এটা ইংরেজী প্রভাব।

আর তেত্রিশ কোটির স্থানে বাক্য-মনের অগোচর অনাদি ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করেন, এটা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রভাব। এ ছাড়া 'প্রভাকর' পত্রিকার ভেতর দিয়ে তিনিই এদেশে সর্ব্বপ্রথম প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ ও সমালোচনা সুরু করেন। এই সব কারণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান অনেকটা ইংরেজী সাহিত্যে জনসনের স্থানের মতো। পরবর্ত্তীকালের নাট্যকার দীনবন্ধু, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র, ঐতিহাসিক কাব্য-রচয়িতা রঙ্গলাল, সকলেই প্রথম বয়সে ঈশ্বর গুপ্তের সাগরেদী করেছিলেন। বঙ্কিম, দীনবন্ধু, ও দ্বারকা অধিকারীর হাস্যকর 'কবিতা যুদ্ধ'ও হয়েছিল ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রভাকরে'ই। কবি হিসাবে এঁরা সবাই চলনসই, কিন্তু মাইকেল, নবীন সেন ও হেমচন্দ্র এই যুগের ছায়াতেই আবির্ভূত হন এবং ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন সাহিত্যের সমাধির ওপর যে খাদ কেটেছিলেন, এঁরা তারই ওপরে একটা মজবুত ইমারত গড়ে তুললেন—মালমশলা সবই এলো অবশ্য পাশ্চাত্য থেকে। মঙ্গলকাব্যের দেশে পৌরাণিক উপাখ্যানকেই এঁরা প্রাধান্য দিলেন বটে, কিন্তু তার অনুপ্রেরণা কবি-কঙ্কণ বা ভারতচন্দ্র থেকে না নিয়ে, এরা আদর্শ করলেন মিল্টন, বাইরণ ও স্কটকে। ফলে মাইকেলের কাব্যে পয়ার-ত্রিপদীর ক্লান্তিকর একঘেঁয়েমি দূর হয়ে গিয়ে, দেখা দিল বলিষ্ঠ প্রকাশ-ভঙ্গী সমন্বিত বৈদেশিক blank-verse এবং তাতে বাংলা যুক্তাক্ষরে ও যতি-স্থাপনে নূতন শক্তি প্রকট হল। এদিক থেকে মাইকেল ভাষার মুক্তিদাতা। কিন্তু তাঁর শক্তি প্রধানতঃ নিয়োজিত হয়েছিল কাব্য-ভাষার বহিরঙ্গিক গঠনেই, তাঁর প্রাণ-বস্তুকে তিনি সুগভীর রসানুভূতির স্পর্শ দিতে পারেন নি। হেমচন্দ্রের কাব্যে প্রতিভার চেয়ে অধ্যবসায়েরই পরিচয় পাওয়া যায় বেশী—নবীনচন্দ্রের মধ্যে কবির মেরুদণ্ড ছিল, কিন্তু ভাষা তাঁর হাতেও খুঁড়িয়ে চলেছে। মেঘনাদ বধের পাশে বৃত্রসংহার বা প্রভাস-

কুরুক্ষেত্র-রৈবতক কাব্য রাখলেই এটা অনায়াসে ধরা পড়ে। তবু এঁদের অধুনা অনাদৃত কাব্যগুলিই বাংলা লিরিকের পুনর্জন্মে সহায়তা করেছে। এঁরাই সাহিত্যে প্রথম দেশপ্রেমের প্রবর্ত্তন করেন এবং মানুষের সামাজিক দাবী-দাওয়াকে সাহিত্যের ভেতর দিয়ে স্বীকার করে নেন। প্রথমের নিদর্শন হল, পদ্মিনী উপাখ্যান, ভারত-সঙ্গীত, পলাশীর যুদ্ধ ইত্যাদি, আর দ্বিতীয়ের নিদর্শন হল মাইকেলের সনেট, হেমচন্দ্রের কবিতাবলী ও নবীনচন্দ্রের অবকাশ রঞ্জিনী। কাব্য হিসাবে এরা আজ খুব বেশী সচল নয়, কিন্তু পরবর্ত্তী কাব্যাদর্শের বীজ হিসাবে এরা অনস্বীকার্য্য। এঁদের ধারা অনুসরণ করে কিছুদিন দেশে উপাখ্যান ও খণ্ডকাব্য রচনা চলেছিল—তা নূতন কাব্যাদর্শের স্থচনা করে না, করে মাইকেলী কাব্যাদর্শেরই মৃত্যু ঘোষণা। আনন্দ মিত্রের 'হেলেনা কাব্য', বলদেব পালিতের 'কর্ণার্জ্জুন কাব্য', হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরীর 'দশানন বধ' মেঘনাদ বধ ও বৃত্র-সংহারেরই অক্ষম অনুকরণ। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'জন্মভূমি' সঙ্গীত বা দীনেশচরণ বসুর 'বাজরে বীণা' ত হেমচন্দ্রেরই হুবহু নকল। শুধু ঈশান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগেশ' কাব্যটিতে একটু নূতনত্ব দেখা যায়। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিষয় ছেড়ে, তিনি ষোল-আনা মানবিক কাহিনী নিয়ে কাব্য লিখেছিলেন—প্রাচীন বিদ্যাসুন্দরে অবশ্য এর নজীর থাকলেও, তাতে কালী মা'র আবির্ভাব বাদ যায়নি—ঈশানচন্দ্র বোধ হয় টেনিসনের 'এনক আর্ডেন' জাতীয় কোন ইংরেজী কাব্যের আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। বৈচিত্র্যের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য বলেই এর নাম করা, নচেৎ কাব্যত্ব এতেও খুব বেশী নেই।

তারপরের যুগ বর্ত্তমান যুগ। মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত আসতে, মধ্যে বিহারীলাল, সুরেন্দ্র মজুমদার প্রভৃতিকে নিয়ে যে সংক্ষিপ্ত সময়টা, তাকে আর একটা স্বতন্ত্র যুগ বলা যায় না—ওটা রবীন্দ্র-যুগেরই

প্রস্তাবনা, যেমন্ রবীন্দ্রনাথ থেকে আমাদের সময়টা হচ্ছে রবীন্দ্র যুগেরই পটভূমি। মাইকেলেই আমরা প্রাচীন ঐতিহ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ বিলোপ এবং নবতন ভাবাদর্শের আবির্ভাব দেখেছি, এই আদর্শের আলোকেই হঠাৎ লিরিকের পথ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বাংলা কাব্যে প্রকৃতি এতদিন ছিল একটা নিস্প্রাণ বাইরের বস্তু, তার শোভা সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কাব্যে স্বীকৃতি পেয়েছে, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে কবির অন্তরাত্মার কোন প্রাণবন্ত অনুভূতির যোগ ছিল না—বিহারীলালই প্রথম জড়, জীব ও চৈতন্যের মধ্যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে গাঁথা একটি রহস্যময় যোগ-সূত্র স্থাপন করলেন। এখানেই প্রথম স্বগত লিরিক কাব্যের ভিত্তি স্থাপিত হল। কবির ব্যক্তিগত ভাবসত্তাকে রূপায়িত করবার সূচনা করে বিহারীলালই বাংলা কাব্যকে একটি নবতন পথের নির্দ্দেশ দিলেন। সুরেন্দ্র মজুমদার এই সঙ্গে আর একটা পথ খুলে দিলেন—তিনি বস্তুসম্পর্কহীন নিরবলম্ব রসাদর্শ পরিহার করে বাস্তব পন্থার অনুসরণ করলেন। বাস্তবের সংসারকেই তিনি ভাবব্যঞ্জনার সম্পাতে অতিবাস্তব করে তুললেন। বিহারীলালের 'সারদা মঙ্গল' এবং সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা' আর মুষ্টিমেয় কয়েকটি রচনা, যেমন গোবিন্দ রায়ের 'যমুনালহরী' বা দ্বিজেন্দ্র ঠাকুরের 'স্বপ্ন-প্রয়াণ', ধীরে ধীরে বাংলা কাব্যকে মাইকেলী যুগের বহিরঙ্গিকতা থেকে রবীন্দ্র-যুগের অন্তর্মুখিতার দিকে এগিয়ে দিলে। মাইকেল দিয়েই ইংরাজী প্রভাব বাংলায় এসেছিল—সে প্রভাব ইংরেজী narrative কাব্যের। মাইকেলের 'আত্মবিলাপ' বা হেমচন্দ্রের 'যমুনা তটে' প্রভৃতি কবিতায় লিরিকের ছায়া আছে, কিন্তু অস্পষ্ট। এতদিনে সত্যিকার ইংরেজী আদর্শের লিরিক বাংলা কাব্যে আত্মপ্রতিষ্ঠ হল—এইখানেই বাংলা সনাতন সাহিত্যিক ঐতিহ্যের উচ্ছেদ এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রাণ-রস-পুষ্ট নূতন সাহিত্যাদর্শের বিকাশ।

(অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাংলা কাব্যের যে পরিণতি, তা স্বভাবতঃই প্রত্যাশিত নয়। ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বর গুপ্ত স্বাভাবিক—ঈশ্বর গুপ্ত থেকে মাইকেল কতকটা অভাবনীয়, কিন্তু মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা অলৌকিক।) প্রচলিত সাহিত্য-ধারার সজাগ অনুসরণে, এমন কি অপরিমিত গঠনশক্তি প্রয়োগেও বাংলা কাব্যের দেহে ও প্রাণে এই পূর্ণতা সাধন, অন্য যে-কোন কবির শক্তির বাইরে ছিল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথে দেশীয় ঐতিহ্যের সবিশেষ প্রভাব আছে—তাঁর গানে বাংলা বৈষ্ণব ও বাউল গানের ছায়া আছে, কান্তা প্রেমের কবিতায় ও গানে মধ্যযুগীয় মিষ্টিকদের প্রতিধ্বনি আছে, শব্দালঙ্কারময় স্বভাবোক্তির কবিতায় ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃতের অনুরণন আছে, পারমার্থিক কবিতায় উপনিষদের প্রবর্ত্তনা আছে। কিন্তু সব চেয়ে যেটা বড় কথা, (রবীন্দ্র-কাব্যে প্রকৃতির সঙ্গে হৃদয়-সম্পর্কের যে লীলা, তা কবি দেশীয় ঐতিহ্য থেকে পান নি—পেয়েছেন শেলীর কাব্য থেকে।) যে Creative-Evolution তাঁর জগৎ, জীবন ও প্রেম সম্বন্ধীয় কবিতার অনন্য অবলম্বন, তাও তিনি পেয়েছেন পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং দর্শন থেকে।) তাঁর গাথা-কবিতা এবং বর্ণনাত্মক কবিতায় টেনিসনের প্রভাবও দেখা যায়। অবশ্য রবীন্দ্র-কাব্য প্রসঙ্গে প্রভাবের কথা অবান্তর—নানা দিক-দেশের নানা ধারা তাঁর মধ্যে দিয়ে মূর্ত্ত হলেও সব কিছুর সমবায়ে তাঁতে এমন একটি সমগ্রতা গড়ে উঠেছে, যা একান্ত ভাবেই তাঁর। শুধু ক্ষোভ থেকে যায় যে, রবীন্দ্রনাথের লিরিক বড় বেশী নৈর্ব্যক্তিক, ব্রাউনিঙের বা শেলীর তীব্র আত্মকেন্দ্রিকতা তাতে নেই। তিনি একান্তভাবে impersonal বলেই, তাঁর কাব্যে নিরুপাধিক ভাব-ব্যঞ্জনা এবং বৃত্তি-নিরপেক্ষ শব্দ-সংযোজনার চাতুর্য্য এত বেশী। পারিভাষিক অর্থে যাকে বলে values বা শ্রেয়গুণ

তা রবীন্দ্র কাব্যে একটু কম, কারণ যে রূপ-জগৎ তাঁর কাব্যের অবলম্বন, তা কল্পিত কাঠামোর ওপর সংস্থিত এবং তার পরিমণ্ডলও তাই অপ্রাকৃত।\\ কিন্তু এই মৌলিক ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর অপরূপ শব্দ-লীলা এবং অপরিমেয় ভাবাবেগ পাঠককে বিপুল বেগে টেনে নিয়ে যায়—যদিও সে আকর্ষণের গতি নিরুদ্দেশের অভিমুখে।

(রবীন্দ্র সমসাময়িকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবির অভাব ছিল না, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর কবিও কেউ ছিলেন না। গোবিন্দ দাসে তীব্র ভাবাবেগ আছে, বল্গাহীন অসঙ্কোচে অন্তরকে উজাড় করে দেবার প্রয়াস আছে, কিন্তু মাত্রা নেই। অক্ষয় বড়ালে ভাবের ঐশ্বর্য্য ও ভাষার কারু-কার্য্য আছে, কিন্তু অনুভূতির তীক্ষ্ণতা নেই। দেবেন্দ্রনাথ সেনে বিহ্বলতা আছে, কিন্তু বাঁধুনির অভাবে তাঁর অধিকাংশ কবিতাই বিপর্য্যস্ত, এলোমেলো এবং অলীক। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতা অবশ্যই অদ্ভুত, কিন্তু রসাত্মক কবিতায় তাঁর নৈপুণ্য কম। নূতন ছন্দ-প্রবর্ত্তনের মোহে তিনি শুধু ছন্দের ক্রম-ভঙ্গই ঘটান নি, বক্তব্য বিষয়ের শৃঙ্খলা এবং পারম্পর্য্যকেও পদে পদে আঘাত করেছেন। রজনীকান্তের ভক্তিমূলক গানে নিষ্ঠা, শুচিতা এবং আকুলতা আছে, কিন্তু সাহিত্যিক উপাদান বেশী আছে কিনা সন্দেহ। ভালো হক, মন্দ হক, যে কোন রকম নিজস্বতার দাবী এঁদের পর আর কেউই করতে পারেন না। এর পর থেকে রবীন্দ্র-ধারার অনুসরণই বাংলা কাব্যের একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। এক নিশ্বাসে নাম করে যাওয়া যায়—রমণীমোহন ঘোষ, জগদিন্দ্র রায়, প্রমথ রায় চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাশ, এঁরা সবাই রবীন্দ্রাদর্শের অনুগামী। মহিলাদের মধ্যে মানকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী এবং কামিনী রায় অবশ্যই স্বাতন্ত্র্যের জন্যে উল্লেখযোগ্য, কিন্তু এঁরা বা কায়কোবাদ, গোলাম হোসেন প্রমুখ মুসলমান কবিরা স্মরণ করে রাখবার মতো কবিতা বিশেষ কিছুই

লিখতে পারেন নি। রবীন্দ্রানুসরণ দিনের পর দিন এমনভাবে চলতে আরম্ভ হয় যে রবীন্দ্রনাথের শব্দ-যোজনা, ছন্দ-রীতি, বিষয়-বিন্যাস, তাদের সার্থকতা হারিয়ে কালক্রমে প্রসিদ্ধিতে দাঁড়ায় এবং কবিরা অজ্ঞাতসারেই তার অনুসরণ করতে থাকেন। তার ফলে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা থেকে কবির ব্যক্তি-স্বরূপই গেল অন্তর্হিত হয়ে এবং অসার শব্দ-লীলাই হয়ে দাঁড়ালো কাব্যসৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য।

এরপরে সুরু হল প্রতিক্রিয়া। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছন্দোবৈচিত্র্যে, কালিদাস রায় ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গী প্রবর্ত্তনে, যতীন্দ্রমোহন বাগচী গার্হস্থ্য পরিবেশ চিত্রণে, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপ্নরূপায়নে, কুমুদরঞ্জন পল্লীগীতিকায় রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে আসতে সচেষ্ট হলেন। ভাষার ওপর রয়ে গেল তাঁর প্রভাব, কিন্তু কাব্যের দৃষ্টি-ভঙ্গী নূতন পথ খুঁজতে লাগলো। বলা বাহুল্য, এঁরা এক্সপেরিমেণ্ট করছিলেন—কাজেই সম্পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি এঁদের হাত দিয়ে খুব বেশী হল না, তবে এঁদের কাব্য থেকেই দেশ বুঝলো যে কাব্য-ধারাকে নূতন খাতে বহানো প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের অনুভূতি স্পষ্টতর রূপ নিলো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম ও মোহিতলাল মজুমদারে। মোহিতলালের অনেক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সুর ঢাকা পড়েনি ঠিকই, কিন্তু দৃষ্টির দিক থেকে এঁরা অ-রাবীন্দ্রিক। মোহিতলালের বলিষ্ঠ ভোগাত্মবাদ বা কাজির রাষ্ট্র ও সমাজ-মুখী বিদ্রোহ রবীন্দ্রনাথের অরূপ রস লোক থেকে অনেক দূরে। কাজির ইসলামী শব্দ-প্রয়োগ ও মোহিতলালের সংস্কৃত-ঘেঁষা বাচন-পদ্ধতিও তাঁদের নিজস্ব। যতীন্দ্রনাথের ভাষার কর্কশতা ও বক্তব্যের স্পষ্টতা এত বেশী নিজস্ব যে সুললিত কাব্য-ভাষায় অভ্যস্ত পাঠক তাতে পদে পদে হোঁচট খায়—ভাবাবেগের তীব্রতা অপেক্ষা যুক্তি-শৃঙ্খলার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেই তাঁর কবিতা খাঁটি জাতের লিরিক কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন তোলে। কিন্তু একথা বুঝতে বিলম্ব হয় না

যে কবি অসীম শক্তিমান। এঁদের সঙ্গে শুধু আর একজন কবির নাম করবো—কিরণধন চট্টোপাধ্যায়। এই রস-বিপ্লবের ভাঙা গড়ার ভেতরই তিনি চমৎকার একটি আড়াল রচনা করে নিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁর মিষ্টি ঘরোয়া সুরটি হয়ত অনেকেরই কাণে পৌছায় নি, কিন্তু তিনি সত্যিকার লিরিক কবি ছিলেন।

(এখানে থামতে পারলেই ভালো হয়, কারণ এর পর বাংলা কাব্যের যে ইতিহাস, তার সঙ্গে বর্ত্তমান লেখকেরও কিছু সংস্রব আছে। সমদলীয়দের মধ্যে স্বভাবতঃই যে অসুস্থ প্রতিযোগিতার বা অহেতুক আনুরক্তির ভাব থাকে, তার ফলে বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধি হয়ত আচ্ছন্নই হয়ে থাকে। কাজেই আধুনিকতম যুগের কোন কবির নাম করবো না। তবে একথা অসঙ্কোচেই বলবো যে আধুনিক কাব্য এখনো একটা বিশিষ্ট স্বতন্ত্র চেহারা ধরে নি, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, তার অধিকাংশই অতি-আধুনিক ইংরেজ ও মার্কিণ কবিতার ছায়ানুগামী)। এদের কতক মনস্তত্ত্বের কুয়াসায় আচ্ছন্ন,কতক অর্থহীন শব্দ-সংঘাতে মুখর। আবার বলিষ্ঠ সুস্থ প্রাণবন্ত রচনাও আছে কতক। বলা বাহুল্য আঙ্গিকের ওপর এখনো রবীন্দ্র-প্রভাবই রয়েছে অনেকটুকু, কিন্তু দৃষ্টি-ভঙ্গী গেছে আমূল পরিবর্ত্তিত হয়ে। রবীন্দ্র-কাব্যের রসাত্মকতা আধুনিক কালে পরিহারের চেষ্টা হয়েছে। এই চেষ্টার গতি বাস্তবকে কাব্যের উপাদান স্বরূপ নেবার অভিমুখে। তাই যা সুন্দর নয়, বরং বিধিমতো অসুন্দর এবং ঐতিহ্যের পরিপন্থী, এমন জিনিসও আজ কাব্যের মধ্যে দেখা দিয়েছে। সেই সঙ্গে ব্যঞ্জনামুখিতার চেয়ে স্পষ্টতার দিকেই পড়েছে বেশীর ভাগ নজর—তাতে কাব্যে রসসৃষ্টি অপেক্ষা প্রপাগ্যাণ্ডারই রূপ হয়েছে অধিকতর প্রকট। আবার কোন কোন কবির রচনায় ছন্দ এবং অর্থসঙ্গতির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। তাঁরা বলছেন, মনে

স্বভাবতঃই যে কথাটি যে ভাবে উদয় হয়, সেটাকে ঠিক সেই ভাবে রূপ দিতে হলে অর্থের দিকে নজর রাখা অসম্ভব, কারণ অবচেতন মনে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যে সমস্ত চিন্তা থাকে, তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বা পারম্পর্য্য বলে নাকি কোন জিনিষ নেই। সেই বিশৃঙ্খল চিন্তাপুঞ্জকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও ছন্দযুক্ত করে যখন কবিতায় রূপ দেওয়া হয়, তখন মনের আসল কথাটি যায় চাপা পড়ে—তার স্থানে মাথা তুলে ওঠে একটা কৃত্রিম জিনিস। সুতরাং সত্যিকার কবিতা যা হবে, তাতে ছন্দ বা অর্থ থাকা শুধু অসঙ্গতই নয়, অসম্ভব। এই আদর্শে যে কবিতা লেখা হচ্ছে, তার প্রসার এখনো নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, তার ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত। মোটের ওপর আধুনিক বাংলার কাব্য-প্রচেষ্টা এইভাবে বিভিন্ন ধারায় আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছে। একটা সুনিয়ন্ত্রিত পরিণতিতে এসে দাঁড়াতে না পারা পর্য্যন্ত তার হিসাব-নিকাশ হওয়া কঠিন, তবে একথা ঠিক যে আধুনিক বাংলা কাব্যে বৈচিত্র্য এসেছে প্রচুর এবং সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধেও আশা রাখা যায় ঢের।

পরকীয় অনুকরণের ভেতর দিয়ে যে নূতন কাব্যাদর্শ আনবার আয়োজন চলেছে দেশে, সেটা স্বকীয় জীবন-ধারার মধ্য দিয়ে সহজ অনুপ্রেরণায় স্ফূর্ত্ত হলে, সত্যিকার কাব্য অবশ্যই জন্মাবে। বৈদেশিক প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের মতামত যত উগ্রই হক, মধুসূদন-বঙ্কিম থেকে একেবারে আজ পর্য্যন্ত—আধুনিক সাহিত্য বলতে বাংলায় যে সাহিত্যকে বোঝায়, তার সবটুকুই দাঁড়িয়ে আছে বৈদেশিক ভাব-ভূমির ওপর। প্রাচীন সাহিত্য, মানে বৌদ্ধ দোঁহা থেকে কবিওয়ালাদের গান পর্য্যন্ত, একান্তভাবেই আত্ম-স্বতন্ত্র-তার ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘকাল বয়ে এসে হিন্দু কলেজের প্রাঙ্গণে নিঃশেষে ছিন্ন হয়ে গেছে। তারপর থেকে যে সাহিত্যের উদ্ভব ও প্রসার হয়েছে, তা দেশীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য থেকে

বিশেষ কিছুই ধার করে নি, বিষয়বস্তু ছাড়া। তার টেকনিক, তার বাচনরীতি, উপমা, অলঙ্করণ, সবই প্রধানতঃ পাশ্চাত্য প্রভাব সঞ্জাত। রবীন্দ্র-সাহিত্যে দেশীয় সাহিত্যের যে রেশ পাওয়া যায়, তাও রবিরশ্মি-সম্পাতে নবরূপে রূপান্তরিত। (অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই বৈদেশিক আদর্শ অনুসরণেরই চরম পরিণতি দেখা যায়। কিন্তু আধুনিক কাব্যের বিরুদ্ধে যে মাঝে মাঝে অভিযোগ ওঠে, তার কারণ এই যে, এতে পাশ্চাত্য টেকনিকই শুধু অনুসৃত হয় নি, যে বিষয়বস্তু আমাদের জীবনের সঙ্গে সংস্রবরহিত, সুতরাং অসত্য, অথচ পাশ্চাত্যের পক্ষে সত্য, তাকেও কাব্যের গণ্ডীতে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এতে আধুনিক বাংলা কাব্য আধুনিক ইংরাজী বা এমেরিকান কাব্যের প্রতিধ্বনি হয়ে দাঁড়িয়েছে, দেশের প্রাণ-শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে জাতীয় সাহিত্য হতে পারছে না, যা পেরেছে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র প্রমুখ পূর্ব্বাচার্য্যের হাতে।) (অর্থাৎ অনুকরণ যখন জীবনের প্রয়োজনে জন্মায়, তখন তা জীবনকে সমৃদ্ধই করে, আর যখন তার জন্ম হয় শুধু ফ্যাসনের জন্যে, তখন তা হয় নিষ্ফল শক্তিক্ষয়। এই ফ্যাসনসম্ভূত এক শ্রেণীর বাংলা কবিতার ভাষাই বাঙালী পাঠক বোঝে কিনা সন্দেহ। তা যেন ইংরেজীর না-বোঝা অনুবাদ!

সৌভাগ্যের বিষয় আধুনিককালে সত্যিকার শক্তিমান কবিও কয়েকজন আছেন, যাঁরা একাগ্র নিষ্ঠায় বাংলা কবিতাকে যুগসন্ধির এই ঘূর্ণাবর্ত্তের ভেতর দিয়ে নিরাপদে একটি নিরূপিত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে চলেছেন। তাঁদের গৌরবোজ্জ্বল সাফল্যের ইতিহাস লিখতে হয়ত আমরা থাকবো না, কিন্তু আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো তাঁদের সাধনার ওপর।

[২] বাংলা গদ্য সাহিত্য

বৌদ্ধ গান ও দোঁহার আমল থেকে কবিওয়ালাদের যুগ পর্য্যন্ত এই আট-ন-শো বৎসর ধরে বাংলা সাহিত্যে একটানা পদ্যেরই একাধিপত্য চলে এসেছে। চিঠিপত্রে এবং বৈষয়িক কাজ-কর্ম্মে একটা গদ্যের চল অবশ্যই ছিল, কিন্তু সাহিত্যের আসরে তার প্রবেশাধিকার ছিল না। এই গদ্য জন্মালো ইংরেজ আমলে। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনে গদ্য লেখানোর সূত্রপাত করেন। তাঁরাই প্রথম বাংলা ছাপাখানা বসান, সংবাদপত্র প্রকাশ করেন, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করেন এবং দেশীয় পণ্ডিতদের দিয়ে ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু বই রচনা করান। খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার বেশী দূর এগুলো না, কিন্তু দেশীয় সংস্কৃতি এই প্রচেষ্টা থেকে আপনার মুক্তির পথ খুঁজে পেলো। মাত্র এক-শো বৎসরেই বাংলা গদ্য যে আজকের এই উন্নত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, একথা ভাবাই কঠিন। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান—মানব-সংস্কৃতির যে কোন শাখাই আজ বাংলা ভাষায় চূড়ান্ত ভাবে আলোচিত হতে পারে। পৃথিবীর কোন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যই এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করেছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই ইতিহাসের সূচনা কয়েকজন বিদেশী পাদ্রীর হাতে। অবশ্য এদেশের পণ্ডিতেরাই পাদ্রীদের সহযোগী ছিলেন, কিন্তু প্রেরণা সঞ্চারের মহৎ ব্রত পাদ্রীরা না নিলে, পণ্ডিতেরা কি করতেন? পণ্ডিতসমাজে বাংলা ভাষার সম্মান ছিল না, তাঁরা মাতৃভাষাকে অনার্য্য ভাষা ভাবতেন, তাঁদের সশ্রদ্ধ অনুরাগ ছিল সংস্কৃতের ওপর, অথচ সংস্কৃতও তাঁরা খুব বেশী জানতেন না। কাজেই মুসলমান আমলের

শেষাশেষি এবং ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে না সংস্কৃত না বাংলা, দেশে কোন ভাষারই বিশেষ চর্চ্চা ছিল না। এই দেশব্যাপী নিরক্ষরতা ও নিশ্চেষ্টতাকে আঘাত করে পাদ্রীরা বাঙালী জাতির মানসিক উৎকর্ষ সাধনে বদ্ধপরিকর হলেন, এ তাঁদের অসামান্য কৃতিত্ব।

মিশনারী যুগে কষ্টে সৃষ্টে বক্তব্য বিষয়কে যখন পাঠকের গোচরীভূত করাই ছিল একান্ত দুরূহ, তখন যাঁরা গদ্য রচনা করেছেন, যেমন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, রাজীবলোচন, ভবানীচরণ, কেরী ইত্যাদি—ইতিহাসের দিক থেকে তাঁদের সবিশেষ স্বীকৃতির দাবী আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাষা তখনো এমন ভাবে গড়ে ওঠে নি, প্রকাশ-ভঙ্গীতে তখনো এমন স্বচ্ছতা আসে নি, যাতে সেই সমস্ত রচনার নিদর্শন সাহিত্যের নিত্যকার ভোজে পরিবেষণ করা যেতে পারে। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত', রাজীবলোচনের 'কৃষ্ণচন্দ্রচরিত', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'পুরুষপরীক্ষা' ও 'বত্রিশ সিংহাসন', কেরীর 'কথোপকথন', ইমানুয়েল লাসুঁপসার ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা···আজ ধৈর্য্য ধরে পড়া প্রায় অসম্ভব। মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতের সংস্কৃত-ঘেঁষা বাক্যবিন্যাস এবং রামরাম বসুর উৎকট ক্রিয়াপদ প্রয়োগ রামমোহন রায় ও ঈশ্বর গুপ্তে এসে একটু শান্ত চেহারা ধরেছিল। কিন্তু সে একটুই। রামমোহনের বৈদান্তিক বাংলা বা গুপ্ত-কবির অনুপ্রাস-কণ্টকিত কুশ্রী বাংলাও সমান অপথ্য। (এক ধারে যেমন পণ্ডিতী বাংলার এই ধারাটা বয়ে এসেছে, এরি পাশাপাশি তেমি আর একটা ঘরোয়া বাংলাও ধীরে ধীরে দেখা দিয়েছে। পণ্ডিতী বাংলার সত্যিকার উৎকর্ষ হল বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, দেবেন্দ্র ঠাকুর ইত্যাদির হাতে—আর ঘরোয়া বাংলার সত্যিকার বিকাশ হল টেকচাঁদ, হুতোম, নাটুকে রামনারায়ণ প্রভৃতির হাতে। এই দুই ধারা সমান্তরালভাবে অনেক দিন

পাশাপাশি বয়ে এসেছে, কেউ কারুকে স্পর্শ না করে। বঙ্কিম পর্যান্ত এই চলেছে।

বিদ্যাসাগরী বাংলায় আর হুতোমী বাংলায় তফাৎটা সেদিন ছিল বামুণ-শূদ্রের তফাতের মতো। স্বয়ং কালী সিংহই বোধ হয় এ তফাৎ স্বীকার করতেন, তাই তিনি যখন সাহিত্য স্থষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে মহাভারতের অনুবাদ করেছেন, তখন বিদ্যাসাগরী বাংলারই অনুসরণ করেছেন। হুতোমটা তিনি লিখেছিলেন তাঁর সমসাময়িকদের নিয়ে একটু মস্কর্য়া করার অভিপ্রায়ে। ওটা দেশের লোক seriously নেয় নি, তিনি নিজেও নিয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু বিদ্যাসাগরী বাংলার পাশে হুতোমী বাংলা কত উজ্জ্বল! বাংলা ভাষার নিজস্ব ধরণ, তার idiom এবং দেশজ শব্দ হুতোমী বাংলাকে এমন একটি স্বচ্ছন্দতা দিয়েছে, যা আজো তাকে পুরানো হতে দেয় নি। অবশ্য বিদ্যাসাগরী বাংলায় শব্দ-ঝঙ্কারের মনোহারিতা আছে, সংস্কৃত idiom-এর অনুরূপ করে বাংলা idiom তৈরী করে নেবার প্রয়াস আছে, কিন্তু বাংলা ভাষার 'জান' বিদ্যাসাগর ধরতে পারেন নি। তাই তাঁর সমস্ত রচনাদর্শ দাঁড়িয়েছিল একটা কৃত্রিম ষ্টাইলের ওপর—তাঁর রচনা যথেষ্ট অলঙ্কারাঢ্য, কিন্তু নিষ্প্রাণ। যেখানে সত্যিকার প্রাণের তাগিদ এসেছে, সেখানে সংস্কৃতের নাগপাশ এড়িয়ে বিদ্যাসাগরের বাংলাও যে যথেষ্ট বেগবান হয়ে উঠতে পারে, 'বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব'ই তার উদাহরণ। বিদ্যাসাগরের 'কথামালা'ও এই কৃত্রিমতা থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের খ্যাতি এ রচনাগুলোর জন্যে নয়। দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী' বা অক্ষয় দত্তের 'উপাসক সম্প্রদায়ে'র রচনা-রীতি 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা' বা 'ভ্রান্তি বিলাসের' চেয়ে ঢের বেশী ঝরঝরে, একথা নিরপেক্ষ সমালোচক অবশ্যই স্বীকার করবেন। কিন্তু এঁদেরই হক বা এঁদের পরবর্ত্তী অমিত

শক্তিমান বঙ্কিমেরই হক, রচনা-নীতি হুতোমের তুলনায় রীতিমতো খোঁড়া। এঁরা সকলেই বোধহয় বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতাকে সাহিত্যের পৃষ্ঠায় স্বীকার করে নেওয়া ভাষাগত কৌলীন্যের পরিপন্থী বলে মনে করেছিলেন। নইলে 'মুচিরাম গুড়ে' বঙ্কিম বা 'সেকাল-একালে' রাজনারায়ণ বসু যে অনায়াস স্বচ্ছন্দতার পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁদের বিখ্যাত রচনাবলীর মধ্যে এমন ভাবে উপেক্ষিত হল কেন? যে ভাষা স্বভাবতঃই প্রাণ থেকে উৎসারিত হয়, তাতেই প্রাণের নিবিড়তম কথাটি অকপটে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু বঙ্কিম পর্য্যন্ত বাংলা গদ্যে একটা তৈরী করা ষ্টাইল চলেছে বলেই সে ষ্টাইল প্রবহমান সাহিত্য-ধারায় স্থায়ী আসন লাভ করতে পারে নি। তবু বঙ্কিমই পণ্ডিতী বাংলা এবং ঘরোয়া বাংলার মধ্যে একটা মিতালী ঘটিয়ে দিয়ে যান, যদিও তাঁর ঝোঁকটা ছিল বিশেষ করে পণ্ডিতী বাংলার দিকেই। বিদ্যাসাগরী বাংলা ও বঙ্কিমী বাংলায় একটা তফাৎ চোখে পড়ে। বিদ্যাসাগরের রচনাশৈলী সংস্কৃতানুগ, আর বঙ্কিমের শৈলী ইংরেজীর অনুগামী। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বঙ্কিমের যে ষ্টাইলটি দেখা যায়, সেটি তাঁর পরিণত ভঙ্গী, কিন্তু তাঁর 'দুর্গেশ-নন্দিনী'র ভাষা আজ আর গলাধঃকরণ করা যায় না। তা অধিকাংশ স্থলেই যেন ইংরেজীর অক্ষম অনুবাদ।

বঙ্কিমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক মূল্য প্রায় কিছুই নয়। তিনি ও তাঁর পরিমণ্ডলের দ্বারাই সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হল। এঁদের মধ্যে চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ইত্যাদির খ্যাতি এক সময় অসংযত অত্যুক্তির হাটে চড়া দামে বিকিয়েছে। এঁরা সকলেই সুলেখক সন্দেহ নেই, কিন্তু সাহিত্যের ধারণা-শক্তি ও প্রকাশ-ভঙ্গী ক্রমপরিণতির স্রোতে আজ এতটা এগিয়ে এসেছে যে আজকের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে এঁদের লেখা বড়ই নিষ্প্রভ

মনে হয়। আগেই বলেছি, ভাষা থেকে তখনো জড়তার জড় মরেনি, তার ওপর খেলো ভাবোচ্ছ্বাসকে তখনো লোকে উচ্চাঙ্গের কবিত্ব বলে মনে করতো, ধর্ম্মের দোহাই দেশের দোহাই দেওয়াকে মনে করতো মহত্ত্বের লক্ষণ বলে, আর সুদীর্ঘ সমাস-সন্ধি-কণ্টকিত যৌগিক বাক্যবিন্যাস বিড়ম্বিত রচনারীতিকে মনে করতো সাহিত্য-শৈলীর উৎকর্ষ বলে—কাজেই এই সমস্ত স্বাভাবিক অসুবিধার ভেতর দিয়ে বাংলা গদ্য তখনো পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে নি। চন্দ্রশেখরের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম', কালীপ্রসন্নের 'নিভৃত চিন্তা', 'নিশীথ চিন্তা', চন্দ্রনাথের 'ত্রিধারা' বা অক্ষয়চন্দ্রের 'পিতাপুত্র' আমাদের ছাত্র বয়সে কার্লাইল, রাস্কিন, এমার্সন, মেকলে প্রভৃতির সঙ্গে এক পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে পঠিত হয়েছে। কিন্তু আজ এই সব বহুবিখ্যাত বই পড়তে গেলে ছত্রে-ছত্রে এমন হোঁচট খেতে হয় কেন? এর একটা কারণ এঁদের ভাষার আড়ষ্টতা, শব্দ-যোজনার অক্ষমতা ও বাক্য নির্ম্মাণের কৃত্রিমতা, কিন্তু আসল কারণ প্রতিপাদ্য বস্তুর অকিঞ্চিৎকরতা। চন্দ্রনাথের 'একটী পাখী' বা 'পল্লীবাসের সুখ-দুঃখ', চন্দ্রশেখরের 'শ্মশান', কালীপ্রসন্নের 'ঐহিক অমরতা', অক্ষয়চন্দ্রের 'হেমচন্দ্র', সেদিন দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার চোখে অনুরাগের বান ডাকিয়েছে, কিন্তু আজকের কিশোর ছাত্রও কি এই শ্রেণীর প্রবন্ধ লেখে না? অবশ্য তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের দানও অনস্বীকার্য্য, ঈশ্বর গুপ্ত ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাংলায় সাহিত্য-সমালোচনার সুরু হয়েছিল—রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব, স্বয়ং বঙ্কিম এবং এঁরা তাকে একটা বিশিষ্টতা দেন, তাছাড়া ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মতত্ত্বকেও এঁরাই প্রথম সাহিত্য-জগতে পাঙ্‌ক্তেয় করে তোলেন—সে দিক থেকে এঁরা অনন্যকর্ম্মা, কিন্তু স্থায়ী সাহিত্যের উপকরণ এঁদের রচনায় এতই কম যে আজকের সমালোচককে এই

বহুপ্রচারিত সাহিত্যারণ্য থেকে সরস, সহজ এবং স্বচ্ছ একটি দুটি নিদর্শন খুঁজে বের করতে কি পরিমাণ আয়াস স্বীকার করতে হয়, তা ভুক্তভোগী ভিন্ন কারুরই বোঝার সম্ভাবনা নেই। দূর থেকে শ্রুতিগত শ্রদ্ধায় নিশ্চিন্ত হয়ে দিন কাটানোর সৌভাগ্য যার হয় না, সে অভাজন সন্দেহ নেই, কিন্তু এরকম অভাজনের সংখ্যাও দেশে বেশী নয় বলেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আজো লেখা হয় নি।

এরপর রবীন্দ্র-যুগ। বাংলা গদ্যের শৈশব ও বাল্য-কৈশোরের চড়াই অতিক্রম করে, আমরা তার পূর্ণ যৌবনের অজস্রতার মধ্যে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। এখন থেকে যা আমাদের সাহিত্য, তার একটা মাপকাঠি নির্ণয় সম্ভব। কারণ এর পর থেকে অতি চলনসই লেখকের লেখাও একটা নির্দ্দিষ্ট স্তরের নীচেয় নামে না। চিন্তায়, দৃষ্টিতে, প্রকাশে, বাংলা গদ্য রবীন্দ্রযুগে একটা বিশিষ্ট স্বাভাবিক রূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের একাত্ম প্রভাবে বাংলা গদ্যসাহিত্য দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে দিনে দিনে যে বিচিত্র সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, তাকেই আমরা প্রধানতঃ বাংলা গদ্যসাহিত্য বলে থাকি। অক্ষয় মৈত্রের বা রাখালদাসের ইতিহাস, রামেন্দ্রসুন্দর, জগদীশচন্দ্র বা জগদানন্দের বিজ্ঞান, স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম্ম ব্যাখ্যান, প্রিয়নাথ বা বলেন্দ্রনাথের রসবিচার, জলধর সেনের ভ্রমণ, দীনেন্দ্রকুমারের পল্লীচিত্র, দীনেশচন্দ্রের সাহিত্য বিশ্লেষণ, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস, এমন কি দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রবি-রশ্মি সম্পাতে সঞ্জীবিত। রবীন্দ্রনাথই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বশক্তিমান প্রাণ-পুরুষ। গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ, জীবনী, রসপ্রবন্ধ, বিচার-বিতর্ক, সর্ব্বশ্রেণীর রচনায় সমান সিদ্ধহস্ত রবীন্দ্রনাথ একাই বাংলা গদ্যকে একশো বৎসর এগিয়ে দিয়েছেন, পরবর্ত্তীদের জন্যে আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবার নির্দ্দেশও রেখেছেন তাঁর বহুবিস্তৃত

সাহিত্যের পৃষ্ঠায়।, অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-রচনার পদ্ধতি নিয়ে দু-একটা অভিযোগ উঠতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে উক্তির চাতুর্য্য দেখাতে গিয়ে যুক্তির বন্ধন সর্ব্বত্র বজায় রাখতে পারেন না, analogy-র সাহায্যে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন, কিন্তু সে সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র প্রমাণসহ নয়, ভঙ্গীর কৌশলে সব সময় ধরা পড়ে না, এই যা। এই রকম আরো দু-একটা অভিযোগ আনা যেতে পারে। যে নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর লিরিক কাব্যের প্রাণগত ত্রুটি হয়েও অপরূপ ভাবব্যঞ্জনা এবং অনবদ্য শব্দযোজনার গুণে ধরা পড়ে নি, গদ্য রচনায় তা মারাত্মক ত্রুটি হয়েই দাঁড়িয়েছে। তাঁর গল্প-উপন্যাসের অপরিসীম ভাবমুখিতা বা আত্মবীক্ষাসূচক প্রবন্ধের অনাত্মতা অবশ্যই দোষের। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যের কেন্দ্র-স্থানে এই মৌলিক ত্রুটি থাকলেও, তার ঐশ্বর্য্য অসাধারণ। ছিন্নপত্র, জীবনস্মৃতি, পঞ্চভূত, বিচিত্র প্রবন্ধ, প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ, কালান্তর, শব্দতত্ত্ব…অগণ্য নূতন পথে তিনি বাংলা গদ্যের ধারাকে প্রবাহিত করিয়েছেন। সব শুদ্ধ জড়িয়ে বাংলা গদ্যকে তিনি যা দিয়েছেন, কি বস্তুর দিক থেকে কি বিন্যাসের দিক থেকে, তার তুলনা বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসেও সুলভ নয়।]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য-জীবনে এক এক করে তিনটি পরস্পর-বিশ্লিষ্ট গদ্য-রীতির প্রবর্ত্তন করেছেন—প্রথম ভারতীর যুগে, দ্বিতীয় সাধনা ও বঙ্গদর্শনের যুগে, তৃতীয় সবুজপত্রের যুগে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে পুস্তকান্তরে আমি এই তিন শাখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই ত্রিধারার কোন-না কোন শাখাকে আশ্রয় করেই বাংলায় এ পর্য্যন্ত সাহিত্যের প্রসার ঘটেছে। এর বাইরে আজো কারুর যাবার সাধ্য হয় নি। অলঙ্কারবহুল ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গী থেকে সুরু করে, আটপৌরে

কথ্যভঙ্গী পর্য্যন্ত, যত রকমের ষ্টাইল বাংলায় আনা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথই তার চূড়ান্ত পরীক্ষা করেছেন। রবীন্দ্র সমসাময়িকদের অনেকে এবং রবীন্দ্রোত্তর কালের সকলেই এরই একটা-না-একটা পর্য্যায়কে অনুসরণ করে যশস্বী হয়েছেন।

রবীন্দ্র সমসাময়িকদের মধ্যে একমাত্র স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটা নিজস্ব ষ্টাইল ছিল। 'বেণের মেয়ে' ও 'কাঞ্চনমালা'য় তিনি খাস বাংলা রীতির চলন করেছিলেন। অল্প পূর্ব্ববর্ত্তী তারক গাঙ্গুলীর 'স্বর্ণলতা'য়, ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী'তে, ইন্দ্রনাথের 'কল্পতরু'তে, যোগেন বসুর 'রাজলক্ষ্মী' বা 'মডেল ভগিনী'তে উপভোগ্য বস্তুর অভাব নেই, কিন্তু সে সব রচনায় কোন ষ্টাইলের বালাই নেই, সবই চলেছে কৃষ্ণকান্তের উইলের খাত বেয়ে। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'রঙমহাল' শুধু দৃষ্টির দিক থেকেই নয়, বিন্যাসের দিক থেকেও বঙ্কিমের 'রাজসিংহে'র অনুগামী। বঙ্কিম যুগ থেকে রবীন্দ্র যুগে আসতে, এঁরা ফাঁকপূরণের কাজ করে গেছেন—কোন বিশিষ্টতার দাবী নিয়ে এঁরা সাহিত্যের ইতিহাসে অনিবার্য্য হয়ে উঠতে পারেন নি। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বা বিপিনচন্দ্র পালের ষ্টাইল ছিল এবং তা বঙ্কিম-প্রভাবে পুষ্ট হলেও, রবি-কিরণে সঞ্জীবিত। তারপর থেকে একেবারে আজ পর্য্যন্ত রবীন্দ্র-রীতিই বাংলা গদ্যের অনন্য-অবলম্বন হয়ে রয়েছে। শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, অতুল গুপ্ত, নরেশচন্দ্র, মোহিতলাল, নলিনী গুপ্তই হন, আর আধুনিক কালের পরশুরাম, শৈলজানন্দ, জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার, অচিন্ত্যকুমার, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর, শিবরাম চক্রবর্ত্তীই হন, সকলেই রবীন্দ্রনাথের রচনা-কৌশল ও প্রকাশ-ভঙ্গীর অনুসরণ করেছেন। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য তার অন্তঃপ্রেরণা আহরণ করেছে আন্তর্জাতিক সাহিত্যের বিস্তৃততর ক্ষেত্র থেকে, কাজেই তার

ভেতর মার্কসবাদ এসেছে, ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞান এসেছে, অপরাধ তত্ত্ব এসেছে, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা এসেছে, যা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ থেকে স্বতন্ত্র। আধুনিক প্রবন্ধ সাহিত্যেও বিশ্বসাহিত্যের বহু বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত উপকরণ এসে ভীড় করেছে, যা রবীন্দ্রনাথে নেই। কিন্তু সাহিত্য-বিচারে বিষয়-বস্তুটাই একমাত্র জিনিষ নয়, তার প্রকাশভঙ্গীটাও বিশেষভাবেই বিচার্য্য। সংবাদপত্রে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য, বহু রোমাঞ্চকর ঘটনা প্রকাশিত হয়, কিন্তু সে গুলিকে কেউ প্রবন্ধও বলে না, গল্পও বলে না। তাদের প্রয়োজন সাম্প্রতিক, সময় অতিক্রান্ত হবার পর সেগুলি সের দরে বিক্রি হয়ে যায়। এই সাময়িক বস্তুকে চিরন্তন করে রচনা-ভঙ্গী—এই হল সাহিত্যের সঙ্গে অসাহিত্যের সীমা-রেখার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশক। এদিক থেকে বাংলায় এখনো রবীন্দ্রনাথেরই একাধিপত্য চলছে। বাংলা **idoim**-এর উচ্ছেদ করে তার স্থানে কাঁচা ইংরেজী আমদানি করে, নয়ত দুরূহ সংস্কৃত শব্দের যথেচ্ছ অপপ্রয়োগ করে, কেউ কেউ অবশ্য মৌলিকতার দাবী উপস্থিত করছেন, কিন্তু তাঁদের সেই উদ্ধত চীৎকারের পেছুনে দেশবাসীর আস্থা নেই—তাঁদের রচনা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভেতর বহু আড়ম্বরে সম্বর্দ্ধিত হলেও, দেশের চিত্ত-ধারায় তা আশ্রয়ও পায় নি। হুতোমের প্রসঙ্গে বাংলা ভাষায় যে নিজস্ব 'জানে'র কথা বলেছি, সেই জান ফিরিয়ে আনতে পারলে, অথবা রবীন্দ্রনাথের অনুযায়ী শব্দ-যোজনাকে শিল্পের স্তরে উন্নীত করতে পারলে, তবেই সে ষ্টাইল জনসাধারণের সমাদর পেতে পারে। কিন্তু সে রকম শক্তিমান লেখক আধুনিক কালে এখনো দেখা দেন নি। যদিও দেবেন না, এমন নৈরাশ্যেরও কোন কারণ নেই।

এবার একবার পেছুন ফিরে দেখা যাক। মিশনারী যুগ থেকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের ভেতর দিয়ে বাংলা গদ্য সাহিত্য তার আধুনিকতম পরিণতিতে পৌছেছে। বহু আরোহ-

অবরোহের মধ্য দিয়ে এর ক্রমিক বিকাশ, এর অন্তর-বস্তু ও আঙ্গিক সংস্থান বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়েই একটা অখণ্ড সমগ্রতা লাভ করেছে। এত অল্প পরিসরের ভেতর তার সম্যক আলোচনা হতে পারে না। আমি এই প্রবন্ধে মাত্র একটা মোটামুটি ইতিহাস দেবার চেষ্টা করেছি। হয়ত অনেক কথাই বলা হয় নি, কোন কোন কথা হয়ত ঠিক করেও বলা হয়নি। কিন্তু আজকের পাঠককে বাংলা সাহিত্যের বিগত অধ্যায়গুলি পড়াবার দরকার আছে বলেই এ কাজে আমি হস্তক্ষেপ করেছি। বিশেষজ্ঞরা বিশেষ ভাবে আলোচনা করলে তা যেমন কাজের কাজ হবে, আমিও তেমনি তা থেকে উপকৃত হবো।

[৩] বাংলার জাতীয় সাহিত্য

(আধুনিক কালের সাহিত্যের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয়ে থাকে, তার একটি হচ্ছে এই যে এখনকার সাহিত্য থেকে জাতীয়তার সূত্র বিছিন্ন হয়ে গেছে—যে জীবন ও যে সমস্যা আধুনিক সাহিত্যের অবলম্বন, তা বাংলার নয়, কোন দেশ বিশেষের নয়, তা নির্ব্বিশেষ। এর কারণ স্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে এখনকার সাহিত্য দেশীয় সংস্কৃতির প্রাণ-কেন্দ্র থেকে জন্মায় না, দেশের সাহিত্য থেকে তা উদ্দীপনা আহরণ করে না, তার জন্মস্থান ইউরোপ, কিন্তু প্রচার-ভূমি বাংলা।) যাঁরা এ কথা বলেন, তাঁরা অবশ্য স্বীকার করেন যে এখনকার বাংলা সাহিত্যে ভাষার প্রকাশ-শক্তি যথেষ্ট বেড়েছে, তাতে বস্তু-সম্পদও কম সঞ্চিত হয়নি, (কিন্তু দেশীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ নেই, তাই দেশের লোক এই সাহিত্যের ভেতর আপনাদের পায় না, পায় তাদেরই যাদের তারা পাশ্চাত্য সাহিত্যেও পায়।)

সাহিত্যের পক্ষে এতে লাভ হয়েছে কি লোকসান হয়েছে, সে বিচার করবার অবকাশ অবশ্যই আছে। কিন্তু যাঁরা এই অভিযোগ আনেন, তাঁরা সত্য কথা বলেন না এমন নয়। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এটা দোষেরই। (প্রত্যেক মানুষই একটা দিক থেকে বিশ্ব-মানবের প্রতিনিধি সত্যি, কিন্তু সেই সঙ্গেই সে একটি বিশেষ দেশ এবং জাতিরও প্রতিনিধি—আর এইদিক থেকে সে অন্য সকলের সঙ্গে আকারে ও প্রকারে, বৃত্তিতে ও ব্যবস্থায় রীতিমতো স্বতন্ত্রই। সাহিত্যে যখন আমরা মানুষকে পাই, তখন তাকে পাই এই অভ্যস্ত পরিবেশের ভেতর দিয়েই। তার প্রাত্যহিক রূপটাই প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ আমাদের চোখে পড়ে, তার দিব্য

রূপ বা বিশ্বরূপটা চাপা থাকে এই রূপের আড়ালে, যা অনুভব করে নিতে হয়।

ধরা যাক দারিদ্র্য। ওটা বিশ্বব্যাপী, ওর আবেদনও সার্ব্বভৌম, কিন্তু বাঙালীর দারিদ্র্য আর ইংরেজের দারিদ্র্যে আনুষঙ্গিকের তফাৎ আছে প্রচুর। বাঙালীর সাহিত্যে আমরা যখন দারিদ্র্যকে দেখবো, তখন এই আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলোই তাকে আমাদের চোখে সত্য করে তুলবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে বর্জ্জন করে, নির্ব্বিশেষ দারিদ্র্যের রূপ ফোটালে, তা বাঙালীর কাছে সত্য হয়ে উঠবে না। এই সত্যভ্রষ্টতা সাহিত্যের পক্ষে শুধু ক্ষতিকরই নয়, অপমৃত্যুজনক—তাই সাহিত্য থেকে যখন দেশগত, জাতিগত, সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলো তাড়ানো হয়, তখন স্বভাবধর্ম্মেই সাহিত্য বর্ণহীন হয়ে পড়ে। সেই শ্রেণীর নিরুপাধিক সাহিত্য শুধু রস-বোধের পরিপন্থীই নয়, সাহিত্য হিসাবেও তা নিম্নস্তরের জিনিষ।

মোট কথা সামাজিক জীবনই হল সাহিত্যের আদি প্রাণ-কেন্দ্র। সাহিত্যের স্রষ্টা যেহেতু সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষ, সেই জন্যেই তিনি তাঁর আবেষ্টনীর অধীন। তিনি যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, অনুভূতি ও ঐতিহ্যের আশ্রয়ে পুষ্ট, তার প্রভাব তাঁর পক্ষে অনতিক্রমণীয়। বিরোধিতার ভেতর দিয়েই হক, আর সমর্থনের ভেতর দিয়েই হক, তাঁর সৃষ্টি তাঁর পরিপ্রেক্ষণীকে আশ্রয় করেই রূপায়িত হয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা তাই একদিক থেকে যেমন সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের, অন্য দিক থেকে তেমনি তাঁদের দেশের, তাঁদের সময়ের। বেশী দৃষ্টান্তে প্রয়োজন নেই, সেক্সপীয়ার এবং রবীন্দ্রনাথ এই দুই বিশ্ব-কবির উল্লেখই যথেষ্ট হবে মনে করি। অবশ্য সাহিত্যে সৃষ্টির তাগিদটা সত্যিজাতের হওয়া চাই, অর্থাৎ বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির ওপরই তার প্রতিষ্ঠা হওয়া চাই। প্রত্যক্ষ জীবনে যে কামনা কল্পনা, বেদনা বাধা, কোনদিন স্থান পায়নি, অন্যের

অনুকরণে তাই আমদানি করতে গেলে, আপন অভিজ্ঞতার গভীরে তার মূল নিবদ্ধ থাকে না বলেই সেটা সত্যি হয়ে ওঠে না—বাস্তবতার রং তাতে ফিকে হয় এবং তা থেকে কোন স্পষ্ট প্রাণ-স্পন্দনই অনুভব করা যায় না।

বাস্তবতার বিচারে আজকের জীবন আমাদের অতিশয় বিক্ষুব্ধ। পরকীয় রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে দেশে চলেছে একটি দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ—এটা দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে মোটা কথা। এর পেছনে রয়েছে মারাত্মক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, শ্রেণী স্বার্থের ও জাত্যভিমানের জুলুম, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, আরো রকমারি উৎপাত। এই আবহাওয়ার ভেতর যারা মানুষ, তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে এর কোন-না-কোনটার বা অনেক কটারই পীড়ন সহ্য করতে বাধ্য হয়েছেন, হচ্ছেন। সুতরাং তাঁরা যখন সাহিত্য সৃষ্টি করছেন, তখন স্বভাবতঃই আশা করা যেতে পারে যে তাতে প্রত্যক্ষ জীবনের এই দুঃখ দুর্দ্দশার ছাপ থাকবে, কিন্তু তা নেই। (আর নেই তার কারণ, তাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করছেন অন্যের নকল করে, প্রত্যক্ষ জীবন থেকে পুঁজি আহরণ করে নয়।)

আমাদের সাহিত্যে আধুনিককালে প্রত্যক্ষ জীবনের যে রূপটি দেখা গিয়ে থাকে, তা মোটামুটি এই : আমাদের শিক্ষা একান্তভাবে ভাবাত্মক, কিন্তু আমাদের অবস্থা অভাবাত্মক—শিক্ষার প্রভাবে আমরা অভ্যস্ত হচ্ছি এক ধরণের জীবন-যাপনে প্রস্তুত হতে, কিন্তু আমাদের অবস্থা আমাদেরকে বাধ্য করেছে আর এক রকম হয়ে থাকতে। সংস্কার ও সংস্থানের এই দ্বন্দ্ব আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলছে কতকগুলো কৃত্রিম জীবনাদর্শ, যাকে সাহিত্যে রূপ দিয়ে আমরা আত্ম-প্রবোধের সন্ধান করছি। (অর্থাৎ আমাদের সাহিত্য সৃষ্টি প্রত্যক্ষ অবস্থা ছেড়ে এক-একটি নিরুপাধিক ideaকে কেন্দ্র করে স্ফূর্ত্ত হচ্ছে, তার ভিত্তি সত্যের ওপর

প্রতিষ্ঠিত নয়, প্রতিষ্ঠিত এক-একটা কল্পিত কাঠামোর ওপর—আর সে কল্পনা আহৃত ইউরোপীয় চিন্তার ক্ষেত্র থেকে।) এই মৌলিক ত্রুটির জন্যেই আজকের সাহিত্যের সঙ্গে দেশের নাড়ীর যোগ এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাতে নেই বিন্দুমাত্র জীবনোত্তাপ।)

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে পরকীয় রাষ্ট্র-শক্তির অধীনে যে জাতকে মাথা হেঁট করে থাকতে হচ্ছে, তার সাহিত্যকে বাধ্য হয়েই প্রেস-আইনের মুখ চাইতে হবে। দেশের ওপর দিয়ে যে জাতীয় আন্দোলনের স্রোত চলেছে, তাকে সাহিত্যের ভেতর খাল কেটে নিয়ে আসতে পারলে হয়ত এ জমি উর্ব্বরই হতো, কিন্তু তার উপায় কোথায়? তাই সাহিত্যিককে জীবন-সমস্যা ছেড়ে ভাব-সমস্যা নিয়ে পড়তে হয়েছে এবং তার অনিবার্য্য পরিণাম রূপেই সাহিত্য হয়ে পড়েছে এমন ধারা ভাবতান্ত্রিক।

এ কথা আংশিক সত্য, কিন্তু এর পেছুনের যুক্তি খুব ভারসহ নয়। বিপ্লব বা বিদ্রোহাত্মক সাহিত্যের পথে রাষ্ট্র-শক্তির বাধা আছে সত্যি, কিন্তু সমাজের ভেতরও ত দৃষ্টি দেবার প্রচুর অবকাশ রয়েছে এবং সেখানে কোন কর্ত্তৃত্বই ত পথ আগলে দাঁড়িয়ে নেই! তবে সে সমস্তকে সমসাময়িক সাহিত্য এমন করে এড়িয়ে যাচ্ছে কেন? আমাদের সাহিত্যে সমস্যা আছে ঠিকই, কিন্তু সে সমস্যা সাহিত্যেই আছে, জীবনে নেই। বিদেশী সাহিত্যের পৃষ্ঠা থেকে আহৃত সেই সব সমস্যা আমাদের পক্ষে বাইরের জিনিষ। (দেশের সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে এদেরকে গড়ে নিতে হলে, যতখানি বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা দরকার, তা লেখকদের আয়ত্তের বহির্ভূত বলেই এটা হয়েছে।)

তাই বলছিলাম যে আধুনিক সাহিত্য প্রত্যক্ষ সত্য থেকে বিচ্যুত এবং বস্তুগত জীবনের সঙ্গে তার বন্ধনের সূত্র শিথিল। সমাজ-জীবনের দক্ষিণই হক, আর বামই হক, আধুনিক সাহিত্য যে পর্য্যায়কেই অবলম্বন

করুক, তার প্রাণ-বস্তু ও পরিবেশ সম্বন্ধে এ সাহিত্যে অভিজ্ঞতার ছাপ প্রায় কিছুই নেই। কয়েকটা বাঁধা মত বা ফরমূলাকে কতকগুলি মন-গড়া স্ত্রী-পুরুষের মারফতে ফুটিয়ে তোলাই হল এ সাহিত্যের বিশেষ লক্ষ্য। এতে দক্ষিণই হক, আর বামই হক, দুই পর্য্যায়ই সমান অসত্য। এই অসত্যের ভিত্তির ওপর যাদের কার্য্য-কলাপ প্রতিষ্ঠিত, তাদের সমস্যাও তাই সত্যকার জীবন সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন। বাইরে থেকে দুলে, বাগ্দী, চোর, ডাকাত, ব্যভিচারী বা বেশ্যা দেখে আমরা এর এলাকার বিস্তৃতি ভেবে উল্লসিত হই—কিন্তু তলিয়ে যখন দেখি, তখন দেখি বাগ্দী ও বিলাত-ফেরতে, বিবি ও বেশ্যায় ভাব-দ্বন্দ্বের স্বরূপ একই—এদের বিন্যাস-বিধিতে তফাৎ কিছু কিছু দেখা যায় বটে, সেটা ইচ্ছাকৃত, কিন্তু এদের ব্যঞ্জনা একই। কাজেই এদের ভেতর দিয়ে আমরা যাদের দেখি, তারা বাস্তব সংসারের কেউ নয়—সে উচ্চই হক, আর নীচই হক। অর্থাৎ সমগ্র ভাবে এ সাহিত্যে রক্ত-মাংসের মানুষ নেই—আছে ব্যক্তি-রূপ সমন্বিত idea এবং বিরুদ্ধ idea-র সঙ্গে তার সঙ্ঘাত। এই জিনিষকে বলা হচ্ছে intellectualism বা প্রজ্ঞাতান্ত্রিকতা। কিন্তু আসলে এ জিনিষটা হচ্ছে অন্তঃসারশূন্য বৈদেশিক সংস্কৃতি-ধারার অনুসরণ। বৈদেশিক অনুপ্রেরণা গ্রহণে বাধা নেই, কিন্তু বৈদেশিকতার যেটুকু স্বাদেশিকতার অনুপূরক, শুধু সেইটুকুই নিতে হবে। তার বাইরে বৈদেশিকতা একেবারেই অর্থহীন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সাহিত্যে স্বাদেশিকতার চেষ্টাই নেই, তাই নির্জ্জলা বৈদেশিকতার আবাদে আমাদের সাহিত্য ঘরে-বাইরে উভয়ত্রই সমান অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছে।

কথা উঠবে, সাহিত্য রস-সৃষ্টির বৃহৎ লক্ষ্য ভুলে, বাস্তব জীবনের ফটোগ্রাফী করতে পারে না, বা বাস্তব অবস্থার বাণীবাহক হয়ে নিত্য ব্যবহার্য্য তৈজসের সামিল হয়ে উঠতেও পারে না, অতএব রসই যদি

সাহিত্যের প্রাণ-বস্তু বলে বিবেচিত হয়, তাহলে সাহিত্য সম্পর্কে বাস্তবের কথা উঠতেই পারে না, দেশ-বিদেশের প্রশ্নও সে ক্ষেত্রে অবান্তর। এ কথা আপাতভাবে অস্বীকার করি না, কিন্তু পূর্ণভাবে স্বীকারও করি না। নিরবলম্ব শূন্যের ওপর রসের স্থিতি নয়, রসের প্রসার-ভূমিই হল বাস্তব এবং সে বাস্তব বীজগণিতের সঙ্কেতে আবদ্ধ নয়, তার গতি ইন্দ্রিয়-ধর্মের স্বাভাবিক প্রবণতার দিকেই। বরং বাস্তবকে পরিহার করে নিছক idea-র ওপর সৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করলেই সে সৃষ্টি নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে এবং তার আবেদনও হয় অসত্যাভিমুখী।

জিনিষটাকে বোঝাতে পারি, বিগত শতাব্দীর সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা করে। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম আমলে বাঙালী স্বাধীন ইংরেজের সাহিত্য পড়ে দেশাত্মবোধক সাহিত্য-সৃষ্টির অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। এর আবশ্যকতা প্রথম ধরেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। কিন্তু তখনো বাঙালীর ইতিহাস ছিল পাথর চাপা, তাই রাজপুতানার ইতিবৃত্ত থেকে উপাদান সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যে দেশ প্রীতির পত্তন করতে হয়েছিল। রঙ্গলালের বা হেমচন্দ্রের কাব্যে বাঙালীর দেশ-প্রীতি প্রকাশ পেয়েছিল অবাঙালীকে বাহন করে। নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধে প্রথম বাঙালী এলো—কিন্তু সত্যিকার দেশপ্রেমের অবতারণা করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। জাতীয়তা-বোধের পরিকল্পনা বঙ্কিমেও অবশ্য সমগ্রতা পায়নি, কিন্তু জাতীয় সম্ভ্রম ও স্বাতন্ত্র্যকে তিনিই প্রথম গরিমাময় দীপ্তিতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। অবশ্য এঁদের সকলেরই জাতীয়তা-বোধ সীমাবদ্ধ ছিল সমাজ-জীবনের সম্মুখের স্তরে। দরিদ্র, মূর্খ, অসহায়, মূক জনসাধারণকে এই দেশপ্রেমের পরিধির ভেতর খুঁজে পাওয়া যায় না। বঙ্কিমে, রমেশচন্দ্রে, মাইকেলে, হেমচন্দ্রে, নবীন সেনে, রঙ্গলালে, কোথাও তারা নেই। একমাত্র দীনবন্ধুই এই আভিজাত্যের বেড়া ভেঙে কৃষকের

স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে লিখেছিলেন 'নীলদর্পণ', আর সেইখানেই সর্ব্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের আসরে অনুন্নত জনসাধারণের দাবী-দাওয়া শিক্ষিত সমাজের হাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হয়।।)

সাহিত্যের পৃষ্ঠা থেকে দেশাত্মবোধের এই প্রেরণা সেদিন বাঙালীর জাতীয় জীবনে সংক্রামিত হয়েছিল এবং এর পর বাংলা দেশ থেকে উদ্ভূত জাতীয় আন্দোলনের আগুন যেদিন বৃটিশ ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, সেদিন বাংলা সাহিত্যও তা থেকে পেয়েছিল সত্যিকার একটি উদ্দীপনা।) এতদিনে বাংলার ইতিহাস বের হল—সে ইতিহাস উপন্যাসে নাটকে, কাব্যে গানে পল্লবিত হয়ে পড়লো। (সেদিনকার আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে, তার কারণ তার পেছনে দেশের জনসাধারণের কোন সায় ছিল না। তা শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেই আবর্ত্তিত হয়েছিল, তার বাইরে যায় নি।)

তা সত্ত্বেও এ আন্দোলনকে নিষ্ফল বলতে পারি না, কারণ এ থেকে আমাদের ভেতর শুধু রাষ্ট্রিক চেতনাই উদ্রিক্ত হয়নি, আমাদের জাতীয় সাহিত্যেরও সূচনা হয়েছে এইখানে।(যে রবীন্দ্রনাথ পরবর্ত্তীকালে বিশ্বমৈত্রীর আদর্শের কাছে দেশ-কল্যাণের প্রশ্নকে সঙ্কীর্ণ বিবেচনা করেছেন, তিনি পর্য্যন্ত এই সময় বিশেষ করে জাতীয়তার পরিপোষক হয়েছিলেন, কতকগুলি গান, গল্প এবং প্রবন্ধে আজো তার পরিচয় আছে। সমগ্রভাবে এই সাহিত্য-প্রচেষ্টার পেছনে সাময়িকতা ছিল, তার অনেকটুকুই সময়াতিক্রমের পর তাই নিষ্প্রভও হয়ে গেছে, কিন্তু দেশের নবজাগ্রত জাতীয়তা-বোধকে তা বিশেষভাবেই উস্কে দিয়ে গেছে।)

(সেইজন্যেই বলছি যে বিগত শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ছিল বাংলার জাতীয় সাহিত্য, যা আজ সে নয়।) রবীন্দ্র সাহিত্যের ভেতর দিয়ে যে দেশকালাতীত আন্তর্জ্জাতিকতার বাণী দেশের মর্ম্মস্থানকে অধিকার করেছে,

আধুনিক সাহিত্যের প্রসঙ্গে আমি যে প্রত্যক্ষ সংস্রবহীন আইডিয়া-বিলাসের উল্লেখ করেছি, তা থেকে এ স্বতন্ত্র ধরণের জিনিষ। (রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যে সুগভীর জীবনবেদ ও সুমহান শিল্পীক কারুকলা তাঁর নৈর্ব্যক্তিকতার ত্রুটি পূরণ করেছে, আধুনিকদের রচনায় সে রকম কোন পূর্ণায়তন জীবনবাণীর নির্দ্দেশ নেই—আছে কতকগুলো নির্ব্বিশেষ মতামত, যা বুদ্ধির রাজ্যে অল্পস্বল্প চমক লাগাতে পারে, কিন্তু অন্তরে কোন ছাপই ফেলতে পারে না।) এই অন্তঃসারহীনতার কারণ কি তা আমি আগেই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি। এইজন্যেই আমি মনে করি, শরৎচন্দ্রই বাংলার শেষ জাতীয় সাহিত্যিক, যাঁর রচনা বাংলার জীবন ও বাঙালীর মননশীলতার রসে সঞ্জীবিত। প্রত্যক্ষভাবে জাতীয়তার উদ্দেশ্য নিয়ে শরৎচন্দ্র একখানির বেশী উপন্যাস লেখেন নি—কিন্তু তাঁর সমস্ত রচনাই জাতির মর্ম্মস্থান থেকে উৎসারিত এবং এই আমার মতে জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃত লক্ষণ।

(বিগত মহাযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বের জীবন ও সংস্কৃতিতে, চিন্তায় ও কর্ম্মে যে বিপর্য্যয় দেখা দিয়েছে, বাংলার প্রজ্ঞা-দৃষ্টি তা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে নি। অথচ যুগাদর্শকে ষোল-আনা আয়ত্ত করে, আপন অবস্থা ও প্রয়োজনের অনুকূলে তাকে গড়েপিটেও নিতে পারে নি। তাই অনর্থক পরীক্ষা এবং অনাবশ্যক প্রচেষ্টায় আজকের বাংলা সাহিত্য ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। এমন কি দেশের অত্যুগ্র রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের হাওয়াতেও তাতে কোন বেগ আসেনি। সাহিত্য ক্রমশঃ জুড়িয়ে যাচ্ছে এবং জনসাধারণের কাছ থেকে সরতে সরতে কোটারীর আওতায় গিয়ে পড়ছে। সাহিত্যের পক্ষে এটা যে খুব আশার কথা নয়, তা বিবেচনাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করবেন।

[৪] ইংরেজী লেখায় বাঙালী

আজকের দিনে চলনসই রকম ইংরেজী বলতে বা লিখতে পারেন, এমন বাঙালীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। সহরে ত বটেই, অতি দূরবর্ত্তী মফঃস্বলের গ্রামেও এমন দু-চারজন লোক পাবেনই, যাঁরা ইংরেজী খবরের কাগজ পড়েন, চিঠিপত্র লেখেন, দরকার মতো দু-কথা ইংরেজীতে বলতেও পারেন। বাংলাদেশের সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে এঁরা দলে খুব বেশী না হলেও, আত্মস্বতন্ত্রভাবে এঁদের সংখ্যা মোটের ওপর কম নয়। এ থেকে এই প্রমাণ হয় যে ইংরেজী ভাষার অনুশীলন আমাদের সমাজ-জীবনের যে-কোন স্তরেই পৌঁছেছে এবং তার ভেতর দিয়ে নিজের চিন্তা, অনুভূতি ও মননশীলতা প্রকাশের একটা পথও ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে।

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সূচনা থেকে আজ পর্য্যন্ত বড় জোর একশো বছর হল। এই অল্প সময়ের ভেতর একটা জাতির পক্ষে অন্য একটি জাতির ভাষাকে এমন নিবিড় করে আয়ত্ত করা যে বেশ একটু বিস্ময়কর তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বাঙালীর ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাস এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালী যেমন তার ইংরেজী জ্ঞানের বিশিষ্ট পরিচয় দিয়েছে, ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য রচনার কাজেও তেমনি তার কৃতিত্ব গোড়া

থেকেই দেখা গিয়েছে। ইংরেজী ভাষায় কাব্য এবং দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করে বহু বাঙালী বাইরের বিদ্বৎ-সমাজে যশস্বী হয়েছেন। ইংরেজ ব্যতীত অন্য কোন জাতির ইতিহাসেই ইংরেজী ভাষার চর্চ্চায় এতখানি নিষ্ঠার এবং তাতে এ রকম সাফল্যের নিদর্শন নেই।) (হতে পারে, বাঙালীকে যে রাজনৈতিক কারণে বাধ্য হয়ে ইংরেজী শিখতে হয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোন জাতির তা হয়নি বলেই তারা এদিকে আগুয়ান হবার প্রয়োজন মনে করে নি, কিন্তু একথাও সুনিশ্চিত যে বাধ্যতামূলক ভাবে যে ইংরেজী বাঙালীকে শিখতে হয়েছে, বাঙালী তাকে আপন অন্তরের রসে রসিয়ে নিতে পেরেছে। নইলে বহিরাগত একটা বৈদেশিক ভাষার ওপর এতটা অধিকার তার কখনোই হতো না, যাতে সাহিত্য রচনা সম্ভবপর।

অবশ্য একথা বলাই অনাবশ্যক যে ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য রচনা করে বাঙালী কোন দিন ইংরেজী সাহিত্যের দিকপাল লেখকদের সমকক্ষ হতে পারে নি, তা পারাও সম্ভব নয়। তার সমস্ত প্রয়াসই যতটা কৌতূহলের ততটা সাফল্যের নয়, তবুও তার কৃতিত্ব একেবারে উপেক্ষণীয়ও নয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য রচনা করে বাঙালী আশানুরূপ পুরস্কৃত হয় নি। পোলিশ লেখক জোসেফ কনর্যাড, আর্মেনিয়ান লেখক মাইকেল আর্লেন, ফরাসী লেখক আঁদ্রে মুর্য়ো ইংরেজী লিখে ইংরেজের ঘরের লোক হয়েছেন, বাঙালী তাঁদের চেয়ে কম বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেননি, কিন্তু তাঁদের ইংরেজ সাহিত্যিকরা যথাসম্ভব বাইরে রাখবারই চেষ্টা করেছেন। তরু দত্ত, মনোমোহন ঘোষ, রবি দত্ত, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতির কবিতা কেউ কেউ সপ্রশংস দৃষ্টি নিয়ে পড়েছেন—রবীন্দ্রনাথের বইগুলি পড়েছেন অনেকটা বাধ্য হয়ে, কিন্তু যেটুকু শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি

বাঙালীর ন্যায়সঙ্গত ভাবে প্রাপ্য ছিল, তা কেউ-ই দেন নি। বাঙালীর সৃষ্ট ইংরেজী প্রবন্ধ-সাহিত্য অনেকেই পড়ে থাকেন সৌখীন ওরিয়েণ্ট্যালিজমের মোহ থেকে, কিন্তু ইংরেজ লেখকদের প্রামাণিক বই-পুঁথিতে সে সবের উল্লেখ এতই কম দেখা যায় যে তাতে বুঝতে বাকী থাকে না, এ উপেক্ষার মূল কোথায়!

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে বাঙালীর ইংরেজী রচনার একটা দ্রুত ইতিহাস বলে যাচ্ছি। অবকাশ-ধনী অন্য কোন অনুসন্ধিৎসু এদিকে মনোনিবেশ করলে, যেমন একটি নূতন আলোচনার দিক পাবেন, তেমনি স্বদেশের বহু কৃতী সন্তান সম্বন্ধে জাতীয় কর্ত্তব্য পালনেরও সুযোগ পাবেন। আমি শুধু তারি সূত্রটা ধরিয়ে দিচ্ছি, তার বেশী কিছু করার স্থান ও সময় আমার নেই। হয়ত যোগ্যতাও নেই।

ইংরেজী কবিতা লেখক বাঙালীদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ। হিন্দু কলেজের ছাত্ররূপে ইনি রিচার্ডসনের প্রভাবে এসেছিলেন এবং তাঁরি দৃষ্টান্তে কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর Shair & Other Poems নামক কবিতা-সংগ্রহের মঙ্গলাচরণ কবিতাটি কাশীপ্রসাদের কাব্য-প্রতিভার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তাঁর প্রায় সমসাময়িক মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং রামবাগানের দত্তরা কাব্য রচনায় অধিকতর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দত্ত ভ্রাতৃবৃন্দের Dutt Family Album বা মধুসূদনের Captive Lady, Visions of the Past প্রভৃতি কাব্য আজকের দিনেও পড়তে ভালোই লাগে। শশীচন্দ্র দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রমুখ লেখকের রচনায় ইংরেজী কাব্যের ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গী আয়ত্ত করার যে পরিচয় পাই, তা অসাধারণ। মাইকেলের কবিতা যতটা ওজস্বিতাপূর্ণ, ততটা আন্তরিক নয়। মাইকেল ও দত্তরা সকলেই কাব্য রচনায় বাইরণ এবং স্কটকে অনুসরণ করেছিলেন, তাই

তাঁদের কবিতায় দেশাত্মবোধ ও প্রেমবিহ্বলতার এত ছড়াছড়ি। তরু দত্তের কবিতায় প্রত্যক্ষ অনুভূতির পরিচয় স্পষ্টতর।

তরু দত্ত মারা যান মাত্র একুশ বছর বয়সে, কিন্তু এই অল্প বয়সেই তিনি ইংরেজী ও ফরাসী রচনায় যে নৈপুণ্যের পরিচয় দেন তা বিস্ময়কর। তাঁর Ballads & Legends of Hindusthan কাব্যের কয়েকটি গাথায় এবং শেষাংশের সনেট ও লিরিক কবিতাগুলিতে রীতিমতো পাকা হাতেরই প্রাথমিক ছাপ পাওয়া যায়। Our Casuriana Tree এবং আরো দু-একটি কবিতার Edmund Gosse উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

এঁদের পর যাঁরা ইংরেজীতে কবিতা রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে মনোমোহন ঘোষ, রবি দত্ত, সরোজিনী নাইডু এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাইরে খ্যাতি লাভ করেছেন। মনোমোহনের Songs of Love & Death কাব্যের ভূমিকায় Lawrence Binyon কবির নিজস্বতা ও বৈশিষ্ট্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। Orphic Mysteries শীর্ষক কবিতাগুলি সত্যিই চমৎকার। কি ভাষায়, কি ব্যঞ্জনায়, তা কোন বৈদেশিকের লেখা বলেই মনে হয় না। ইংরেজী প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিদের কবিতার সঙ্গে এগুলিকে নির্ব্বিবাদে চালিয়ে দেওয়া যায়। রবি দত্ত প্রধানতঃ অনুবাদক কবি। তাঁর Echoes from East & West কাব্যে পৃথিবীর বিশিষ্ট ভাষাগুলি থেকে নির্ব্বাচন করে নেওয়া বহু কবিতার অনুবাদ স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'উর্ব্বশী'র অনুবাদ অপূর্ব্ব। উর্ব্বশীর মতো অলঙ্কারাঢ্য শব্দ-ঝঙ্কারময় কবিতার যে এমন মূলানুগামী অনুবাদ ইংরেজীতে হতে পারে, এ যেন হঠাৎ বিশ্বাসই হয় না। তাঁর 'শকুন্তলা'র অনুবাদকেও Arthur Symons মনিয়ারের অনুবাদের চেয়ে ভালো বলেছেন। সরোজিনী নাইডুর কবিতা ফুরফুরে, হাল্কা জাতের।

Golden Threshold, Bird of Time, Broken Wing প্রত্যেক বইয়েই কিছু কিছু ভালো কবিতা আছে। Golden Threshold-এর Queen's Rival কবিতাটি বেশ উপভোগ্য। হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ইদানীং তাত্ত্বিক হয়ে পড়ছে, কিন্তু একদা তিনি সত্যকার জীবন্ত লিরিক লিখতেন। তাঁর Strange Journey নামক কাব্য তাঁর কবি-প্রতিভার বিশিষ্ট নিদর্শন।

উল্লেখযোগ্য কবি এঁরা। কিন্তু কবিতা আরো অনেকে লিখেছেন। মাইকেল সমসাময়িক রাম শর্ম্মার কবিতার এক সময় প্রসিদ্ধি ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের Lyrics of Ind, স্বামী বিবেকানন্দের 'বীর বাণী'র ইংরাজী কবিতাগুলি, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের Quest Eternal এবং হরিনাথ দে'র বাংলা কবিতার ইংরেজী অনুবাদগুলি সুখপাঠ্য। শ্রীঅরবিন্দের Sons to Myrtilla, Baji Prabhu, Ahana প্রভৃতি কাব্যের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যও অনুপেক্ষণীয়, তত্ত্বপ্রধান কাব্য হিসাবে সেগুলি অনেকের মনোরঞ্জন করেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বকৃত 'সাগর সঙ্গীতে'র অনুবাদ (শ্রীঅরবিন্দের অনুবাদসহ) এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনের ইংরেজী সনেটও মোটের ওপর ভালো লেখা।

রবীন্দ্রনাথের Gitanjali, Gardener, Fruit-Gathering, Crescent Moon প্রভৃতি বইয়ে বাংলা কবিতার ইংরেজী গদ্যানুবাদ স্থান পেয়েছে। এই গদ্য কবিতাগুলির ছন্দ-সুষমা ও শব্দ-ঝঙ্কার নূতন ধরণের জিনিষ। ইংরেজী বাইবেলের Psalms অংশে এদের সাদৃশ্য দেখা যায়। বলা বাহুল্য যে এই ইংরেজী রচনার জন্যেই কবি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। হাল আমলের কবিদের মধ্যেও কেউ কেউ ইংরেজী রচনা করেছেন, তাঁদের লেখা এখনো চলছে বলেই আপাততঃ তার আলোচনা করলাম না।

বাঙালীর মধ্যে ইংরেজী গদ্য রচনায় প্রথম কৃতিত্বের পরিচয় দেন রাজা রামমোহন রায়। যদিও রামমোহনের অধিকাংশ রচনাই (তাঁর সংস্কার-কার্য্যের সহায়ক এবং সেই জন্যেই) বিতর্কমূলক ও সাম্প্রতিক, তবু তাদের লিখন-বৈশিষ্ট্য আছে। এ ছাড়া তাঁর ইংরেজী খৃষ্টচরিতও সুখপাঠ্য। রামমোহনের পর হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজী রচনার আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে এবং তাঁরা দলে দলে ইংরেজীতে গদ্য ও পদ্য রচনা সুরু করেন। পদ্যের কথা আগেই বলেছি। গদ্য লেখকদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রত্নতত্ত্বে এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্ম ও সমাজ-সমস্যা আলোচনায় ইংরেজী রচনাশক্তি নিয়োগ করে প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন। রাজেন্দ্রলালের Antiquity of Orissa, কৃষ্ণমোহনের Discourses on Education শুধু প্রথম আমলের ইংরেজী রচনা হিসাবেই উল্লেখযোগ্য নয়। প্রসিদ্ধ Travels of a Hindu রচয়িতা ভোলানাথ চন্দ এবং Govinda Samanta (Bengal Peasant Life) প্রণেতা লালবিহারী দে'কেও এঁদেরই দলভুক্ত করা যেতে পারে। Travels of a Hindu বা Govinda Samanta বইয়ে বিচার-বিতর্কের সমাধান বা তত্ত্ব ও তথ্য প্রচার ছেড়ে বাঙালীকে ইংরেজী ভাষায় মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির কাজে অগ্রণী হতে দেখি। এঁদের আদর্শে যুবক বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথমে ইংরেজীতেই উপন্যাস লিখতে গিয়েছিলেন, Rajmohon's Wife-এ তা প্রমাণ হয়।

ভোলানাথ চন্দের ভারত-ভ্রমণে স্থানে স্থানে বর্ণনা-শক্তির যে নৈপুণ্য চোখে পড়ে, তা বিদেশীর পক্ষে কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। লালবিহারীর রচনা পড়ে ইংরেজ কবি টেনিসন মুগ্ধ হয়েছিলেন শোনা যায়। বাস্তবিকই পল্লীবাসী বাঙালীর সুখ-দুঃখ, তার প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি তাঁর বইয়ে চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু ভোলানাথ

এবং লালবিহারী উভয়ের ইংরেজী রচনাই অলঙ্করণের আতিশয্যে একটু বেশী ভারাক্রান্ত। এখনকার দিনে এই ধরণের ইংরাজীকে আমরা অপছন্দ করি। কিন্তু সেটা এখনকার দিন নয়। বঙ্কিমের ইংরেজী রচনাও সুন্দর —তাঁর অবলম্বিত বিষয় হল একটি পুরাণো জমিদার পরিবারের কাহিনী এবং সে কাহিনীর পরিবেশ অঙ্কণে বেশ একটু কলাকৌশল দেখা যায়। কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত Indian Field মাসিক পত্রের ফাইল থেকে উদ্ধার করে বইটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু সৃষ্টিমূলক সাহিত্য রচনায় ইংরেজী লেখক বাঙালী বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেন নি। তাঁদের সত্যিকার নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে বিষয়াত্মক লেখায় এবং তারও সূচনা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের হাতেই। ইংরেজী শাসন ও ইংরেজী শিক্ষার সংস্রবে এসে বাঙালীর জীবন ও মননশীলতায় যখন প্রবল ভাঙন দেখা দিলে, তখন একদল উঠলেন, যাঁরা সাময়িক পত্রের ভেতর দিয়ে বিভ্রান্ত দেশবাসীকে সত্য পথের নির্দেশ দিতে লাগলেন, সেই সঙ্গে দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, তার ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া বৈদেশিক শাসকদের সাম্নে মেলে ধরতে লাগলেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষের Hindu Intelligencer, হরিশ মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণদাস পালের Hindu Patriot, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের Mukherjee's Journal, কিশোরীচাঁদ মিত্রের Indian Field প্রভৃতি পত্রিকা এদিক থেকে যুগস্তম্ভ স্বরূপ।

বলে রাখা দরকার যে তখনো সংবাদ বিক্রয়ের এজেন্সী, বৈদ্যুতিক মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র ছাপার রোল পেপার ইত্যাদি দেখা দেয় নি। কাজেই সেদিন এখনকার মতো দৈনিক পত্র প্রকাশের সুবিধা ছিল না। এই পত্রিকাগুলি তাই ছিল হয় মাসিক, নয় সাপ্তাহিক এবং এরা ছিল একাধারে সাহিত্যপত্র ও সংবাদপত্র। কিন্তু এই পত্রিকাগুলো দেশের

রাজনৈতিক আত্ম-চেতনা লাভে এবং দেশের চিন্তা-ধারাকে বাইরে বয়ে নিয়ে যাবার কাজে প্রচুর সহায়তা করেছে। তারপর যতই দিন গেছে, ততই রাজনৈতিক স্বাধিকার লাভের স্পৃহা দেশে প্রবল হয়ে উঠেছে, আর তারই উদ্দীপনায় সাংবাদিকতাও হু হু করে এগিয়ে গিয়েছে। অব্যবহিত পরের বিশিষ্ট সংবাদপত্র যা, নগেন্দ্রনাথ ঘোষের Indian Nation, নরেন্দ্রনাথ সেনের Indian Mirror, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের Bengalee (মূলে গিরিশচন্দ্র ঘোষের), শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষের Amritabazar Patrika, বিপিনচন্দ্র পালের Leader ইত্যাদি—তার প্রেরণা জুগিয়েছে এই সব কাগজ।

এই শেষোক্ত পত্রিকাগুলি যখন ইংরেজীতে দেশের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিতে সুরু করে, সেই সময় থেকে ইংরেজীনবীশ মনীষীরাও ইংরেজী রচনার সাহায্যে সংস্কৃতি-বিস্তারের কাজে অধিকতর আগ্রহশীল হন। রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরালাল হালদার, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ পণ্ডিতের লেখার সঙ্গে সকলেরই অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে। রমেশ দত্তের Literature of Bengal, Economic History of British India, স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্ম্মবিষয়ক রচনাবলী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের New Essays in Criticism, Positive Sciences of the Hindus, বিপিনচন্দ্র পালের Soul of India, অরবিন্দ ঘোষের Mother, Kalidas, Essays on Gita, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের A Nation in Making, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের Some Thoughts On Teaching, জগদীশচন্দ্র বসুর Response of the Living & the Non-living, প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের History of Hindu Chemistry

প্রভৃতি বই যেমন বাঙালী মনীষার অসামান্য নিদর্শন, তেমনি প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী গদ্যরচনা হিসাবেও তা স্মরণীয়। ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, ধর্ম্ম, রাজনীতি, শিল্পকলা ইত্যাদির বিভিন্ন দিক এই বইগুলিতে আলোচিত হয়েছে এবং সে আলোচনার মূল্য কেবলমাত্র ঐতিহাসিক নয়। রবীন্দ্রনাথের **Personality, Religion of Man** প্রভৃতি বইয়ের কথাও ভুললে চলবে না।

এরি ধারা আজ পর্য্যন্ত বয়ে চলেছে। আমাদের সমসাময়িক কালের লেখকদের মধ্যেও অনেকেই ইংরেজী রচনায় বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন, দিচ্ছেন। রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার অর্থনীতি-সমাজনীতিতে, যদুনাথ সরকার, সুরেন্দ্রনাথ সেন, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, রমেশচন্দ্র মজুমদার, দীনেশচন্দ্র সেন ইতিহাস ও পুরাবৃত্তে, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ সরকার দর্শনে, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বিজ্ঞানে, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বে, মানবেন্দ্র রায়, সুভাষচন্দ্র বসু রাজনীতিতে খ্যাতিমান হয়েছেন এবং তাঁদের এ খ্যাতি প্রধানতঃ ইংরেজী রচনার জন্যেই। নিছক সাহিত্যিক গদ্য রচনা করেও আমেরিকাপ্রবাসী স্বর্গীয় ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেছেন। তাঁর **Gayneck, Kari** প্রভৃতি শিশু-উপন্যাস এবং **My Brother's Face, Caste & Outcaste** প্রভৃতি বই দেশ-বিদেশে উচ্চ প্রশংসা পেয়েছে।

সাময়িক পত্রের রাজ্যেও সমসাময়িক কালের দান কম নয়। দেশবন্ধুর Forward, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর Servant, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের Advance প্রভৃতি সংবাদ পত্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের Modern Review, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Calcutta Review,

শান্তিনিকেতনের Visvabharati Quarterly প্রভৃতি সাহিত্য পত্র দেশ ও দেশের বাইরে বিশিষ্ট মর্য্যাদা লাভ করেছে। বাংলার বাইরে গিয়েও বাঙালী সাংবাদিকতায় যশস্বী হয়েছেন। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কালীনাথ রায়, সরলা দেবী ইত্যাদির নাম শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সাংবাদিকতার আজ যে দ্রুত প্রসার হয়েছে, তার মূলে রয়েছে বাঙালীর প্রভাব। একথা তাঁরা হয়ত আজ স্বীকার করবেন না, কিন্তু এ ঐতিহাসিক সত্য।

[৫] মহাযুদ্ধ ও যুগ-সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ

পঁচিশ বৎসরের ভেতর পৃথিবীতে আবার বেধেছে মহাযুদ্ধ এবং প্রচণ্ডতার দিক থেকে এ-যুদ্ধ প্রথম যুদ্ধকে ইতিমধ্যেই অনেক পেছনে ফেলে গেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার পর ধীরে ধীরে সুরু হয়েছিল একটা গঠনের পালা—যে বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যিক শোষণ নীতির প্রতিক্রিয়ায় বেধেছিল ঐ যুদ্ধ, তা নিরস্ত হয়ে বিশ্বে কোন দিন স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হবে, এম্নি একটা আভাস পাওয়া গিয়েছিল এই সব প্রয়াস-প্রচেষ্টার ভেতর।

একদিকে বুদ্ধিজীবীদের প্রচার কার্য্য ও নিরস্ত্রীকরণের উদ্যোগ-আয়োজন, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রবাদের ক্রমবিস্তার এই আশাকে অনেকটা উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। বিশ্বকল্যাণ, সৌভ্রাত্র, সমদর্শিতা আর যা-কিছু মহৎ আদর্শ গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, রলাঁ প্রমুখ মনীষীদের শ্রমে ও সাধনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাও যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পৃথিবীতে এনেছিল সত্যিকার একটি শান্তির আভাষ।

মনে হয়েছিল, এই হাওয়ায় পাল তুলে মানুষের ভাগ্য-তরণী কোন একদিন পৌঁছুবে এমন একটি নিশ্চিন্ত কিনারায়, যেখানে শ্রেণীস্বার্থের উপদ্রব নেই—ভৌমিক, বাণিজ্যিক বা সাম্রাজ্যিক একাধিকারের অন্ধতায় মানুষ যেখানে মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে খর্ব্ব করে নি, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি, সমাজ ও রাজনীতির সহায়তা যেখানে মুষ্টিমেয় ধনিক, বণিক ও তাদের স্বার্থবাহীদের জন্যে সংরক্ষিত নয়—ধর্ম্মের নামে, দেশপ্রেমের নামে, জাত্যভিমান, কাঞ্চন কৌলীন্য, কেতাব কৌলীন্যের নামে শ্রমজীবী ও হীনবিত্তদের সমাজ-জীবনের নীচু

তলায় আটকে রেখে, কৌশলে তাদের শোষণ করা এবং কোনদিনই মাথা তুলতে না দেওয়ার জুলুম নেই। সমাজতন্ত্রবাদের বিস্তারে সমস্ত পৃথিবীই একদিন ধরবে একটি নূতন চেহারা—সোভিয়েট রাশিয়ার দৃষ্টান্ত থেকে সকলেই এই আশা মনে পোষণ করছিলেন।

কিন্তু এই আশার ওপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রবল আঘাত দিয়েছে ভার্সাই সন্ধির অবমাননা ও নিগ্রহের প্রত্যুত্তরে জার্মাণী সামরিক শক্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাবে বৃদ্ধি করে, এই ক'বছরেই তৈরি হল আবার একটি যুদ্ধের জন্যে—সেই যুদ্ধই আজ চলছে। জার্মাণীর এই যুদ্ধ শুধু ভার্সাই সন্ধি নাকচ করে এবং নিজের অধিকারচ্যুত স্থানগুলি পুনরুদ্ধার করেই ক্ষান্ত হতে চায় না—এর লক্ষ্য পৃথিবী থেকে ফরাসী ও ইংরেজের সাম্রাজ্যিক বা ব্যবসায়িক একাধিপত্য উচ্ছিন্ন করা, আর তারি স্থানে এনে স্থাপিত করা জার্মাণীকে। এর জন্যেই জার্মাণী আজ দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে এবং বৃটিশ ছাড়া ইউরোপের সমস্ত শক্তিকেই অল্পদিনের ভেতর পর্য্যুদস্ত করে, আজ সমস্ত ধনতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যলোভী রাষ্ট্রের জাতশত্রু রাশিয়াকে আক্রমণ করেছে। ইটালী ও জাপান গোড়া থেকেই জার্মাণীর এই দিগ্বিজয়ে সহায়ক হয়েছে—জার্মাণীর অভিযান যদি সফল হয়, তাহলে এরা ভাবী বিশ্ব-বিধানে যথাক্রমে আফ্রিকায় এবং এশিয়ায় বড় রকমের বখরা পাবে। অর্থাৎ সম্মিলিত ফ্যাসিষ্ট ত্রি-শক্তি যথাক্রমে তিনটি মহাদেশের ওপর জেঁকে বসবে এবং অবাধে সাম্রাজ্যবাদের শোষণ চালাবে।

এর পথে জার্মাণীর প্রথম বাধা ছিল ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী—যা অপসারিত হয়েছে ফ্রান্সের পতনের পর। এখন বাধা রয়েছে ইঙ্গ-মার্কিন মৈত্রী, আর সোভিয়েট রাশিয়া। ধনতান্ত্রিক আমেরিকার এবং সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের সঙ্গে নীতির দিক থেকে রাশিয়ার আমূল বিরোধ থাকা সত্ত্বেও,

এরা আজ সাময়িক প্রয়োজনেই পরস্পরের ভেতর সহযোগিতার সম্বন্ধ স্থাপন করেছে। হয়ত এই ত্রি-শক্তি একযোগে প্রতিকূল ফ্যাসিষ্ট ত্রি-শক্তিকে উৎখাত করতে পারে। কিন্তু তারপর ভাবী বিশ্ব-বিধান কি রকম হবে, সে একটা সমস্যা। তবে আমেরিকা এখনো বৃটেনের হয়ে প্রকাশ্য যুদ্ধে নামেনি, জাপানও জার্ম্মাণীর সহায়ক রূপে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি। যদি অদূর ভবিষ্যতে এরা সত্যিই রঙ্গস্থলে হাজির হয়, তাহলে সেই বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের পরিণাম কি হবে, তা আগে থেকে বলা শক্ত হলেও, এটা বোঝা যায় যে সেই যুদ্ধেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চরম ফলাফল স্থির নির্ণীত হয়ে যাবে।

কিন্তু চিন্তাশীলদের প্রশ্ন এ নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল যে নয়া সংস্কৃতি—নূতন সমাজ-বিধানের আদর্শ, যা অলক্ষ্যে সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে চলছিল, তার ভবিষ্যৎ কি, সেই হল তাঁদের প্রশ্ন। সেই প্রশ্ন নিয়েই পৃথিবীর কোটি কোটি নর-নারী আজ তাকিয়ে আছেন এই যুদ্ধের ফলাফলের দিকে। যে নির্ভরতা ও আশার স্বপ্নে বুক বেঁধেছিলেন তাঁরা, আজ তার সম্ভাবনীয়তার পথে মস্ত বড় একটা বিপদ দেখা দিয়েছে—এই বিপদকে সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করতে না পারলে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংস-স্তূপের ওপর মানুষের ইতিহাস যে আরো কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হবে, তা আজ কল্পনা করতেও সাহস হয় না। কারণ আজকের এই যুদ্ধ কতকগুলি দেশের বিরুদ্ধে নয়, সমগ্রভাবে এ হল যুগ সংস্কৃতিরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

এই যুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট-শক্তির জয় হলে, বিশ্ব-ব্যবস্থায় যে ভাঙাগড়া দেখা দেবে, তা যে সমষ্টির কল্যাণকে লক্ষ্যস্বরূপ নেবে, অথবা তাদের দুঃখহরণ ও মর্য্যাদাবৃদ্ধিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করবে—মানুষের সমস্ত উদ্ভাবন ও আবিষ্কৃতিতে, সমস্ত চিন্তা ও অনুভূতিতে মানুষের অবারিত অধিকার যে

মঞ্জুর করবে, তার কোন সুদূর সম্ভাবনাও দেখা যায় না। যে এক-নায়কী শাসনব্যবস্থার অভ্যুদয়ে এই বিশ্বযুদ্ধ, তার ভেতর এসব জিনিষের কোন স্থানই নেই। পরাধীন ও বহু দুর্দ্দশায় নিপীড়িত জাতগুলির পক্ষে তাই এই যুদ্ধে জার্ম্মাণীর পরাজয় ও সমাজতন্ত্রবাদের পরিব্যাপ্তিই একমাত্র কাম্য। রাশিয়া যদি এই যুদ্ধে জয়ী হয়, তাহলে শুধু ফ্যাসিষ্ট আদর্শই ধ্বংস হবে না, ফ্যাসিষ্ট-কবলিত ইউরোপও মুক্তি পাবে এবং ইঙ্গ-রুশ মৈত্রী হয়ত শেষ পর্য্যন্ত চীন এবং ভারতের মুক্তিসাধনেও সমর্থ হবে। কিন্তু সব কিছুর পথ আগলেই দাঁড়িয়ে আছে মস্ত একটা হয়ত।